মহাস্থবির জাতক

(দ্বিতীয় পর্ব)

"মহাস্থবির"

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ ঃ
১৩৬২

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
বিশ্বনাথ দাস

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীত্রিদিবেশ বসু,
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

বন্ধু প্রতোষকুমার রায়ের স্মরণে :
দীর্ঘদিন বিচ্ছেদের পর আবার যার
সঙ্গে নতুন ক'রে মিলন হ'ল।

কলিকাতা
১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭

সংসারে মনুষ্যকুলজাতি—স্ত্রী-পুরুষমাত্রেই স্বপ্ন দেখে। বাস্তবের রূঢ় আলোকে কারুর স্বপ্ন ছুটে যায়, কারুর বা স্বপ্নবিলাসেই জীবন ভোর হয়।

আমিও একদিন স্বপ্ন দেখেছিলুম।

আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম, এই ভগ্নসার্থ, মন্দমতি, নির্বীর্য, স্বার্থান্ধ, মুমূর্ষু দেশবাসীকে মৃত্যুশয্যা থেকে ঝুঁটি ধ'রে তুলে তাদের দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করেছি। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা দেবতাজ্ঞানে আমার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছে। আমার সতত-বিষণ্ন গম্ভীর পিতার মুখমণ্ডল ঘিরে আনন্দের জ্যোতি ফুটে উঠেছে। তিনি বলছেন, তুমি আমাদের কুল পবিত্র করেছ। সংসার-ভারে জর্জরিতা আমার মার মুখে আর হাসি ধরে না। আনন্দাশ্রুবিগলিত-বয়ানে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বলছেন, স্থবির, তোকে গর্ভে ধারণ ক'রে আমি কৃতার্থ হয়েছি।

স্বপ্ন দেখছিলুম, আমার রচিত সাহিত্য ধরণীর ভাবসমুদ্রে নূতন ভাগীরথী-ধারা যোজনা করেছে। অতি-অবজ্ঞাত পুরাতন প্রাচীকে যারা এতকাল অজ্ঞতাবশে অপমান করেছিল, তারা চমকে উঠেছে।

স্বপ্ন দেখছিলুম, আমার মানসগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর অলৌকিক স্মিতহাস্যে আমার দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর দক্ষিণ হস্ত আমার মাথায় স্পর্শ ক'রে বলছেন, বৎস, তুমি ধন্য, তোমার লেখনী ধন্য হোক।

কিন্তু তবুও সেই সাফল্যের আনন্দালোকের মধ্যেও একটি তীক্ষ্ণ বেদনার তিমিরধারা হিল্লোলিত হচ্ছিল, শীতারম্ভের প্রত্যূষে আলো ও কুয়াশায় যেমন জড়াজড়ি ক'রে থাকে। কোথা থেকে সেই বেদনার ধারা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, কোথায় তার উৎস, তাই নিয়ে স্বপ্নেও মনের মধ্যে আলোড়ন চলেছে। হঠাৎ মনে হ'ল, আমি ও আমার মন যেন দুটো পৃথক ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছি। দেখতে দেখতে সেই আলো-আঁধারির মধ্যে ফুটে উঠল লতুর বিদায়োন্মুখ অশ্রুসজল মুখখানি। সমস্ত আনন্দ ও সাফল্য তার অশ্রুজলে মুছে নিয়ে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম তার সামনে, কিন্তু আমার অভিমানক্ষুব্ধ মন ছুটে চলল

ভারতবাসীর চরম আশ্রয় হিমালয়ের গিরিকন্দরে। এই দুঃখ এই অন্তর্দাহ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমি যোগসাধনায় নিমগ্ন হলুম।

আমি স্বপ্ন দেখছিলুম, যোগবলে আমি মানসচারী হয়েছি, যখন যেখানে খুশি ইচ্ছামাত্র সেখানে উপস্থিত হতে পারি। সাধনাবলে আমি কালচক্রকে থামিয়ে দিয়েছি, আমার ইচ্ছাশক্তিতে অতীত ও বর্তমান স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। স্বপ্ন দেখছিলুম, আমি ভারতের অতীত ইতিবৃত্তের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি যেন মহারাজ দক্ষের দরবারে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছি যজ্ঞে যোগ দেবার জন্যে। দেখলুম, বিপুলনিতম্বা পলাশনয়না চন্দ্রের মহিষীরা সব প্রাসাদের কক্ষ, অলিন্দ, উদ্যান কলহাস্যে মুখরিত ক'রে তুলেছে। কিন্তু সেদিকে আমার ভ্রূক্ষেপও নেই; কারণ নারীর দেহ-সৌন্দর্যের প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ নেই, আমি যে যোগী! আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি দক্ষের সেই দুহিতাকে, যে রাজার মেয়ে হয়েও ভিখারীকে স্বামিত্বে বরণ করেছে, প্রেমকে যে বংশমর্যাদার ওপরে স্থান দিয়েছে। তাঁরই পদধূলি আমি চাই।

আমি নিজের চোখে দেখেছি দেবীকে। তপঃক্লিষ্টা, তন্বী, উৎকণ্ঠায় গৌরবদন পাংশু। পদতলে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে বললুম, মা গো, সন্তানের প্রণাম নাও। আমি ধন্য! সার্থক হয়েছে আমার তপস্যা।

আমি স্বকর্ণে শুনেছি, গর্বোদ্ধত দক্ষের বদননিঃসৃত সেই শিবনিন্দা—

অপমান কার?

মান আছে যার!

ভিখারীর অপমান কি রে ভিখারিণী!

আমি দেখলুম, সতীর মৃত্যু। দেখেছি, তাঁর অন্তরের ক্ষোভ ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে প্রবাহিত হয়ে চলল দিগ্বিদিকে, ত্রিকাল ব্যেপে।

দেখলুম, মহেশ্বর এলেন তাঁর দলবল চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে। মুখে তাঁর আর ববম্ রব নেই, বুলি পাল্‌টে গিয়েছে। চোখ-দুটি বাড়বানলের মতো, তা থেকে একাধারে অশ্রু ও অনলের প্রবাহ ছুটেছে। ছোট ছেলের খেলনা ভেঙে গেলে যেমন সে বাড়িসুদ্ধ লোকের বিরক্তি উৎপাদন ক'রে চিৎকার করতে থাকে, তেমনই তিনি "সতী দে, সতী দে" চিৎকারে ত্রিলোক ফাটাতে আরম্ভ করলেন।

ছেলেবেলা আমাদের বাড়িতে একটা দল ছিল। এই দলের পাণ্ডা ছিল সেজদি—আমার পিসীমার মেয়ে। সেজদি, ছোড়দি, আমি আর অস্থির—এই চারজন ছিলুম আমাদের দলে। কখনও কখনও কালেভদ্রে দাদাকেও এই দলে

নেওয়া হ'ত। সেজদি ছিল দলের নেত্রী আর আমরা ক'জন ছিলুম তার চেলা। আমরা পাঁচজনে একত্রে জুটলে একেবারে গায়ে গায়ে লেগে থাকতুম। যতক্ষণ আমরা তাদের বাড়িতে থাকতুম অথবা তারা আমাদের বাড়িতে থাকত, এক মুহূর্তের জন্মেও কেউ ছাড়াছাড়ি হতুম না—এক পাতে খাওয়া থেকে এক বিছানায় শোয়া পর্যন্ত। সেজদির ডাকনাম ছিল সুখী। বাড়িতে ও পিসীমার বাড়িতে 'সুখীর দল' নামে আমাদের অখ্যাতি ছিল। কোনও ঘরে কোনও কাচের জিনিস ভাঙা কিংবা কোথাও ঘড়া উল্‌টে জলে মেঝের বিছানাপত্র ভেসে-যাওয়া ইত্যাদি দেখলেই বাড়ির সবাই তখ্‌নি ধ'রে নিত, এ সুখীর দলের কাজ।

সেজদি মাঝে মাঝে চড়ুইভাতি করত। দেশলাইয়ের বাক্সের মতো ছোট ছোট কাগজ কেটে সে পাঁচটা নিমন্ত্রণপত্র লিখে আমাদের মধ্যে বিতরণ করত ও নিজে একটা রাখত। ছোট্ট একটি উনুন, তাতে সরু সরু কাঠের আগুন দিয়ে, ছোট্ট কড়া চাপিয়ে নতুন টাকার মতন ঝকঝকে ছোট ছোট লুচি ভাজা হ'ত। সেজদি সে লুচির নাম দিয়েছিল 'চাঁদির চাকৃতি'। ছোট্ট বঁটিতে সরু-সরু আলু কুটে তাই ভেজে চাঁদির চাকৃতি দিয়ে আমাদের ভোজ হ'ত।

রান্না সেজদিই করত, আমরা তিন ভাই আর ছোড়দি যোগান দিতুম মাত্র।

তখন আমরা একটু বড় হয়েছি। দাদা আমাদের দল থেকে বেরিয়ে গেলেও আমাদের চারজনের মধ্যে গোষ্ঠীগত একতার কোনও ব্যতিক্রমই হয় নি। আমার বয়েস আট, সেজদির বয়েস সতেরো, এমনই এক সময়ে চড়কের দিনে সেজদি দুটো বড় পুতুল কিনেছিল। একটা পুলিস-কনস্টেবল আর একটা কেঁড়ে-কাঁখে গয়লানী। পুতুল-দুটো দেখেই আমি আর অস্থির বায়না ধরলুম, ও দুটো দাও, দিতেই হবে।

সেজদি কিছুতেই দেবে না। আমরাও ছাড়ব না। শেষকালে সে হাসতে হাসতে বললে, দেখ্, আমি ম'রে গেলে পুতুল-দুটো দুই ভাইয়ে নিয়ে যাস।

যাক। তবু একটা আশ্বাস পেয়ে সেদিনকার মতো বাড়ি ফিরলুম।

তারপর রোজই উৎসাহ ক'রে পিসীমার বাড়ি যাই। কিন্তু হায়! গিয়ে দেখি, সেজদি তখনও মরে নি। সেজদি মরতে অনেক দেরি করছে দেখে একদিন অস্থির ব'লে ফেললে, সেজদি, তুমি কবে মরবে ভাই?

সেজদি হাসতে হাসতে বললে, শিগগিরই মরব, একটু সবুর কর্ না।

হাসতে হাসতে সে কথাগুলো বলল বটে ; কিন্তু দেখলুম, সঙ্গে সঙ্গে তার দুই চোখ জলে ভ'রে উঠল।

সেজদিকে আমি ও অস্থির বড় ভালবাসতুম। সে একাধারে আমাদের বন্ধু, দিদি ও জননী ছিল। আমরা শুনেছি আমাদের শিশু-অবস্থায়—সে তখন বালিকা মাত্র—নির্বিকারচিত্তে আমাদের মলমূত্র পরিষ্কার করত। সামান্য দুটো পুতুলের জন্যে সেই সেজদির চোখে জল দেখে আমরা কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধ'রে বললুম, তুমি ম'রো না দিদি, পুতুল আমাদের চাই নে।

অস্থির উঠে গিয়ে পেছন থেকে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে গালে চুমো খেতে লাগল। আমি তার একখানা বাহু প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে ব'সে রইলুম।

সেজদি বলতে লাগল, জানিস ভাই, আমি জানতে পেরেছি, মহেশ্বর আমাকে মেরে ফেলবে। এই ব'লে সে করুণকণ্ঠে কামিনী রায়ের "আছে এ জগৎ-মাঝারে গোপনে এক সে সুন্দর সিদ্ধিস্থান" গানটা গাইতে লাগল।

অতীতের গর্ভ থেকে সেই করুণ কণ্ঠ আজ আমার কানে এসে বাজছে আর ঈশ্বরের করুণাময়ত্ব সম্বন্ধে একেবারে নিঃসংশয় হচ্ছি।

বোধ হয় পনরো-ষোল দিন বাদেই একদিন ছোড়দি আমাদের বললে, সেজদির ভয়ানক অসুখ, তাকে মধুপুরে নিয়ে যাওয়া হবে।

সেজদি মধুপুরে চ'লে গেল, কিন্তু মাস-দুয়েক যেতে-না-যেতেই তাকে ফিরিয়ে আনা হ'ল—অসুখ বেড়েছে।

আমরা রোজই যাই সেজদিকে দেখতে। অসুখ তার বেড়েই চলল। তার বিছানায় উঠে বসলে বাড়ির সবাই তুলে নিয়ে আসে। বলে, রুগীর বিছানায় বসতে নেই। তার গায়ে হাত দিলে সবাই হাঁ-হাঁ ক'রে ওঠে। বলে, অসুখ বেড়ে যাবে।

এইরকমই চলছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরে কেউ নেই দেখে আমরা দু-ভাই টপ ক'রে তার খাটে উঠে দু-পাশে দুজনে ব'সে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। সেজদির নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল, তবুও হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, আমার জন্যে মহেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবি, আমি যেন শিগগিরই সেরে উঠি।

সেদিন থেকে ঘুমোবার আগে দুই ভাই মিলে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে লাগলুম, হে মহেশ্বর ! তুমি সেজদিকে মেরো না। তাকে বাঁচিয়ে দাও, তাকে শিগগির ভালো ক'রে দাও।

আর একদিন। সকালে বাবা আপিসে না গিয়ে গাড়ি ক'রে মাকে নিয়ে চ'লে গেলেন সেজদিকে দেখতে, তার অসুখ বেড়েছে। সন্ধ্যে হয়ে গেল, তবুও তাঁরা ফিরলেন না। আমরা রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লুম।

গভীর রাত্রে মা এসে আমাদের ঘুম থেকে তুলে বললেন, চল্, তোদের সেজদি ডাকছে।

ধড়মড় ক'রে উঠে পড়লুম, দরজায় গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। পিসীমার বাড়িতে গিয়ে দেখি, অত রাত্রেও ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, অনেক অচেনা লোক এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে, ব্যাপারটা তখনও ভালো ক'রে বুঝতে পারি নি। সেখানে গিয়ে শুনলুম, সেজদি আমাদের দেখতে চাইছে।

আমাদের দুই ভাইকে ধ'রে সেজদির খাটের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল। দেখলুম, যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে। তার কপালে ও মুখময় বিন্দু-বিন্দু ঘাম, একটুখানি নিশ্বাস নেবার সে কি প্রাণপণ চেষ্টা! আমরা এসে দাঁড়াতেই সে স্থির হয়ে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে রইল, কিন্তু কিছুই বলতে পারলে না। আমি মনে মনে বলতে লাগলুম, মহেশ্বর, দয়া কর, সেজদিকে বাঁচিয়ে দাও, দয়া কর, দয়া কর।

মনে মনে বলতে বলতে অস্ফুট আওয়াজ মুখ দিয়ে বেরুতে লাগল। আমার দেখাদেখি অস্থিরও আরম্ভ করলে, মহেশ্বর, দয়া কর, দয়া কর।

খাটের চারিদিকে অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি গুমরে .উঠছিল। মুখ তুলে দেখি, সবাই কাঁদছে। সেই দৃশ্য দেখে আমাদের চোখও জলে ভ'রে উঠল। সেই বিশাল অশ্রু-পারাবারের ভেতর দিয়ে অস্পষ্ট আলোকে দেখতে পেলুম, সেজদির চোখ-দুটোও অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

এক মুহূর্ত পরেই সে চোখের দৃষ্টি নিবে গেল।

আমাদের দু'জনকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হ'ল।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে সেজদির ঘরে গিয়ে দেখি, তার খাটখানা হা-হা করছে। তার ওপরে সেজদিও নেই বিছানাও নেই।

জীবন-যুদ্ধ ঘোষিত হবার বহু পূর্বেই অতর্কিত অস্ত্রাঘাতে আমাকে কাবু করবার সেই যে চেষ্টা, সে-কথা আমি ভুলি নি। তাই সেই মহেশ্বরকে এতদিন পরে এমন প্যাঁচে পড়তে দেখে খুশিতে মন ভ'রে উঠল। মনে মনে বলতে লাগলুম, বেড়ে হয়েছে, বেড়ে হয়েছে মহেশ্বর! তোমার বাপ নেই, মা নেই, ভাই-বোন-বন্ধু কেউ নেই, তাই তুমি বেপরোয়া দুনিয়ার বুকে শোকের

আগুন জ্বালিয়ে ঘুরে বেড়াও। প্রিয়বিচ্ছেদের মজা কতখানি, তা একবার নিজেও উপভোগ কর।

বেশ চলছিল, হঠাৎ মহেশ্বরের চেলার দল বেরসিকের মতো সবাই বিকট চিৎকার করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। বাপ রে বাপ! সে কি ভীষণ আওয়াজ! তারপরেই শুরু হ'ল দক্ষযজ্ঞ-পণ্ড! মার্-মার্ কাট্-কাট্ শব্দ!

ব্যাপার দেখে তো দক্ষরাজ আত্মরক্ষার জন্যে মারলেন রাম-দৌড়। যজ্ঞের পুরোহিতেরা কাছা আঁটতে-আঁটতে লুকোতে লাগলেন আড়ালে-আবডালে। আগুন ছুটল চারদিকে।

মহেশ্বর চিৎকার করতে লাগলেন, দে সতী, দে সতী, দে সতী। আর ওদিকে ঘুরন্ত লাট্টুর মাথায় জল পড়লে সে-জল যেমন চারদিকে ছট্‌কে পড়তে থাকে, দক্ষের চেলারা মহেশ্বরের চেলাদের তাড়নায় তেমনই ছট্‌কে পড়তে লাগল।

ওদিকে যক্ষরক্ষদের চিৎকার ও মালসাটের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ধুলো ও ধোঁয়ায় দেখতে দেখতে চারিদিক অন্ধকার হয়ে উঠল। সেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মহারাজ দক্ষ ছুটলেন প্রাসাদের অন্তঃপুরে আত্মগোপন করতে।

প্রাসাদের মধ্যে দক্ষের বড় জামাই অর্থাৎ মহেশ্বরের ভায়রাভাই লোচ্চাকুলচূড়ামণি শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী চন্দ্র আমন্ত্রিতা মেয়েদের মধ্যে জমাট হয়ে ব'সে আড্ডা দিচ্ছিলেন, হঠাৎ শ্বশুরমহাশয়কে ওইরকম মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটতে দেখে বাইরে বেরিয়ে এসে ব্যাপার দেখে চট্ ক'রে আকাশে চ'ড়ে হাসতে আরম্ভ ক'রে দিলেন হ্যা-হ্যা ক'রে।

অন্ধকারে মাহেশ্বরীদলের গুণ্ডামি একটু মন্দা পড়েছিল। কিন্তু চাঁদ আকাশে উঠতেই চারিদিক আলোয় আলো হয়ে গেল। তারা আবার হৈ-হৈ ক'রে যজ্ঞপণ্ডের কাজ শুরু ক'রে দিলে। তখন—

হাস্তুতুণ্ড যজ্ঞকুণ্ড পূরি পূরি মূতিছে।
পাদঘায় ঠায় ঠায় অশ্ব হস্তি পূঁতিছে॥

চন্দ্রালোকে আবার চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল দেখে দক্ষরাজ চন্দ্রের উদ্দেশে চেঁচাতে লাগলেন, ওহে বিমানবিহারী, ওহে বাবাজীবন! ডুবে যাও, ডুবে যাও বাবা। কিন্তু অবাধ্য চন্দ্র সে-কথা না শুনে আরও হাসতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। দক্ষ মহারাজ তখন পাগলের মতন এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে করতে একবার জামাই-বাবাজীবনের সামনে পড়ায় তাঁর মুণ্ডুটি উড়ে গেল।

আমি একদিকে দাঁড়িয়ে মজা দেখছি, সমস্ত ব্যাপারটা লাগছে মন্দ নয়। এমন সময়—

রাজ্যখণ্ড লণ্ডভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।
ছুল থূল কূল কূল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে ॥

ব্যস্! ষোলো আনা পূর্ণ হতে এইটুকুই বাকি ছিল। অধুনা-আবিষ্কৃত অ্যাটমিক বোমার পূর্বপুরুষ সেই ব্রহ্মডিম্ব তুটি ফাটতেই স্রেফ বায়ুর চাপে সারা কনখল সমভূমি হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, ইট-পাটকেল, স্থাবর-জঙ্গম সব কিছুর সঙ্গে আমিও উড়তে লাগলুম আকাশে। উড়তে উড়তে একেবারে বুঁদ হয়ে গেলুম। বাপ রে বাপ, সেখানে কি শীত! ঠকঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে আবার বোঁ-বোঁ ক'রে নীচের দিকে নামতে নামতে ধড়াস ক'রে এক জায়গায় এসে পড়তেই স্বপ্ন ছুটে গেল। চোখ চেয়ে দেখি, মহেশ্বরের খাস আস্তানা কাশীধামের রাজঘাট ইস্টিশানে পাষাণশয্যায় প'ড়ে রয়েছি, পাশে বন্ধু পরিতোষ আপাদ-মস্তক র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে আছে। ব্যোম মহাদেব—জয় জয় মহেশ্বর রবে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ।

শিলাশয্যা থেকে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলুম। দেহ অসম্ভব ভারী ব'লে মনে হতে লাগল। বেশ বুঝতে পারলুম, হিম লেগে চোখ-মুখ ফুলে উঠেছে। ভয়ানক দাঁতের যন্ত্রণা হচ্ছিল, দেখলুম, মাড়ি ফুলে উঠেছে আর প্রত্যেকটি দাঁত নড়ছে। পরিতোষকে ঠেলে তুললুম। সে বললে, কানে কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

একটু ধাতস্থ হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখি, আমাদের চারপাশে গোল হয়ে একদল মোটা-মোটা লোক ব'সে রয়েছে, দৃষ্টি তাদের আমাদের দিকে স্থির-নিবদ্ধ। সে দৃশ্য দেখে আমার রাজা রবি বর্মার 'অশোকবনে চেড়ী-পরিবৃতা সীতা'র ছবির কথা মনে পড়তে লাগল।

ট্রেনে আসবার সময় সহযাত্রীদের মুখে কাশীর গুণ্ডা-পাণ্ডাদের অত্যাচার ও অনেকরকম বিভীষিকার কথা শুনে মনে মনে এদের সম্বন্ধে খুবই সাবধান হয়েছিলুম। কাশী পৌঁছবার বোধ হয় পঞ্চাশ মাইল আগে থেকে প্রতি ইস্টিশানেই পাণ্ডাদের আক্রমণ শুরু হয়েছিল। সকলের মুখে একই প্রশ্ন—কাশী যাচ্ছ বাবু, কে তোমাদের পাণ্ডা?

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চুপ ক'রে থাকি, কথা বাড়িয়ে লাভ কি? নেহাত বিরক্ত করলে ব'লে দিই, আমাদের পাণ্ডার নাম রামমোহন রায়, বিবেকানন্দ স্বামী। কোথাও বলি, রবি ঠাকুর। তারা অবাক হয়ে ভাবতে থাকে, ইতিমধ্যে ট্রেন ছেড়ে দেয়।

এমনই করতে করতে কাশী স্টেশনে এসে পৌছেছিলুম। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে নিজেদের এই পাণ্ডাব্যূহের মধ্যে অবস্থিতি দেখে এবার দস্তুরমত ভড়কে গেলুম।

বোধ হয় মিনিট-পাঁচেক পরেই চারিদিক থেকে প্রশ্নবৃষ্টি শুরু হ'ল।

বাবুদের বাড়ি কোথায়?

আকাশের নীচে।

কোথায় থাকা হয়?

রাজঘাট ইস্টিশানের প্ল্যাট্‌ফর্মে।

পরিতোষ চুপ ক'রে ব'সে আছে, কারণ সে কানে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। আমার জীবন ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর একজন জিজ্ঞাসা করলে, বাবুদের নাম কি?

স্থবির শর্মা, পরিতোষ রায়।

তারপরে সেই এক প্রশ্ন, কে পাণ্ডা? কেন পূজো দেবে না? কাশীতে এসে বাবার পূজো দেবে না, এটা কি ভালো কথা হচ্ছে, ইত্যাদি।

ক্রমে দু-একটি ক'রে লোক উঠতে আরম্ভ ক'রে দিলে। শেষকালে এক ব্যক্তির সঙ্গে ভাব জ'মে গেল। তাকে আমরা বুঝিয়ে বললুম, দেখ বাপু! বাড়ি থেকে ত্রিশটি টাকা গ্যাঁড়া মেরে বাবার স্থানে এসে আশ্রয় নিয়েছি। তা থেকে রেল-কোম্পানিকে দিতে হয়েছে আট টাকা, পথে পুরি মিঠাই মেরেছি দু-টাকা, আর আছে মোটে কুড়িটি টাকা। এর মধ্যে থেকে বাবার পূজোর জন্যে যদি খরচা করতে হয় তো অদূরভবিষ্যতেই বাধ্যতামূলক প্রায়োপবেশনের মহড়া শুরু হবে। অতএব দয়া ক'রে আমাদের রেহাই দাও।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! লোকটা তবুও ঘ্যানর-ঘ্যানর করতে লাগল। বললে, বছর দু-তিন আগে দু'জন বাঙালী ছেলে তোমাদেরই মতন বাড়ি থেকে পালিয়ে আমার আশ্রয়ে এসে পড়েছিল। তারাও তোমাদেরই মতন প্রথমে বলেছিল, কাছে একটি পয়সাও নেই। শেষকালে পূজো-টুজো দেওয়ার পর রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বললে, দাদা—আমাদের কাছে এই চারশো টাকা আছে, এটা তোমার কাছে রেখে দাও, আমাদের দরকার

মতন চেয়ে নোব। তারা তিন মাস আমার কাছে থেকে মৌজ ক'রে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেল। যাবার সময় আমায় একশোটি টাকা দিয়ে বললে, তোমার মতন বিশ্বাসী লোক আমরা আর দেখি নি।

মনে মনে সেই বাঙালী ছেলেদের মুণ্ডপাত ক'রে তাকে বললুম, আমরা তোমায় পুজোর জন্যে একটি টাকা দিতে পারি, দেখ, এতে যদি তোমার পোষায় তো বল।

লোকটা কিছুক্ষণ গুম হয়ে ব'সে রইল। তারপরে বললে, আচ্ছা, চল, বিশ্বনাথের যা মর্জি তাই হবে। জয় বাবা বিশ্বনাথ!

উঠে পড়া গেল। দেহ অসম্ভব ভারী, দাঁতের যন্ত্রণা অনেক কম পড়লেও তখনও বেশ কট্‌কট্‌ করছে। পরিতোষের কানটা একটু সাফ হয়েছে বটে, কিন্তু চিৎকার ক'রে না বললে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, তার দৈহিক অবস্থাও তদ্রূপ। পাণ্ডা একখানা গাড়ি করতে বললে বটে, কিন্তু ট্যাঁকের অবস্থা বিবেচনা ক'রে হেঁটে যাওয়াই সাব্যস্ত করা গেল।

প্রথমেই বাসস্থান ও আহারের ব্যবস্থা করা চাই, পুজো তার পরে হবে। পাণ্ডা মহারাজ আশ্বাস দিলে, কোনও ভয় নেই, সব ব্যবস্থা বেশ ভালোভাবেই হয়ে যাবে।

তার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বাঙালীটোলায় এসে পৌঁছনো গেল। কাশীর যে বাঙালীটোলার কথা শৈশব থেকে শুনে আসছি, সেই বাঙালীটোলা। পাণ্ডা মহারাজ গলি তস্য গলির মধ্যে একটা বাড়িতে আমাদের নিয়ে উপস্থিত হ'ল। বাড়ির মালিক বাঙালী, জাতিতে ব্রাহ্মণ, চট্টোপাধ্যায়। পুরো নামটা এতদিন পরে ঠিক মনে হচ্ছে না, বোধ হয় মহেন্দ্রনাথ চাটুজ্জে।

আমরা যখন তার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলুম, তখন সে ছোট কলকেতে বড় তামাক টানছিল। আমাদের দেখে একহাতে কলকেটা নামিয়ে ধ'রে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার?

পাণ্ডা আমাদের দেখিয়ে বললে, বাবুরা কলকাতা থেকে এসেছেন বিশ্বনাথ দর্শন করতে। এখানে ঘর-টর খালি আছে?

চাটুজ্জে হাতের কলকেটা তুলে একটি দম লাগিয়ে বললে, ঘর খালি আছে বইকি। ঘরের অভাব কি?

তার পরে আমাদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, বাবাজীদের বাড়ি কি খাস কলকাতায়?

বললুম, হ্যাঁ।

বাপ-মা আছেন ?

আছেন।

তা বাপু, বাপ-মাকে কাঁদিয়ে এরকম ক'রে পালিয়ে এসে কি লাভ হয় তোমাদের বলতে পার ?

বলতে বলতে কলকে তুলে আর এক টান—বাপ রে বাপ, সে কি টান!

আবার ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আমাদের পাণ্ডাকে সম্বোধন ক'রে চাটুজ্জের পো বলতে আরম্ভ করলে, কলকাতার ছেলে, বুঝলে পাণ্ডাজী, সে এক সাংঘাতিক চীজ! মায়ের দুধ ছাড়তে-না-ছাড়তে ব্যাটারা মাল টানতে শুরু ক'রে দেয়।

কলকেটা উলটে ছাইয়ের ভেতর থেকে ঠিকরেটা তুলে নিয়ে আঙুলের মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে চাটুজ্জে আমাদের জিজ্ঞাসা করলে, বাবাজীরা মাল-টাল টানতে শুরু করেছ তো ?

আমরা নিরুত্তর। চাটুজ্জে ব'লে যেতে লাগল, বছর দু-তিন আগে গোটা-তিনেক ছোঁড়া বুঝলে পাণ্ডাজী, বছর তেরো-চোদ্দ বয়েস তাদের, বাড়ি থেকে টাকা ভেঙে এখানে এসে উঠেছিল। ভালো ঘরের ছেলে, দেখতে এক এক ব্যাটা যেন কন্দর্প। সারাদিন কি মিষ্টি কথা, শুনলে কান জুড়িয়ে যায়। কিন্তু সন্ধ্যে হ'লেই একেবারে অন্য লোক। রোজ সন্ধ্যেবেলায় এক বোতল মাল এনে তিনটেতে মিলে টেনে সে কি হুড়োপাকাটি! দু-দিনে ঘরের মেঝেটাকে একেবারে চ'ষে ফেললে হে! নেহাত অসহ্য হওয়ায় একদিন বললুম, বাবাজীরা, এই কচি বয়েসে এত মাল টেনে কেন মিছে দেহ নষ্ট করছ ?

তা একজন জবাব দিলে, কাশীতে সস্তা মাল, তাই খেয়ে নিচ্ছি, চিরকাল তো আর খেতে পাব না।

যাক। ছেলেমানুষ, দু-দিন ফুর্তি ক'রে নিক ভেবে আর বেশি কিছু বললুম না।

একদিন, রাত তখন দশটা হবে, শীতকাল, গ্যাস-ট্যাস টেনে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়েছি, হঠাৎ ছোঁড়ারা চিৎকার করতে আরম্ভ ক'রে দিলে, ওহে চাটুজ্জে, ও চাটুজ্জের পো, ঘুমুলে নাকি হে ?

ডাকের রকম দেখে তো আমার সর্বাঙ্গ একেবারে জ্ব'লে উঠল। বোঝ একবার! আমি একটা বুড়ো মিন্‌সে, তোদের বাপের বয়েসী, তায় ব্রাহ্মণ,

আমাকে কিনা—ওহে চাটুজ্জে, ওহে চাটুজ্জের পো! তোরা নয় মালই টেনেছিস, কিন্তু আমার পেটও গ্যাসে ভর্তি! কি বল গিরিধারী, বল তুমি।

পাণ্ডা মহারাজ বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললে, সো তো ঠিক কথা আছে। মানী ব্যক্তির মান রাখাই চাহিয়ে।

চাটুজ্জে এবার কলকেটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে বলতে লাগল, আরে, তোরা নয় কলকাতার ছেলেই আছিস, আমিও বাবা কাশীর ছেলে। আমিও বেরিয়ে এলুম বালাপোশখানা গায়ে দিয়ে। বুঝলে, তখনও ছোঁড়ারা চেঁচাচ্ছে—ওহে চাটুজ্জের পো!

আমিও বেরিয়ে শুরু ক'রে দিলুম, হ্যাঁ হে ছোকরারা! ওহে-তোহে করছ কাকে হে? বলি, ওহে মানে কি হে? বলি, ওহের ব্যাটা ওহে, ওহে মানে কি হে? হ্যাঁ হে ওহে ওহে ওহে, বলি ওহে মানে কি হে?

খানিকক্ষণ ওহে-তোহে করতেই, ব্যস্, ছোকরারা একদম চুপ। মুখে আর বাক্যি নেই।

আমাদের পাণ্ডা জিজ্ঞাসা করলে, এতো রাত্রে হাঙ্গামা কিসের লেগে তা কিছু বললেন তাঁরা?

তা বললেন বইকি, তা আর বলেন নি! কি বললে জান গিরিধারী? সে-কথা শুনলে চমকে উঠবে। তোমার এই কলকাতার যজমানদের ফেলে কাছা আঁটতে আঁটতে মারবে দৌড় বাড়ির দিকে।

আমাদের পাণ্ডা হা-হা ক'রে খানিকটা হেসে বললে, কি কোথা বললেন তাঁরা?

এবার চাটুজ্জে কয়েক পা এগিয়ে এসে একেবারে গিরিধারীর গা ঘেঁষে বলতে লাগল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট্টটা, বুঝলে, গোঁফের রেখা পর্যন্ত দেয় নি, দুধের ছেলে হে, কি বললে জান? বললে, রাগ করছ কেন ভাই চাটুজ্জে? আজ রাস্তায় ভাগ্যক্রমে একটা বহুৎ আচ্ছা মেয়েমানুষ মিলে গিয়েছে, তাকে ধ'রে নিয়ে এসেছি, তোমার একটা ঘর খুলে দাও, এক দিনের ভাড়া দিয়ে দোব।

কথাটা শুনে আমাদের পাণ্ডা একেবারে লাফিয়ে উঠে বলতে আরম্ভ ক'রে দিলে, সীতারাম, সিয়ারাম, এ বড় খারাব কাম আছে। তিরথ্ করতে এসে এসব কাম বড় খারাব আছে, ছি ছি ছি ছি!

চাটুজ্জে ব'লে যেতে লাগল, আরে সে-ব্যাটারা কি তীর্থ করতে এসেছিল! অমন সব ছেলে জন্ম দেওয়ার জন্যে তীর্থ করতে আসা উচিত ছিল তাদের বাপ-মায়ের, বুঝলে গিরিধারী?

গিরিধারী গম্ভীরভাবে বললে, এ কোথা ঠিকই বললেন আপনি।

চাটুজ্জে তখন ক্ষিপ্তপ্রায়। উত্তেজিত স্বরে সে ব'লে যেতে লাগল, কলকাতার লোক দেখে দেখে সর্ব্বাঙ্গের চুল পেকে গেল আমার। সেখানে বড়লোক গরিবলোক সব্বারই মেয়েমানুষ একটা ক'রে রাখা চাই, তা ঘরের বউ পরমাসুন্দরীই হোক আর যাই হোক।

গিরিধারী গম্ভীরভাবে বললে, হাঁ, তা রাজধানীর নাগরিক, সো একটু বিলাসী হোবেই। তবে মায়েরা খুবই ভালো আছেন। কলকাতার হনেক লোক হামার যজমান, হামি জানি। তীরথ্মে এলে তাদের মেজাজ একেবারে রাজরানীর মত হোইয়ে যায়, সে হামি জানি।

চাটুজ্জে হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ তুলে দুই হাত যুক্ত ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বলতে লাগল, ওরে বাবা! তাঁরা সাক্ষাৎ দেবী। ওরে বাবা, তাঁদের পুণ্যের জোরেই এ ব্যাটাদের এত লপ্চপানি চলে, নইলে কবে বংশলোপ হয়ে যেত সব ব্যাটার।

চাটুজ্জের পো চেঁচিয়েই চলল। এদিকে ক্লান্তি ও ক্ষুধায় আমাদের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে চলেছে, আর দাঁড়াতে পারি না এমন অবস্থা। কলকাতার সেই মহাত্মা বালকদের মনে মনে প্রণাম ক'রে চাটুজ্জেকে ব'লে ফেললুম, তা কলকাতার লোককে ঘর ভাড়া দিতে ইচ্ছে যদি না থাকে তো সোজাসুজি ব'লেই দিন না, আমরা অন্যত্র চ'লে চাই।

আমার কথা শুনে চাটুজ্জে এমন শিউরে উঠল যে, মনে হ'ল, তার মারাত্মক ফিক্-বেদনা ধরেছে। সে বললে, সে কি কথা, সে কি কথা বাবাজী! তোমরা খদ্দের, আমার মাথার মণি। তবে বলছিলুম কি, মাল-টাল খাও তোমরা খাবে, তাতে আমার বলবার কি থাকতে পারে? কি বল গিরিধারী? তবে ঘরটা আমার কিনা! এই মাগ্গি-গণ্ডার দিনে আমার ঘরখানা যদি বাসের অযোগ্য ক'রে ফেল, তাই একটু সাবধান ক'রে দিচ্ছিলুম। তা কিছু মনে ক'রো না, বুড়ো মানুষের কথায় রাগ ক'রো না বাবা। যাও গিরিধারী, তুমি [illegible] ওপরে নিয়ে যাও, আমি চাবি নিয়ে আসছি।

জিজ্ঞাসা করলুম, ঘরের কিরকম ভাড়া লাগবে?

সব জায়গায় যা নেয়, তাই দেবে। আমি কি তোমাদের কাছে বেশি নোব? জন-প্রতি দৈনিক এক পয়সা।

অর্থাৎ দু'জনে চোদ্দ আনা মাসে একখানা ঘর—দোতলায়।

আমি উনচল্লিশ বছর আগেকার কথা বলছি। এই উনচল্লিশ বছরের মধ্যে কাশীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধার্মিক ও নৈতিক জীবনে যে পরিবর্তন জোর ক'রে ঘটানো হয়েছে, অতি-প্রগতিশীল ন্যু-ইয়র্ক বা লণ্ডন নগরীতেও তা হয় নি। শীতকালে তুলোর জামার বদলে জনকয়েক লোকের অঙ্গে সার্জের জামা চড়েছে বটে, কিন্তু দেশসুদ্ধ লোক বস্ত্রহীন হয়েছে। অর্থনৈতিক জলসায় ঐন্দ্রজালিক কায়দায় বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে, ফলে দেশের চার ভাগের তিন ভাগ লোক আজ দু-বেলা পেট ভ'রে খেতে পায় না। আমাদের জীবনধর্মের মর্মমূল দংশন করেছে শ্বেত-উপদংশ, বিষ প্রায় মাথায় চড়েছে, এ বিষ ঝাড়তে পারে এমন ওঝা কি দেশে জন্মাবে?

যাক, একপয়সা ঘর-ভাড়া থেকে অনেক কথা এসে গেল।

চাটুজ্জে এসে তো ঘর খুলে দিলে। পুরনো দিনের ঘর, অর্থাৎ একেবারে সিন্দুকের মতো। ঘরের একটিমাত্র দরজা, একদিকের দেওয়ালের ওপরদিকে একটি বড় ঘুলঘুলি, যার নাম গবাক্ষ। দরজা বন্ধ থাকলে ওই ঘুলঘুলি দিয়ে আলো বাতাস ঘরে ঢোকে। ঘরের মেঝে মাটির, যদিও দোতলায়, তাতে দুটো-তিনটে বড় বড় ইঁদুরের গর্ত।

ঠিক হ'ল, এ-বেলায় আমরা চাটুজ্জের ওখানেই আহার করব, খরচ পড়বে জন-প্রতি তিন আনা। দরজায় তালাচাবি লাগিয়ে আমরা পূজো দিতে বেরিয়ে গেলুম।

পাণ্ডার সঙ্গে এক টাকা দর ঠিক হয়েছিল, কিন্তু এখানে দু-আনা ওখানে চার আনা এমনই ক'রে প্রায় আড়াই টাকা গচ্চা দিয়ে বিশ্বনাথের হাত থেকে তখনকার মতন রেহাই পেয়ে বাড়ি ফিরে এলুম। পাণ্ডা তখনও সঙ্গ ছাড়ে নি, কারণ তার পাওনা তখনও বাকি। ভদ্রলোক সে, বললে, আপনারা খাওয়া-দাওয়া করিয়ে লিন, হামার পাওনা সে একসময়ে লিহিয়ে লিব, কুছু চিন্তা নেই।

খাবার ডাক পড়ল। গিরিধারীই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল খাবার ঘরে। চাটুজ্জে তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুম দিচ্ছে। লাল চালের আধসেদ্ধ ভাত,

থালার এক কোণে ভাতের মধ্যে খোদল ক'রে হাতা-দুয়েক কলায়ের ডাল, আর এক কুচি ধুঁধুল-ভাজা,—এই খাদ্য কোনরকমে দু-চার গ্রাস খেয়ে তো উঠে পড়লুম। পাণ্ডা বললে, এখানে আর খেও না। তিন আনায় কাশীতে রাজভোগ মিলে, লোকটা ঠিক লোক নাহি আছে।

এবার পাণ্ডা বিদায় করার পালা। শঙ্কিতচিত্তে একটি টাকা বের ক'রে তার দিকে এগিয়ে দিলুম। কোন আপত্তি না ক'রে প্রশান্ত-হস্তে টাকাটি নিয়ে বললে, কিছু যদি মনে না করিস তো একটা কথা বলছি বাবা।

বল বাবা।

তোমাদের কাছে কত টাকা আছে ?

আমাদের তহবিলে তখন আর মাত্র পনরো-ষোলটি টাকা অবশিষ্ট ছিল। আমরা সে টাকাগুলি বের ক'রে তার সামনে রেখে দিয়ে বললুম, এই আছে আমাদের কাছে।

গিরিধারী বললে, দেখ্, হামি তোদের বড় ভাই আছে। তোদের টাকাকড়ি কাপড-চোপড় খাওয়া-দাওয়ার কোন কষ্ট হ'লে হামাকে বলবি, হামি সব ব্যবস্থা করিয়ে দেব। তোদের কোনও ভয় নেহি আছে। কাশীধামে মৌজ করিয়ে থাক্ তোরা, হামি আছে।

গিরিধারীর আশ্বাসবাণীর কোনও উত্তর দিতে পারলুম না। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর সে বললে, সন্‌ঝের সময় কোথাও যাস নি। তোদের মন্দিরে লিয়ে যাব আরতি দেখতে।

আধ-ভিজে ধুতি-দুখানা মাটির মেঝেতে পেতে, দুখানা শুকনো ধুতি পাকিয়ে বালিশ ক'রে আমরা শুয়ে পড়লুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না, দরজা-ধাক্কার আওয়াজ পেয়ে উঠে পড়লুম। উঠে দেখি, গিরিধারী দরজা ঠেলছে, তার সঙ্গে একটা লোক, লোকটার কাঁধে একটা শতরঞ্চি, দুটো বালিশ আর দুটো দিশী কালো কম্বল। আমাদের সঙ্গে বিছানাপত্তর নেই দেখে সে নিয়ে এসেছে।

তখন প্রকৃতির চোখে সন্ধ্যার ঘোর লেগেছে, আলোর প্রয়োজন। চাটুজ্জেকে সে-কথা বলতেই সে বললে, দৈনিক একপয়সা দিলে বাতির ব্যবস্থা হতে পারে।

তখুনি রেড়ির তেলের প্রদীপ ও মাটির পিল্‌সুজ এসে গেল। তখনকার মতন বাতি নিবিয়ে আমরা গিরিধারীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম মন্দিরের উদ্দেশে।

ঘণ্টা-দুয়েক এ-মন্দির সে-মন্দির ঘুরিয়ে গিরিধারী আমাদের নিয়ে গেল তার নিজের বাড়িতে। সেখানে তার বৈঠকখানায় বসিয়ে সে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে, তোরা বাড়ি থেকে কেনো ভাগিয়েছিস ?

আমরা বললুম, দাদা, আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই, বাড়ির গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই না। জীবনে উন্নতি করতে চাই। তা ছাড়া বিশ্বনাথ টেনে এনেছেন, এতে আমাদের হাত নেই।

গিরিধারী সব শুনে বলল, ঠিক আছে। বিশ্বনাথের আশ্রয়ে যখন এসেছিস, তখন সবই ঠিক হয়ে যাবে।

গিরিধারী আরও আশ্বাস দিলে, আজকাল এখানে অনেকে তেজারতির কারবার লাগিয়েছে, তাদের কারুর না কারুর দপ্তরে তোদের ঠিক বসিয়ে দেব। জয় বাবা বিশ্বনাথ !

ঠিক হ'ল, চাটুজ্জের ওখানে আর আমরা খাব না। সকালবেলা বাজারে কোথাও খেয়ে নোব, আর রাত্রে গিরিধারীর ওখানে খাব।

সে-রাত্রে গিরিধারীর ওখানে আটার লুচি, কুমড়ো আর কাঁচা-তেঁতুলের ছক্কা, করলার আচার আর রাবড়ি ভক্ষণ ক'রে বাসায় ফিরে এসে দু-দিন বাদে গা ঢেলে শুয়ে বাঁচা গেল।

মানুষের জীবনে চরম মুহূর্ত আসে মাত্র একবার। কোথাও সে জানান দিয়ে সমারোহের সঙ্গে আসে, কোথাও বা সে আসে চোরের মতন অতর্কিতে। কিন্তু পরম মুহূর্ত—সে বহুবার আসতে পারে এবং যতবার সে আসে ততবারই আসে অতর্কিতে। আমার জীবনে বিশ্বনাথের রাজধানীতে এই পরম মুহূর্ত এসেছিল অতি অতর্কিতে।

আমি ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত শীতকাতুরে। এক রাত্রি ট্রেনে ও এক রাত্রি প্ল্যাটফর্মে শুয়ে খুবই কষ্ট ভোগ করেছি। আমরা কলকাতার ছেলে, তেমন শীত সহ্য করা কোনকালেই অভ্যেস নেই। শীত ও হিম লাগার চোটে পরিতোষ বেচারীর ডান কানটা একরকম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। গিরিধারীর দয়ায় শতরঞ্চি, কম্বল ও বালিশ পেয়ে প্রথম রাত্রিটা বেশ আরামেই কাটল; কিন্তু শেষরাত্রির দিকে বারে বারে ঘুম ছুটে যেতে লাগল শীতের চোটে।

একবার এইরকম কাঁপতে কাঁপতে ঘুম ভেঙে যেতেই শুনতে পেলুম, আকাশ বাতাস ভ'রে উঠেছে কালাংড়ার করুণ গুঞ্জনে। বহুদূরে ব'সে কো স্বরশিল্পী সানাইয়ের রন্ধ্র দিয়ে ঘোষণা করছে তার হৃদয়ের ব্যথা! বোধ হয় কয়েক মুহূর্ত মাত্র—তার পরেই এল সেই পরম মুহূর্ত, যার বিনিময়ে আমি আমার বাকি জীবনটা দিয়ে দিতে পারি। সে অনুভূতির সঙ্গে ইহলোকের কোন কিছুরই তুলনা হয় না। সে একটা আনন্দময় অনুভূতি, সে আনন্দের সঙ্গে পার্থিব কোনও আনন্দেরই তুলনা করা চলে না। মন আছে বটে, কিন্তু সে জ্ঞান নেই—সেই অবস্থার সঙ্গে নিজের অস্তিত্ববোধের একটা সূক্ষ্ম যোগ আছে মাত্র। আমি যে নিজে একটা আনন্দ অনুভব করছি, তারও পূর্ণ চেতনা নেই। শুধু আছে আনন্দ, আর আছে সেই আনন্দের উৎস—কালাংড়ার করুণ কাহিনী।

কতক্ষণ এই অবস্থায় কেটেছিল জানি না। যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখলুম, দেওয়ালের কোণের গবাক্ষ দিয়ে অরুণ তার আলোকলিপি পাঠিয়েছে।

ধড়মড় ক'রে উঠে দেখি, বন্ধু পরিতোষ আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে, তার যুক্তকর কপালে সংলগ্ন।

আমার বাবা কলকাতা ছেড়ে আসামে চাকরি নিয়েছিলেন—বন-বিভাগে। সেখানে একটি শিশুকন্যার মৃত্যু হওয়ায় চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি চ'লে আসছিলেন কলকাতায়। আসবার সময় ফরিদপুরে এক বন্ধুর বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে দিনকতক সেখানে বাস করছিলেন, আমি ধরাধামে অবতীর্ণ হবার বোধহয় মাস-দেড়েক আগে। কলকাতা রওনা হবার মুখে সেখানকার এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মাকে দেখে ব'লে দিলেন যে, এ অবস্থায় নৌকো অথবা রেলে ভ্রমণ তাঁর পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। সন্তসন্তানশোকবিধুর দম্পতি ঠিক ক'রে ফেললেন, আমি ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা ফরিদপুরেই বাস করবেন। আমার সতেরো কি আঠারো দিন বয়সে আমি কলকাতা এসে পৌছেছিলুম এবং সেই থেকে এই শহরেই মানুষ হয়েছি। এর মধ্যে বাল্যে একবার পল্লীগ্রামে গিয়েছিলুম। আর বার-দুই পিসীমাদের সঙ্গে গিয়েছিলুম দেওঘরে।

কিন্তু কাশীতে এসে আমি ভারতবর্ষকে প্রথম দেখলুম। ভারতের সর্বশেষ নগরের এই নগণ্য বালকের চোখে জগতের প্রাচীনতমা সেই নগরী যে কি অঞ্জন লাগিয়ে দিলে, আজ পাশ্চাত্ত্য ক্ষতে তার সারা অঙ্গ ভ'রে উঠলেও তারই অঙ্কে মাথা রেখে শেষনিশ্বাস নেবার জন্যে সে উন্মুখ হয়ে আছে।

কাশীতে আমি যেন একটা নতুন জগতে এসে পৌঁছলুম। কলকাতা বা দেওঘর কারুর সঙ্গেই তার তুলনা হয় না। কাশীর রাস্তা, সে কেমন উঁচু-নীচু! রাস্তা দিয়ে কত রকমের লোক চলেছে, তাদের মাথায় কত অদ্ভুত রকমের টুপি, কত রকম-বেরকমের পাগড়ি! চলতে চলতে কোন জায়গায় মনে হয়, যেন রাজবাড়ির তোরণের সামনে এসে দাঁড়ালুম। কয়েকধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখি, ওমা, এ যে রাস্তা! বৈচিত্র্যহীন সিধে ও সমতল কলকাতার রাজপথের তুলনায় সেখানকার পথ অপূর্ব ব'লে মনে হতে লাগল।

এক্কা-গাড়ি সেই প্রথম দেখলুম। কেমন ছোট ছোট রথের মতন গাড়ি, তাতে গাধার মতন ছোট ছোট ঘোড়া জোতা, গলায় ঘণ্টা বাঁধা, পিনপিন ক'রে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এঁকে-বেঁকে ছুটে চলেছে! বড় বড় চওড়া রাস্তার গা দিয়ে ছবির মতন সরু সরু গলিপথ—তিনজন লোক পাশাপাশি চলা যায় না। দু-পাশে উঁচু উঁচু বাড়ি—ইট কি পাথরের তৈরি, তা বোঝা মুশকিল। কোথাও বা সেই সরু অপরিসর পথ জুড়ে বিরাট এক গাই শুয়ে আলস্যে চোখ বুজে রোমন্থন ক'রে চলেছে, মানুষ তার কোনও অসুবিধা না ক'রে পাশ কাটিয়ে চ'লে যাচ্ছে।

মুদীর দোকানে পাশাপাশি ঝুড়িতে থরে থরে মন্দিরের আকারে পরিপাটি ক'রে সাজানো রয়েছে সোনা-রঙের কাঁচা মুগের ডাল, অড়র ও খেসারির ডাল। দোকানের সামনে খদ্দেরের ভিড়, হঠাৎ সেই ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়ল বিরাট এক ষাঁড়। মুখ থেকে একহাতটাক লম্বা জিভ বের ক'রে যাদুকরের তৎপরতায় ডালের চুড়োর ওপর একবার ঘুরিয়ে পোয়াটাক মাল ভেতরে টেনে নিলে। মুদী হৈ-চৈ ক'রে তাড়া দিয়ে উঠল, আর এক-পো ডাল মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। নন্দীর পো মন্থরগতিতে ডাল চিবুতে চিবুতে একদিকে চ'লে গেল। মুদী সেই গরুর জিভের লালা-মাখানো ডাল খদ্দেরদের তুলে দিতে লাগল, কোথাও আপত্তির লেশমাত্র নেই।

ময়রার দোকানে খাবার কিনছি, হঠাৎ কে যেন পায়ে হাত দিলে। চমকে নীচের দিকে চেয়ে দেখি, একটা কুকুর তার সামনের দুটি পা জোড় ক'রে পায়ের ওপর রেখে করুণ নয়নে মুখের দিকে চেয়ে আছে।

ময়রা বললে, ও খেতে চাইছে, ওকে একখানা পুরি দাও।

একখানা পুরি কিনে দিতেই সেখানা মুখে ক'রে নিয়ে রাস্তার একপাশে গিয়ে খেয়ে ব'সে রইল—আবার তারই প্রত্যাশায় যে তার মর্যাদা বুঝবে।

সবার কাছে সে চায় না। সে লোক চিনতে পারে, কাশীর আভিজাত্য যে রক্ষা করে না সেখানকার জানোয়ারেরাও তাকে অবহেলা করে।

ছাতের ওপরে বাঁদর ঘুরছে তার হারেম ও পুত্রকন্যার পাল নিয়ে। গেরস্থ একটু অসাবধান হয়েছে কি তার বড়ি আচার লাড্ডু মেরে ভাগছে। একটা তীর-ধনুক কিংবা কাপড়ের একটা মানুষ তৈরি ক'রে টাঙিয়ে দাও, তারা বুঝে নেবে, এ গৃহস্থ চায় না যে তাদের জিনিস লুট ক'রে খাই, তারা অন্যত্র চ'লে যাবে।

সবাই বিশ্বনাথের জীব, সকলেরই বাঁচবার অধিকার আছে। যে লোক তাদের দিতে কৃপণতা করে, বিশ্বনাথ তাদের রক্ষা করুন। জয় বাবা বিশ্বনাথ!

অতি প্রত্যূষে, ভোর হবার বোধ হয় দু-ঘণ্টা আগে সানাইয়ের তানে ঘুম ভেঙে যায়। কোথায় শুরু হয়েছে কালাংড়া, তার মধ্যে কোথা থেকে ললিতের তান এসে ঢুকে পড়ল। শুঁয়োপোকার চলনের মতন অতর্কিতে এসে গেল জৌনপুরীর আবেদন, সবাইকে ডুবিয়ে দিয়ে ভঁয়রো ছড়িয়ে দিলে করুণ-গম্ভীর আকুতি—জাগো জাগো পুরবাসী! অন্ধকার অবসান হ'ল।—বলতে বলতে উদাসী ভৈরবী এসে গেল।

ব্রাহ্মমুহূর্তের আগেই ভক্তরা সব সেই শীতে বেরিয়ে পড়েছে গঙ্গাস্নান করতে। 'জয় জয় বাবা বিশ্বনাথ' রবে আকাশ ভ'রে উঠেছে। ওঠ, জাগো, ভোর হ'ল, ভোর হ'ল!

দশাশ্বমেধ ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখ, ঘৃষ্টগাত্রী বাঙালী তরুণী বিধবার দল। সমাজ তাদের সিঁথের সিঁদুর মুছে দিলেও বালার্ক প্রতি প্রত্যূষেই তাদের সীমন্তে মুঠো মুঠো সোহাগ-সিঁদুর ছড়িয়ে দিচ্ছে। সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ক'রে বাসনা-কামনা-শূন্য হয়ে কাশীতে এসে প্রতি প্রভাতে তারা কাকে প্রণাম করে? কি উদ্দেশ্যে?

স্নানান্তে স্ত্রীপুরুষ সব ঘরে ফিরে চলেছে, কিন্তু কোন তাড়া নেই—চলেছে তো চলেইছে। এখানে জল ঢালছে, ওখানে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। দশটায় ট্রাম ধরবার তাড়া নেই, অধিকাংশেরই এক-বেলা আহার, একসময়ে গিয়ে চড়িয়ে দিলেই হবে। অদ্ভুত হালচাল সব; সাত্ত্বিকতা ও তামসিকতা জড়াজড়ি ক'রে যেন বিশ্বনাথের পায়ে লুটিয়ে পড়ছে। জয় বাবা বিশ্বনাথ!

দিনশেষে আবার ছুটবে সুরের প্রস্রবণ। বয়স্কেরা তখন ঘাটে এসে স্থির হয়ে ব'সে যায় গঙ্গামুখী হয়ে। শুঁয়োপোকা গুটি বাঁধবার আগে যেমন স্থির হয়ে গাছের ডালে আটকে যায়, জীবনবিহঙ্গ পক্ষ বিস্তার করবার আগে তারা

যেন তেমনই স্থাণু হয়ে গিয়েছে। কাশীর সব ভালো, সব ভালো—এই তাদের বুলি। কাশী ছেড়ে কোথাও নড়ব না, এখানেই মরতে হবে, এখানে মরলে আর জন্মাতে হবে না, এখানে মরলে শিব হয়, এখানে শব নেই, সব শিব।

কাশী বাবা-বিশ্বনাথের স্থান, তিনি এখানে কারুকেই অভুক্ত রাখেন না। মানুষ তো দূরের কথা, পশুপক্ষীও কেউ অভুক্ত থাকে না। রাস্তায় রাস্তায় ছত্র, সেখানে ঠিক সময়ে উপস্থিত হ'লে পেট পুরে খেতে পাওয়া যাবে। যদিও সেদিন আর নেই, কিন্তু বেশিদিনের কথা নয়, আমি যেদিন কাশীকে প্রথম দেখেছিলুম সেদিন এমনই ছিল।

দিন-চারেক এমনই কাটল, কিন্তু চাকরি-বাকরির কিছুই ঠিক হ'ল না। গিরিধারীকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, কিছু ভাবনা নেই, এখন মৌজ কর, সব ঠিক হোইয়ে যাবে।

মৌজের অপর্যাপ্ত উপাদান চারিদিকে ছড়িয়ে আছে স্বীকার করলেও মাথার ওপরে ওই দুর্ভাবনার বোঝা নিয়ে যে মৌজ করা সম্ভব নয়—সে-কথা গিরিধারী কিছুতে বোঝে না। সকালবেলা বাজার থেকে পুরি-মিঠাই কিনে খাই, রাত্রে গিরিধারীর ওখানে মাগনায় রাজভোগ জোটে। এদিকে ট্যাঁকের অবস্থা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে, ভেবে-চিন্তে কিছুই ঠিক করতে পারি না। শেষকালে গিরিধারীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক করা হ'ল যে, চাটুজ্জের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমরা আপাতত একটা ধর্মশালায় গিয়ে থাকব। গিরিধারীই সেখানকার একটা ভালো ঘর ঠিক ক'রে দিলে। ঠিক হ'ল, সকালবেলা এখানে সেখানে খেয়ে রাত্রে তার ওখানেই খাব। কাজকর্ম ঠিক হয়ে গেলে, তখন তিন-চার টাকা দিয়ে একটা বাড়ি ভাড়া আর টাকা-পাঁচেক দিলেই একজন বাঙালী বিধবা পাওয়া যাবে, তিনি আমাদের রান্নাবান্না ও সংসারের সমস্ত ব্যাপারই তদারক করবেন। গিরিধারী আরও আশ্বাস দিলে যে, মুন্সী মাধোলালের (পরে রাজা) দপ্তরে আমাদের এক-একটা কাজের ব্যবস্থাও সে ক'রে ফেলেছে—মাসে কুড়ি টাকা মানে আর ইংরেজিতে চিঠিপত্র লিখতে পারলে দেখ্ দেখ্ ক'রে মাইনে বেড়ে যাবে। জয় বাবা বিশ্বনাথ!

চাটুজ্জের সঙ্গে হিসেবনিকেশ শুরু হ'ল—চার দিনের ঘরভাড়া দু'জনের দু-আনা, চার দিনের প্রদীপ-ভাড়া এক আনা।

চাটুজ্জে বললে, চার দিনের চার পয়সা চৌকিদার আর চার পয়সা পায়খানার ভাড়া দিতে হবে।

আমরা বললুম, শহরে আবার চৌকিদার কি?

সে বললে, শহরের নয়, বাড়ির চৌকিদার।

শেষদিনে আমরা পায়খানা ব্যবহার করি নি, কিন্তু চাটুজ্জে বললে, বাড়িতে থাকলেই পায়খানার ভাড়া দিতে হবে।

গিরিধারী বললে, লোকটা চামার আছে।

বিদায়ের সময় চাটুজ্জে গদগদ হয়ে বললে, যাও বাবা, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও বাপ-মা'র কোলে। বিয়ের পর বউমাকে নিয়ে যখন বিশ্বনাথ দর্শন করতে আসবে—আসতেই হবে—তখন এখানেই এসে উঠো। বুড়ো চাটুজ্জেকে ভুলো না বাবা।

বুড়ো চাটুজ্জেকে ভুলি নি। চৌকিদার আর পায়খানার জন্যে সেদিন অসহায় ছেলেমানুষ পেয়ে সেই যে ক'টা পয়সা জোর ক'রে সে আদায় করেছিল, তার প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে মনের মধ্যে জাগ্রতই ছিল। তাই বিয়ের বোধ হয় বছরখানেক পরেই গুরুদেবীকে নিয়ে ছুটে গিয়েছিলুম সেখানে, কিন্তু তার বরাত ছিল ভালো, গিয়ে শুনলুম, কয়েক বছর আগেই সে কাশীপ্রাপ্ত হয়েছে।

চাটুজ্জের হিসেব চুকিয়ে বালিশ, কম্বল ও শতরঞ্চি গিরিধারীর বাড়িতে জমা দিলুম, রাত্রে খেয়ে-দেয়ে যখন ধর্মশালায় যাব তখন নিয়ে যাব।

রাস্তায় তো বেরিয়ে পড়া গেল। ধর্মশালায় বিনা পয়সায় থাকতে পাব, একবেলা বিনা পয়সায় আহার, মন অনেক নিশ্চিন্ত। ঠিক করা গেল, আজ আর পয়সা খরচ ক'রে খাব না। লোকে বলে, বিশ্বনাথ কারুকে অভুক্ত রাখেন না—এই বাক্য প্রমাণ করবার একটা সুযোগ বিশ্বনাথকে দেওয়াই যাক। সন্ধ্যাবেলা গিরিধারীর ওখানে খাবার তো ঠিকই আছে।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। একবার দূরে একজন মুখচেনা লোক দেখতে পেয়ে টপ ক'রে একটা গলিতে ঢুকে পড়া গেল। লোকটা কিন্তু সেই গলিতেই ঢুকে বনবন ক'রে আমাদের পেরিয়ে চ'লে গেল, আমাদের দিকে ফিরেও তাকালে না।

জয় বাবা বিশ্বনাথ!—ব'লে হাঁপ ছেড়ে আবার বড় রাস্তায় বেরিয়ে পড়া গেল। কিন্তু কাশী এক বিচিত্র দেশ বাবা! ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যে কত চেনা মুখ চোখে পড়ল তার ঠিক নেই। এরকম পথে পথে ঘুরলে হয়তো ধরাই প'ড়ে যাব। ওদিকে দিনের আলো থাকতে থাকতে ধর্মশালায় যেতে পারি না,

কারণ সেখানে হরদম বাঙালী যাত্রী আসছে যাচ্ছে। কোথা দিয়ে কোন্ চেনা লোকের সামনে প'ড়ে গেলে কেলেঙ্কারির অন্ত থাকবে না—এইসব ভেবে গলির গলি তস্য গলির মধ্যে নির্জন জায়গা দেখে একটা বাড়ির রকে গিয়ে দু'জনে ব'সে রইলুম।

খিদেয় পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছে; কিন্তু সংকল্প করেছি, কিছুতেই পয়সা খরচ ক'রে খাব না। বিড়ি ফুঁকছি আর দু'জনে পরামর্শ ক'রে আকাশে প্রাসাদ তৈরি করছি। নির্জন রাস্তা, তবু মাঝে মাঝে এক-আধজন স্ত্রীপুরুষ যাচ্ছে, যাবার সময় অবাক হয়ে আমাদের দেখছে, আর আমরা মনে মনে শঙ্কিত হচ্ছি। সেখান থেকে উঠে অন্য কোথাও গিয়ে বসব ব'লে মনে করছি, এমন সময় গৈরিকবস্ত্রধারিণী এক সন্ন্যাসিনী ধীরপদক্ষেপে আমাদের সামনে দিয়ে চ'লে গেলেন। সন্ন্যাসিনী গৌরী—শুধু গৌরী নয়, অপূর্ব সুন্দরী। এ শ্রেণীর সৌন্দর্য ইতিপূর্বে আমি আর দেখি নি। বয়স মনে হ'ল তিরিশের কাছাকাছি হবে; কিন্তু পরে শুনেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি। একখানা লালপেড়ে গেরুয়া রঙের শাড়ি পরা, গায়ে একখানা বাসন্তী রঙের রেশমের নামাবলী, চুল ঝুলছে প্রায় হাঁটু ছাড়িয়ে, ডান হাতে ঝোলানো একটা ঝকঝকে তামার কমণ্ডলু। কি অসীম মমতা তাঁর চাহনির মধ্যে স্তব্ধ, দেখলেই মনের মধ্যে আশ্বাস জেগে ওঠে। ওষ্ঠাধরের এমন গঠন যে, মনে হয়, হাসছেন। সন্ন্যাসিনী আমার দিকে এমন ভাবে চাইতে চাইতে এগিয়ে গেলেন যে, মনে হ'ল, আমাদের যেন চিনতে পেরেছেন। তিনি কিছুদূর এগিয়ে যেতেই পরিতোষ বললে, কি রে, চেনা নাকি?

কি জানি ভাই, ঠিক বুঝতে পারছি না।

নিশ্চয় চেনা, না হ'লে তোকে দেখে অমন হাসতে হাসতে গেল কেন?

তা হ'লে চল্, এখান থেকে স'রে পড়া যাক।

একখানা ধুতি পেতে দু'জনে জমাট হয়ে বসা গিয়েছিল। তড়াক ক'রে উঠে উল্‌টো দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ধুতিখানা গুটোচ্ছি, এমন সময় কানের মধ্যে মধু বর্ষিত হ'ল, গোপাল!

দেখি, সন্ন্যাসিনী ফিরে এসে প্রায় আমাদের কাছেই দাঁড়িয়েছেন। পরিতোষ বললে, বোধ হয় তোকে ভুল করেছে।

আবার মধু বর্ষিত হ'ল, গোপাল!

জিজ্ঞাসা করলুম, আমাকে ডাকছেন?

সন্ন্যাসিনী একবার সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললেন, এখানে দাঁড়িয়ে কেন গোপাল ?

আমরা তো একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। সামান্য সেই দুটি কথায় কি মমতা, কি আকর্ষণ ! জয় বাবা বিশ্বনাথ !

সন্ন্যাসিনী ধীরপদক্ষেপে একেবারে আমার সামনে এসে স্থির দৃষ্টিতে হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নেবার চেষ্টা ক'রেও পারলুম না, একটা সুখদায়ক শৈথিল্যে আমার সর্বাঙ্গ যেন ভ'রে আসতে লাগল।

সন্ন্যাসিনী আর এক পা এগিয়ে এসে বললেন, ছি গোপাল, বেলা গড়িয়ে গেল, সারাদিন না খেয়ে এখানে ব'সে থাকবে ! চল।

সন্ন্যাসিনী এগিয়ে চললেন, আর আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলুম। বন্ধু পরিতোষ যে পেছনে দাঁড়িয়ে, সে খেয়ালও রইল না।

কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে আমার দিকে ফিরে সন্ন্যাসিনী জিজ্ঞাসা করলেন, কই, বন্ধু এল না ?

ততক্ষণে আমার সম্বিৎ ফিরে এসেছে ; কিন্তু আমি পরিতোষকে ডাকবার আগেই তিনি দ্রুতপদবিক্ষেপে তার কাছে গিয়ে থুতনিতে হাত দিয়ে আদর ক'রে বললেন, দাঁড়িয়ে কেন বন্ধু ? চল।

পরিতোষ গুটিগুটি তাঁর পেছনে চলতে আরম্ভ করলে।

প্রায় দশ-বারো মিনিট এ-গলি সে-গলি ঘুরে সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে আমরা একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকলুম। তিনতলা বাড়ি, একতলাটি ঝকঝক করছে পরিষ্কার। কাশীর গলির হিসাবে বেশ বড় বাড়িই বলা যেতে পারে। দরজা দিয়ে একটা সরু গলি-পথ। সেটুকু পেরিয়ে মাঝারি-গোছের একটা উঠোন, লাল বেলে-পাথর দিয়ে বাঁধানো। উঠোনের এক কোণে ছোট্ট একটি বাঁধানো কুয়ো। কুয়োর পাড়ে সোনার মতন ঝকঝক করছে একটা লোটা, তার গলায় সাদা ধপধপে সুতোর দড়ি বাঁধা। পাশাপাশি চার-পাঁচটা ঘরে তালা লাগানো। সন্ন্যাসিনী পাশাপাশি তিনটে ঘরের তালা পটপট ক'রে খুলে ফেলে আমাকে বললেন, গোপাল, এই একতলাটা তোমার। দোতলা-তেতলায় সব ভাড়াটে থাকে।

আমি একেবারে বাক্যহীন। পরিতোষ বেচারী একে ভালোমানুষ, তার ওপরে কাশীতে পদার্পণ করার পর থেকেই একটা কান তার প্রায় বন্ধ, ব্যাপার-

ব্যাপার দেখে সে তো একেবারে হতভম্ব। ট্রেনে কাশীর গুণ্ডা, পাণ্ডা, কাশীর জোচ্চোর ইত্যাদির অনেক আজগুবী গল্প শুনেছিলুম বটে, কিন্তু এরকম ব্যাপার তাদের অভিজ্ঞতা বা আমাদের কল্পনা কোথাওই ছিল না।

একটা মাঝারি-গোছের ঘর। একধারে বড় একটা তক্তাপোশ, তার ওপরে ধপধপে সাদা উঁচু বিছানা পাতা। ঘরের আর-একদিকে একটা বেঁটে ষণ্ডা-গোছের চৌকির ওপরে পাহাড়ের মতন বালিশ, লেপ, তোশক সাজানো। মেঝের একদিকে একটি সুদৃশ্য ছোট্ট জলচৌকির ওপর একটা ঝকঝকে পেতলের পিলসুজ, তার মাথায় পেতলেরই একটা প্রদীপ। এই ঘরের মধ্যে আমাদের নিয়ে এসে সন্ন্যাসিনী পরিতোষকে বললেন, বন্ধু, এইটে তোমার ঘর। তারপরে নিজের হাতে আমাদের গা থেকে শার্ট খুলে শুদ্ধ হিন্দী সুরে কোকিলকণ্ঠে তান ছাড়লেন, রসিয়াকি মায়ি!

রসিয়াকি মায়ি বোধ হয় কাছাকাছিই কোথাও ঘুম লাগাচ্ছিল, ডাক শোনামাত্র 'আয়ি' ব'লেই এসে দাঁড়াল।

সন্ন্যাসিনী বললেন, কুয়ো থেকে জল তুলে এদের স্নান করিয়ে দাও।

আমরা কুয়োতলায় গিয়ে দাঁড়ালুম। রসিয়াকি মায়ি একটা তোলা উনুনে আগুন দিয়ে সেটাকে উঠোনের এক কোণে রেখে বালতি ক'রে জল তুলে আমাদের স্নান করাতে লাগল। এতক্ষণে একটু ফাঁকা পেয়ে পরিতোষকে বললুম, ব্যাপার কি রে?

পরিতোষ আস্তে আস্তে বললে, আমাদের বরাত ভালোই বলতে হবে।

এমন সময় সন্ন্যাসিনী দুখানা কাপড় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। একখানা সাদা থান পরিতোষকে দিয়ে বললেন, বন্ধু, তুমি এইটে পর।

আর একখানা, সেখানা গেরুয়া রঙে ছোপানো লালপেড়ে শাড়ি, আমাকে দিয়ে বললেন, গোপাল, তুমি এখানা পর, দিব্যি মানাবে।

স্নান সেরে হি-হি করতে করতে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি, মেঝেতে দুখানা কার্পেটের আসন পাতা, তার সামনে দুটি থালায় মিষ্টি সাজানো। আমরা জামা পরছি, এমন সময় সন্ন্যাসিনী ঘরের মধ্যে ঢুকে বললেন, গোপাল, বন্ধু, তোমরা একটু জল খেয়ে আরাম কর, ভাত হয়ে গেলেই ডাকব, বুঝলে?

এই ব'লে পরিতোষকে খানিকটা আদর ক'রে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

খাওয়া শেষ-হওয়া-মাত্র রসিয়াকি মায়ি এসে থালা-দুখানা তুলে নিয়ে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে আমরা বিছানায় লুটিয়ে পড়লুম।

বোধ হয় সাতদিন বাদে বিছানা পেয়ে তো পরিতোষ মহাখুশি। সে ছিল একাধারে শয়ন ও নিদ্রা বিলাসী। পায়ের কাছ থেকে লেপটা তুলে নিয়ে একটা প্রকাণ্ড পাশ-বালিশ জড়িয়ে পাশ ফিরে সে ঘুমের আয়োজন শুরু ক'রে দিলে। আমার কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা বিশেষ ভালো লাগছিল না। মনে হচ্ছিল, সন্ন্যাসনী যেন পরিতোষকেই বেশি খাতির-যত্ন করছে। তার ওপরে 'গোপাল' ডাকে আমার আত্মাভিমানে একটু আঘাতও যে না লাগছিল তা নয়। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে একটা রহস্য ব'লে মনে হচ্ছিল, খালি মনে হতে লাগল, এর কিছু একটা মতলব আছে।

আমার বাবার নিকট-সম্পর্কীয়া এক জ্যাঠাইমা কাশীবাস করতেন। দু-চার বছর অন্তর তিনি কলকাতায় এসে দু-তিন মাস ক'রে আমাদের বাড়িতে থেকে যেতেন। তিনিও এই সন্ন্যাসিনীর মতন গেরুয়া পরতেন। তবে তিনি ছিলেন বিধবা, তাই সাদা থান গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে ব্যবহার করতেন। আমার কিরকম সন্দেহ হতে লাগল যে, বাবা আমার পলায়ন-সংবাদ ঠাকুমাকে পাঠিয়েছেন এবং সন্ন্যাসিনী ঠাকুমারই চর। আমাদের দেখেই ব্যাপার বুঝতে পেরে বাড়িতে এনে যত্ন ক'রে খাইয়ে-দাইয়ে আটকে রাখবে, তারপরে ঠাকুমা এসে গ্রেপ্তার ক'রে আমাদের কলকাতায় চালান ক'রে দেবে। এ-সম্বন্ধে পরিতোষের সঙ্গে যে একটু পরামর্শ করব তার উপায় নেই। কাশীতে পদার্পণ করা অবধি ছোটখাটো কথা সে কানেই তুলছে না। ঠাকুমার হাতে ধরা পড়বার যে উদ্বেগ আমাকে অস্থির ক'রে তুলছিল, সে-কথা তাকে জানাতে গেলে এখন বাড়িসুদ্ধ লোক হয়তো শুনে ফেলবে। পাশের ঘরেই সন্ন্যাসিনী রান্না করছেন, তার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আর দেরি করা উচিত হবে না মনে ক'রে পরিতোষকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিলুম। ধড়মড় ক'রে উঠে সে বললে, কি রে ?

ঠিক সেই সময়ে হেঁড়ে গলায় বাইরে কে হাঁক দিলে, গুরুমায়ি! হে গুরুমায়ি!

তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে দেখলুম, এক-বালতি দুধ নিয়ে এসে গয়লা দাঁড়িয়ে আছে, লোকটা বোধ হয় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা হবে, তার ওপরে মাথায় একখান ময়লা কাপড়ের পাগড়ি।

গুরুমা রান্নাঘর থেকে একটা কাঁসার বাটলোই-গোছের বাসন নিয়ে বেরিয়ে এসে তার সামনে ঠন ক'রে রেখে বললেন, স্বরূপ, আজ থেকে তু'সের তুধ চাই, আমার গোপাল এসেছে।

আচ্ছা মায়ি।—ব'লে সে আট পাত্র তুধ মেপে ঢেলে দিয়ে চ'লে গেল।

আমি তখনও দরজার ধারে দাঁড়িয়ে আছি, পাত্রটা নিয়ে গুরুমা রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, ঘুমোও নি গোপাল ?

ঘাড় নেড়ে জানালুম, না।

বন্ধু ঘুমিয়েছে ?

খাটের দিকে চেয়ে দেখি, ওরই মধ্যে পরিতোষ রাস্কেল আপাদ-মস্তক লেপ-মুড়ি দিয়ে আবার শুয়ে পড়েছে। বললুম, হ্যাঁ, ও ঘুমিয়েছে।

তা হ'লে চ'লে এস, গল্প করি।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখলুম, একটা ছোট্ট পেতলের হাঁড়িতে ভাত নামানো রয়েছে। একটা পেতলের কড়ায় ডাল ফুটছে। একখানা পাথরের থালার ওপরে কতকগুলো তরকারি কোটা রয়েছে। গুরুমা তুধটা রাখতে রাখতে বললেন, ডালটা নামলেই তরকারি চড়িয়ে দোব, এক্ষুনি হয়ে যাবে। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি ?

বললুম, না, এই তো খেলুম।

আমার এই উত্তরের মধ্যে কি ছিল জানি না, গুরুমা খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন। তাঁর কাছ থেকে এমন হাসি আশা করি নি।

গুরুমা রাঁধতে রাঁধতে প্রশ্ন করতে লাগলেন, নাম কি ? বন্ধুর নাম কি ? বাড়িতে কে আছে, কেন পালিয়েছ, কি করবার মতলব আছে, ইত্যাদি।

সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বার ক'রে তিনি বললেন, তোমরা এইখানেই থেকে যাও। ব্যবসা করতে চাও তো ? আমি তোমায় ভালো ব্যবসা ক'রে দোব। বন্ধুকে বুঝিয়ে ব'লো, কোনও ভয় নেই তার। তোমার কিছু ভালো হ'লে তারও ভালো হবে। কিন্তু তোমরা তো এখনও ছেলেমানুষ, একটু বড় হও, তারপরে ব্যবসা ক'রো।

ডাল নামিয়ে তরকারি চাপিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে কড়ার ওপরে আর একটা পেতলের সরা উপুড় ক'রে বসিয়ে দিয়ে গুরুমা আমার সামনে এসে ব'সে আমার মুখের দিকে চেয়ে এমনভাবে মৃত্যু মৃত্যু হাসতে লাগলেন যে,

কি জানি, আমার লজ্জা করতে লাগল। গুরুমা আমার মুখখানা তাঁর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, জান গোপাল, তুমি যে আসছ, তা আমি আগেই জানতে পেরেছিলুম।

আমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন ও বুদ্ধির অগোচরে যে আরও একটা রহস্যলোক আছে, সেখানকার ইঙ্গিত এই প্রথম এল আমার জীবনে। তারপরে সারাজীবন ধ'রে আভাসে ইঙ্গিতে সেখানকার কত বার্তাই আমার কাছে এসে পৌঁছল, কিন্তু সে-লোকে প্রবেশ করবার হদিশ আজও পেলুম না। জীবনের এই অভিজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্যেই এই জাতকের অবতারণা, এই অভিজ্ঞতার জন্যেই আমি মহাস্থবির।

গুরুমার কথা শুনে চমকে উঠলুম। বললুম, সত্যি! কি ক'রে জানতে পারলেন গুরুমা?

গুরুমা হাসি-হাসি মুখে ব'লে যেতে লাগলেন, আমি জানি, আমার গোপাল দুঃখ পেয়েছে। জানি যে, তার সখীকে অন্য লোকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছে।

আমি একেবারে স্তব্ধ, বাক্যহারা!

গুরুমা বলতে লাগলেন, আচ্ছা গোপাল, একবার উঁচু ছাত থেকে প'ড়ে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, একবার জলে ডুবে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, শিশু অবস্থায় একবার খাট থেকে প'ড়ে মাথার বাঁ দিকটা কেটে গিয়েছিল?

এ খবরটা আমার জানা ছিল না। বললুম, না।

গুরুমা ঘাড় নেড়ে 'দেখি' ব'লে আমার সেই চিরুনি-বসে-না এমন ঘন কোঁকড়া চুল ফাঁক ক'রে ক'রে দাগ খুঁজতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর বললেন, এই তো দাগ রয়েছে।

তারপর আয়না এনে মাথার বাঁ দিকে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা একটা দাগ দেখিয়ে হেসে বললেন, এটা কি?

এই দাগের অস্তিত্ব আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল। বাড়িতেও কারুর কাছে শুনি নি, চুল আঁচড়াবার সময়ও কখনও চোখে পড়ে নি।

বিস্ময়সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিলুম, হঠাৎ একবার গুরুমার দিকে চেয়ে দেখি যে,

কড়ার ওপর থেকে উপুড়-করা সরাটা নামিয়ে হাতা দিয়ে তিনি তরকারিটা নাড়াচাড়া করছেন, আর তাঁর চোখ-মুখ ঘিরে একটা দুষ্টু-হাসি জলজল করছে।

আশ্চর্য মানুষের মন! সে হাসি দেখেই আমার মনে কিরকম একটা সন্দেহ উঁকি মারতে আরম্ভ ক'রে দিলে। মনে হতে লাগল, হয়তো বাবা আমার জীবনের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা ক'রে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন অথবা ঠাকুমার মুখে সব শুনে আমিই সেই লোক কিনা প্রশ্ন ক'রে ক'রে গুরুমা ফাঁকি দিয়ে সব জেনে নিলেন। নিশ্চয়ই তাই, তা না হ'লে আমার জীবনের এত কথা তিনি জানবেন কি ক'রে? বুকের মধ্যে হা-হা ক'রে উঠল। চোখের সামনে দেখতে লাগলুম, আবার সেই কলকাতার বাড়ি, ইস্কুল, ইকোয়েশন আর কম্পাউণ্ড প্র্যাক্‌টিস-এর ছক ও অক্ষরগুলো চোখের সামনে যেন ভেংচে ভেংচে নাচতে আরম্ভ ক'রে দিলে—সে জীবন কল্পনা করতে ভয় লাগে।

এদিকে এই ষড়যন্ত্র চলেছে আর পরিতোষটা কিনা ও-ঘরে নিশ্চিন্ত আরামে পাহাড়ের মতন গিদ্দে জাপটে লেপ-মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে! আর নয়, মনে মনে ঠিক ক'রে ফেললুম, এই মুহূর্তেই পরিতোষকে তুলে নিয়ে গুটিগুটি স'রে পড়ব।

সঙ্কল্প স্থির ক'রে আস্তে আস্তে উঠে দরজার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় গুরুমা রান্না ফেলে একরকম ছুটে এসে আমার সামনে দু'হাত প্রসারিত ক'রে দাঁড়িয়ে বললেন, কোথায় যাচ্ছ?

ও-ঘরে!

ছি গোপাল, আমাকে অবিশ্বাস! ছি ছি ছিঁ!

কথাগুলো আন্তরিকতায় ভরা হ'লেও আমার মনের সন্দেহ তখনও সম্পূর্ণরূপে কাটে নি। গুরুমা আমার কাঁধে একটা হাত রেখে আর একটা হাত থুতনিতে দিয়ে মুখখানা উঁচু ক'রে ধরলেন। ততক্ষণে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। চোখের ওপরে কিছুক্ষণ দৃষ্টি স্থির রেখে বললেন, গোপালের চোখে জল?

কথাটা শেষ হতে-না-হতে গুরুমা দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টেনে এনে দুই বাহু দিয়ে জোর ক'রে আমার মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরলেন। সামান্য একটু অস্বস্তি বোধ করলেও সে-আলিঙ্গনের মধ্যে এমন একটা আশ্বাসময় ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল যে, আমার মনে হতে লাগল, এই সঙ্কটময় ভবার্ণবে একমাত্র আশ্রয়ের অঙ্কে আমি যেন শুয়ে আছি, মাথার মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে আওয়াজ

হতে লাগল, ওদিকে উনুনের ওপরকার তরকারির সেই ঝাঁ-ঝাঁ—এই দুইয়ে মিলে সম্বিৎহারা হয়ে প্রাণপণে সেই আধারকে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধ'রে কঠিন ধরণী ভেদ ক'রে আমি যেন বোঁ-বোঁ ক'রে নীচে নেমে যেতে লাগলুম।

মিনিট দুই-তিন পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে আমিই প্রথমে ছেড়ে দিলুম। গুরুমা আমার হাত ধ'রে নিয়ে এসে আবার সেই জায়গায় বসিয়ে দিলেন।

গুরুমা রাঁধতে লাগলেন। আমি ব'সে ব'সে কখনও মেঝের দিকে চেয়ে, কখনও হাতের দিকে চেয়ে, সময় কাটাতে লাগলুম। মুখ তুলে তাঁর দিকে চাইতে, কি জানি, লজ্জা হচ্ছিল। তবুও মনে হতে লাগল, তিনি যেন আমার কতদিনের পরিচিত! খানিকটা মান-অভিমানের ঝগড়া তাঁর সঙ্গে হয়ে গেল। দোষ আমারই, শুধু বয়সে ছোট ব'লে কেঁদে জিতে গেলুম।

কিছুক্ষণ খুন্তি দিয়ে কড়ার তরকারি নাড়াচাড়া ক'রে গুরুমা বললেন, আচ্ছা গোপাল, একটা কথা ঠিক বলবি?

এতক্ষণ তিনি আমাকে 'তুমি' সম্বোধন করছিলেন, এই প্রথম 'তুই' বললেন।

বললুম, হ্যাঁ, বলব।

আচ্ছা, এর আগে আমাকে কখনও দেখেছিলি?

আমি জীবনে বার বার উপলব্ধি করেছি, নারীজাতির মনোরঞ্জন করবার সহজাত শক্তি নিয়ে যে জন্মায়, যে-কোন বয়সের যে-কোন শ্রেণীর নারী দেখবামাত্র তাকে চিনতে পারে, অর্ধনারীদের কথা স্বতন্ত্র। এই দুর্লভ শক্তিও নারীজাতির সহজাত। গুরুমার এই প্রশ্নের উত্তর আমাকে আর ভাবতে হ'ল না। মুখ দিয়ে আপনিই বেবিয়ে গেল, হ্যাঁ, দেখেছি। ওঃ, কতবার তার আর ঠিকানা নেই!

আমার কথা শুনে গুরুমা ফিক ক'রে হেসেই মুখখানা নীচু ক'রে ডান হাতের কব্জির উল্টো-পিঠ দিয়ে মাথার চুল সরাতে লাগলেন, যেন হাসিটা আমার চোখে না পড়ে।

একটু পরে মুখ তুলে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি রকম? কোথায় দেখেছিস?

রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ বার পঞ্চাশেক পড়া ছিল। এত শিগগিরই যে সেটা কাজে লাগবে, তার কোন ধারণাই আমার ছিল না। তাঁর অলৌকিক কাব্যরসকে কতবার যে আমি লৌকিক কার্যোদ্ধারের জন্যে প্রয়োগ ক'রে সাফল্য

লাভ করেছি, সে-কথা তাঁকে কখনও জানাই নি। জানাই নি, তার কারণ আমি মহাস্থবিরত্ব লাভ করার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি মহাপ্রয়াণ করেছেন।

আমি শুরু ক'রে দিলুম, জানেন গুরুমা, কাশীতে আসবার বোধ হয় বছর-খানেক আগে থেকেই প্রায় প্রতি রাত্রেই স্বপ্নে একজন আমাকে দেখা দিত। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকত আর বলত, গোপাল, তুই আমার কাছে চ'লে আয়।

গুরুমা দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু তখন আমার কল্পনার গ্রামোফোন খুলে গিয়েছে।

আমি ব'লে চললুম, কিন্তু তার মুখে থাকত ঘোমটা, মুখখানা দেখতে পেতুম না। আমি রোজই বলতুম, কে তুমি রহস্যময়ী, একবার অবগুণ্ঠন খোল, দেখি তোমায়। তখুনি সে মূর্তি মিলিয়ে যেত, সঙ্গে সঙ্গে আমারও ঘুম ভেঙে যেত।

এমনই রোজই চলছিল। একদিন সে এসে যেমন আমাকে হাতছানি দেওয়া, আর কোনও কথা না ব'লে টপ ক'রে তার অবগুণ্ঠন খুলেই দেখি, সে আপনি।

অ্যাঁ!—ব'লে গুরুমা একেবারে চমকে উঠলেন। তারপরে অত্যন্ত শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, তার পর?

তারপর আর আপনার দেখা পেলুম না। তবে আমি জানতুম, কাশীতে আপনার দেখা পাবই। তাই এত জায়গা থাকতে তো কাশীতে এসেছি।

সত্যি বলছিস?

সত্যি।

বন্ধু জানে এ-কথা?

না।

তা হ'লে ওকে আর কিছু বলিস নি।

এই কথা ব'লেই গুরুমা উঠে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আমার কাছে ফিরে এলেন। আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম, তিনি আমার দুই কাঁধে হাত দিয়ে ঠেলে নিয়ে গিয়ে তাঁর খাটে বসিয়ে দিয়ে বললেন, দেখ্ গোপাল, এ ঘরে যতক্ষণ থাকবি, ততক্ষণ আমাকে 'আপনি' না ব'লে 'তুমি' বলবি, বুঝলি?

আচ্ছা, গুরুমা।

এ ঘরে যতক্ষণ থাকবি, ততক্ষণ আমাকে 'গুরুমা' বলিস নি।

কি বলব?

একটু চোখ বুজে কি ভেবে তিনি বললেন, আমাকে ‘রাজকুমারী’ ব’লে ডাকবি, বুঝলি ?

তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ থেকে তখনও পর্যন্ত বোধ হয় চার ঘণ্টা কাটে নি।

যাক, বেলা প্রায় তুটোর সময় আমাদের খাওয়া-দাওয়া তো সমাধা হ’ল। অতি সুন্দর সুগন্ধ আলোচালের ভাত, তার ওপরে যতখানি ইচ্ছে গব্যঘৃত। চমৎকার মুগের ডাল, তাতে বড় বড় বাঁধাকপির পাতা। আলু ও উচ্ছে ভাতে একসঙ্গে মাখা। ফুলকপি ও আলুর একটা শুকনো-শুকনো, ভাজাও নয় চচ্চড়িও নয় গোছের তরকারি।

ক’দিন থেকে তু’বেলা পুরি-কচুরি খেয়ে খেয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। গুরুমার ওখানে খেয়ে যে কি তৃপ্তি পেলুম, তা কি বলব !

গুরুমা বললেন, ভালো লাগল না, বুঝতে পারছি। নিরামিষ খাওয়ার অভ্যেস তো নেই।

বললুম, না আমাদের নিরামিষ খাওয়ারই অভ্যেস, মাছ-মাংস কালে-ভদ্রে খাই।

আমার হেঁসেলে তো মাছ-মাংস হয় না, জন্মে কখনও খাই নি তাই হয় না, রাঁধতেও জানি না। যেদিন মাছ-মাংস খাওয়ার ইচ্ছে হবে ব’লো, ভাড়াটেদের ঘরে তৈরি করিয়ে নোব।

এই আশ্বাসবাণী শুনে পরিতোষের মুখ খুশিতে একেবারে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বললে, আপনাকে কি ব’লে যে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাব, তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

গুরুমা একটু হেসে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, আর খুশিতে সে একেবারে গ’লে পড়তে লাগল।

একটু পরে গুরুমা বললেন, আচ্ছা, এবার তোমরা আরাম কর, আমি খেয়ে নিই।

হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমাদের জন্যে আপনারও দেরি হয়ে গেল।

একটু হেসে দরজার দিকে অগ্রসর হতে হতে গুরুমা আমায় বললেন, গোপাল, ঘুমিও না। আমার খাওয়া হ’লে ডাকব, গল্প করতে হবে।

গুরুমা আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে পরিতোষকে এই তিন ঘণ্টার অভিজ্ঞতার কথা ফিসফিস ক’রে বলতে লাগলুম। সে কিছু শুনতে পেলে, কিছু না-শুনেই ইশারায় আন্দাজে বুঝে

নিলে। তার পরে পায়ের কাছ থেকে লেপটা তুলে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে আমায় ফিসফিস ক'রে বললে, ও-বেলা সব শোনা যাবে।

মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই পরিতোষ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ল। অনেকদিন পরে অমন সুখাদ্য আর অমন নরম বিছানা ও লেপ পেয়ে ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসতে লাগল। জোর ক'রে জেগে প'ড়ে রইলুম। ও-ঘরে গুরুমা খাচ্ছেন ; রসিয়াকি মায়ি বাসন মাজছে, জল তুলছে ; ওপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে খটখট ক'রে ভাড়াটেরা উঠছে নামছে ; সবই শুনতে পাচ্ছিলুম। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পডলুম, জানতেও পারি নি।

একবার একটা ঠাণ্ডা নরম হাত মুখের ওপর পড়তেই ঘুমটা ছুটে গেল। দেখি, গুরুমা আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে হাসছেন, পাশেই পরিতোষ আপাদমস্তক লেপ-মুড়ি দিয়ে শুয়ে।

গুরুমা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। আমাদের ঘর আর তাঁর ঘর ছিল পাশাপাশি—দুই ঘরে আসা-যাওয়ার জন্যে মাঝের দেওয়ালে একটা দরজা ছিল বটে, কিন্তু এসে অবধি সেটাকে বন্ধই দেখেছি, এতক্ষণ বাইরের দরজা দিয়েই উভয়পক্ষের যাওয়া-আসা চলছিল। খাট থেকে নেমে তিনি এই মাঝের দরজাটা খুলে এ-ঘরে এসেছেন। আমি খাট থেকে নামতেই গুরুমা আমাকে একরকম টেনে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে সেই দরজা দিয়ে। তার পরে দরজাটায় খিল লাগিয়ে দিয়ে ক্রোধের ভান ক'রে আমার দিকে কটমট ক'রে চেয়ে বললেন, ঘুমুতে বারণ করেছিলুম না দুষ্টু ছেলে!

আমার চোখ থেকে তখনও ঘুম ছোটে নি। দিবানিদ্রাটি পুরো না হওয়ার দরুন আলস্য ও অবসাদে দেহ-মন ভ'রে রয়েছে, চোখ-দুটো এমনিতেই বুজে আসছিল, কিন্তু গুরুমার চোখে চোখ পড়তেই সে-দৃষ্টির সঙ্গে যেন আমার দৃষ্টি বাঁধা প'ড়ে গেল। সে এক অদ্ভুত চাহনি! চোখ-দুটো উজ্জ্বল, স্থির, পলকবিহীন, অথচ তার মধ্যে কাঠিন্য কিছুই নেই, সমস্ত মুখখানা ঘিরে একটা রহস্যময় হাসি ঢলঢল করছে। ঠিক এরই একটু সামান্য নমুনা তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকালে পেয়েছিলুম। আমি বেশ বুঝতে পারলুম, আমি যেন সম্মোহিত হয়ে পড়ছি।

ছেলেবেলায় একবার অজ্ঞান ক'রে আমার পায়ের তলা থেকে ট্যাংরা-মাছের কাঁটা বের করা হয়েছিল। ক্লোরোফর্মের মাঝের অবস্থার মতন বেশ একটা সুখদায়ক নেশায় মাথাটা রিমঝিম করতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

আমি অনুভব করতে লাগলুম, রাজকুমারীর নাক দিয়ে ভকভর্ক ক'রে একটা স্নগন্ধ গরম হাওয়া আমার মুখের ওপরে এসে পড়ছে। কিছুক্ষণ—কতক্ষণ, সে সময়ের হিসাব দিতে পারব না, তার পরে আর কিছু মনে নেই।

ঘুমের মধ্যে মনে হতে লাগল, কে যেন আমার ডান হাতখানা ধ'রে মোচড় দিচ্ছে। যন্ত্রণা বাড়তে বাড়তে ঘুমটা ছুটে গেল। মনে হতে লাগল, দেহের ওপর যেন দশ মণের একটা তুলোর বস্তা চাপানো। চোখ চেয়ে দেখি, ঘরটা আধা-অন্ধকার, দূরে জানলার একটা পাল্লা খোলা রয়েছে, রাজকুমারীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে আদুড় গায়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে আমি প'ড়ে রয়েছি, আমার ডান হাতখানা তার গলার নীচে, আর তার একটা হাত আমার গলার ওপরে আড়াআড়িভাবে প'ড়ে রয়েছে। অনেক কায়দা-কসরৎ ক'রে তার গলার তলা থেকে হাতখানা বের ক'রে নিতেই তার ঘুম ভেঙে গেল।

তাড়াতাড়ি পায়ের তলা থেকে লেপটা টেনে নিয়ে উভয়কে চাপা দিয়ে তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে রাজকুমারী বললে, গোপাল, ঘুম ভাঙল ?

আমি বললুম, হ্যাঁ, সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে।

রাজকুমারী উঠে পড়ল। আমিও উঠে নিজের ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি, পরিতোষ তখনও এপাশ-ওপাশ করছে।

দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে পরিতোষের সঙ্গে আমার অভিনব অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করছি, এমন সময় 'গোপাল' ব'লে রাজকুমারী ঘরে এসে ঢুকল। তাকে দেখেই মনে হ'ল, সে স্নানে চলেছে। বগলে একটা পুঁটুলি ও হাতে সেই কমণ্ডলু। বললে, চল গোপাল, স্নান ক'রে আসি।

প্রস্তাবটা শুনে তো আমার পায়ের নখ থেকে আরম্ভ ক'রে মাথার চুল অবধি শিউরে উঠল। কি সর্বনাশ! এখন স্নান! মনে মনে জপ শুরু ক'রে দিলুম, জয় জয় বিশ্বনাথ! দেখো বাবা, শেষ অবধি রক্ষে ক'রো।

আমতা-আমতা ক'রে বললুম, নাঃ, সন্ধ্যের সময় স্নান করা আমার অভ্যেস নেই, অসুখ হয়ে যাবে।

গুরুমা সে-কথা একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, না না, কিছু হবে না, গঙ্গা নাইলে কখনো অসুখ করে! নাও নাও, উঠে পড়।

পরিতোষ বললে, বেশ তো, চ' না, গঙ্গা নেয়ে আসা যাক।

গুরুমা বললেন, না বন্ধু, তুমি বাড়ি থাক। চল গোপাল, ছেলেমানুষি করে না, ওঠ।

পরিতোষ গুরুমার সঙ্গে আমড়াগাছি জুড়ে দিলে, যা না, যা না, কি হয়েছে? গুরুমা যখন বলছেন, তখন কিছু হবে না।

হায় রে আমার বরাত! মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গাস্নান! হোক না সে কাশীধামের গঙ্গা! বিশ্বনাথ, এবার তোমার ওপরেই যে ভক্তি ছুটে যায় বাবা!

চোখে জল এসে গিয়েছিল। গুরুমা চোখে জল দেখে এগিয়ে এসে আমাকে আদর ক'রে ক'রে বলতে আরম্ভ করলেন, গোপাল আমার সত্যিকারের গোপাল। শীতকালে চানের নাম শুনে চোখে জল এসে গিয়েছে! কিছু ভয় নেই, আমি তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দোব, কিছু শীত লাগবে না। এই দেখ, তোমার কাপড় নিয়েছি।

দেখলাম, গুরুমার বগলদাবায় আমার ধুতিখানাও পাট করা রয়েছে, যেখানা সকালে স্নান ক'রে ছেড়ে দিয়েছিলুম।

গুরুমা আমাকে এমন আদর করতে লাগলেন যে, আমার লজ্জা করতে লাগল।

শেষকালে উঠতেই হ'ল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। তুপুরে ঘেমেছি, সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান ক'রে ঠাণ্ডা হতে হবে, উপায় নেই। র‍্যাপারখানা গায়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম।

বাড়ির খুব কাছেই গঙ্গা। তু-চারটে গলি পার হয়ে এসেই একটা বড় অজানা ঘাটে এসে উপস্থিত হলুম। ঘাটে নরনারীর অন্ত নেই, কিন্তু আশ্চর্য রকমের নিস্তব্ধ। অনেকে ঘাটের চাতালে ব'সে আছে, কেউ নিঃশব্দে মালা জপছে। তু-একজন স্ত্রীলোক আমাকে দেখিয়ে গুরুমাকে জিজ্ঞাসা করলে, ছেলেটি কে?

গুরুমা জবাব দিলেন, এ একটি ছেলে, আমার আপনার লোক।

যাই হোক, বলিদানের পাঁঠার মতন কাঁপতে কাঁপতে ঘাটের দীর্ঘ সোপানাবলী অতিক্রম ক'রে তো উত্তরবাহিনীর সম্মুখীন হওয়া গেল। অন্ধকার বেশ ঘোর হয়ে আসা সত্ত্বেও পুণ্য-কামী ও কামিনীদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। গুরুমা 'এস গোপাল' ব'লে জলে নেমে পড়লেন। আমি মরিয়া হয়ে জামা ও র‍্যাপারখানা সিঁড়িতে ছেড়ে তাঁর পিছু পিছু জলে নেমে উপরি উপরি তিন-চারটে ডুব মেরে কাঁপতে কাঁপতে ঘাটে গিয়ে উঠলুম। সিঁড়িতে গুরুমার গামছা ছিল, তাই দিয়ে বেশ ক'রে মাথা গা হাত পা মুছে, কাপড় ছেড়ে

জামা গায়ে দিয়ে র‍্যাপার জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। সে-সময় স্নান-করাটাকে যতখানি সাংঘাতিক মনে করেছিলুম, দেখলুম, ব্যাপারটা ততখানি সাংঘাতিক নয়। বরঞ্চ বেশ ভালোই লাগতে লাগল। গুরুমা ধীরে-সুস্থে স্নান সেরে আমার হাত থেকে গামছা নিয়ে জলে দাঁড়িয়েই মাথা মুছলেন, তার পরে ঘাটে উঠে আমার ছাড়া কাপড়খানা কেচে নিংড়ে আমার হাতে দিলেন, তার পরে শাড়ি ছেড়ে নতুন শাড়ি প'রে ছাড়া শাড়িখানা কেচে আমার হাতে দিয়ে এক কমণ্ডলু জল ভ'রে নামাবলীখানা গায়ে দিয়ে আমাকে বললেন, চল।

চলতে চলতে এক জায়গায় এসে বললেন, গোপাল, তুই বাড়ি যা, আমায় কয়েক জায়গায় জল দিতে হবে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি আসছি।

বাড়িতে ফিরে দেখি, পরিতোষ রসিয়ার মায়ের সঙ্গে সশব্দে গল্প জুড়ে দিয়েছে, উভয়ের উচ্চহাস্যে বাড়ি একেবারে জমজমাট।

শুনলুম, বাজার থেকে তিন পয়সার ভাং আনিয়ে দু'জনে খেয়েছে, বেশ ফুর্তিতেই তাদের সন্ধ্যাটি কাটছে।

আমি আসবার কিছুক্ষণ পরে রসিয়ার মা উঠে গিয়ে কাপড়গুলো শুকোতে দিলে। তারপরে উনুনে আগুন দিয়ে ময়দা মাখতে ব'সে গেল।

পরিতোষের সঙ্গে ব'সে ব'সে আকাশে প্রাসাদ তৈরি করছি, এমন সময় গুরুমা বাড়ি ফিরলেন। আমরা ঘরে ব'সে শুনলুম, তিনি রসিয়ার মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার গোপাল ফিরেছে?

রসিয়ার মা কি বিড়বিড় ক'রে বললে, শুনতে পেলুম না। তার পরে ও-ঘরে রান্নার আওয়াজ হতে লাগল।

ঘণ্টা-দুয়েক পরে খাবার ডাক পড়ল। গুরুমার ঘরে গিয়ে দেখলুম, একখানা আসনে তিনি বসেছেন আর দু-খানা আসন খালি। আমরা ঢুকতেই তিনি বললেন, বন্ধু, ব'সে পড়, আর রাত ক'রে কি হবে? গোপাল, তুমি এখানে ব'স। এই ব'লে তাঁর পাশের আসনটি আমাকে দেখিয়ে দিলেন।

খাওয়া শেষ হতে সাড়ে ন'টা বেজে গেল। রাজকুমারীর ঘরে একটা বড় ঘড়ি ছিল, সেটা আধ ঘণ্টা অন্তর ব'লেই চলতে লাগল, চলেছে দিন, চলেছে রাত।

মুখ-টুখ ধুয়ে নিজের ঘরে এসে ঘুম লাগাবার ব্যবস্থা করছি, এমন সময় মাঝের দরজা খুলে নিজের ঘর থেকেই রাজকুমারী ডাক দিলে, গোপাল!

যাই।—ব'লে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে তার ঘরে ঢুকতেই মাঝের দরজায় সে হুড়কো দিয়ে দিলে।

দেখলুম, রসিয়ার মা এঁটো বাসন তুলে ঘর নিকিয়ে দিয়ে গিয়েছে। নিবন্ত উনুনে একটা বড় ডেক্‌চি চড়ানো, তাতে জল সোঁ-সোঁ করছে। আমাকে খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসতে ব'লে সে উনুন থেকে গরম জল নামিয়ে ঘরের কোণ থেকে একটা আধ-ভরা বালতি এনে ঠাণ্ডা জলে গরম জল মিশিয়ে আমার পা ধুতে আরম্ভ ক'রে দিলে। আমি হাঁ-হাঁ ক'রে আপত্তি করতেই আমার পায়ে ছোট্ট একটি চাপড় মেরে বললে, চুপ কর্।

পা মুছিয়ে দেওয়ার পর বললে, এবার পা তুলে বিছানায় উঠে ভালো ক'রে ব'স্।

আমি বিছানায় উঠে বসতেই রাজকুমারী দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিজে পা ধুতে বসল। প্রায় সাড়ে দশটা অবধি বেশ ক'রে হাঁটু অবধি ধুয়ে পা মুছে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল, আমি পায়ের কাছে ব'সে রইলুম।

রাজকুমারী গল্প করতে লাগল, গোপাল, খেয়ে পেট ভরেছে তো? রাত্রি-বেলা বাড়িতে কি খেতে? কে রান্না করত? এখানে কেমন লাগছে? বন্ধুর কেমন লাগছে? বন্ধুর কথা শুনে আমায় ফেলে পালিও না যেন!

এমন সময় রসিয়াকি মায়ি কি বলতে বলতে দরজাটা ফাঁক করতেই রাজকুমারী হাঁ-হাঁ ক'রে চিৎকার করতে করতে বিছানায় উঠে ব'সে তাকে বললে, যা যা, ঘরে ঢুকিস নে যেন, ঘরে গোপাল রয়েছে, জানিস না?

রসিয়ার মা তাড়াতাড়ি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়েই বললে, গা টেপাবে না?

রাজকুমারী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, না না, তুই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়্‌গে যা।

এই কথাগুলো ব'লেই সে দুই হাতে মাথা মুখ ঢেকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। রসিয়ার মায়ি কি ব'লে চ'লে গেল, রাজকুমারী কোনও জবাবই দিলে না।

একটু পরেই ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে রাত্রি এগারোটা বাজল; কিন্তু মনে হতে লাগল, যেন রাত্রি দুটো বাজল। চারিদিক থমথম করছে। কোথাও কোন শব্দ নেই, শুধু ঘরের ঘড়িটা একটানা টকটক আওয়াজ ক'রে চলেছে। ঘরের এক কোণে পিলসুজের ওপর রেড়ির তেলের প্রদীপ মেঝের খানিকটা আলোকিত করেছে, কিন্তু খাটের ওপরে আলো-আঁধারে মেশা স্নিগ্ধ বিভা। বই পড়া যায় না বটে, কিন্তু সব কিছুই দেখা যায়। চারিদিকের সমস্ত বস্তুই ধীর স্থির, মধ্যে মধ্যে দীপশিখাটাও নিষ্কম্প হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, শুধু আমার

মগজের মধ্যে একটার পর একটা চিন্তার কম্পন ঢেউ খেলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল, কাল রাত্রে ভবিষ্যতের চিন্তায় দুই বন্ধুতে আকুল হয়ে উঠেছিলুম। কোথায় থাকব, কোথায় শোব, কোথায় খাব—এই ভাবনায় সারারাত্রি ঘুমুতে পারি নি; কিন্তু আমাদের অগোচরে বিশ্বনাথ কি মনোরম ব্যবস্থাই ক'রে রেখেছিলেন! ভাবতে ভাবতে মন দিশাহারা হয়ে যেতে লাগল। কে এ রাজকুমারী! এর কোন পরিচয়ই আমার জানা নেই, অথচ আমার সমস্তই সে জানে। আজ সকাল পর্যন্ত যার অস্তিত্ব আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল, এই মুহূর্তে সে-ই আমার পরম বন্ধু। এর চেয়ে বড় বিস্ময় আমার জীবনে ইতিপূর্বে আর আসে নি।

চোখ বুজে বিশ্বনাথকে অজস্র ধন্যবাদ জানাতে লাগলুম। কৃতজ্ঞতায় মাথা একেবারে নুয়ে পড়ল নীচের দিকে। চোখ চেয়েই দেখি, রাজকুমারীর ধপধপে সুডৌল পা-দুখানি নিস্পন্দ হয়ে প'ড়ে আছে সামনে।

বিশ্বনাথের চরণতল থেকে একেবারে রাজকুমারীর পদতলে উন্নীত হয়েই মনটা এক অভিনব আনন্দরসে আপ্লুত হয়ে গেল। পা—যাকে মানবদেহের একটা অতি তুচ্ছ অঙ্গ ব'লে এতদিন মনে করেছি, তারই আকর্ষণে আমি যেন অভিভূত হয়ে পড়তে লাগলুম। পদসেবা করবার একটা দারুণ বাসনার সঙ্গে আমার মজ্জাগত ভদ্রতা ও সামাজিকতার লড়াই শুরু হয়ে গেল বুকের মধ্যে। শেষকালে আমার সমস্ত মনোবৃত্তিকে হারিয়ে দিয়ে পদসেবাই জয়যুক্ত হ'ল। কাঁপতে কাঁপতে একখানা হাত তার পায়ের ওপরে রাখলুম।

রাজকুমারী যেন এতক্ষণ এরই প্রতীক্ষা করছিল। পায়ে হাত পড়া মাত্র শতদলের মতন পা-দুখানি আমার কোলের ওপর তুলে দিয়ে মৃদু পদসংজ্ঞায় ইঙ্গিত করলেন, নির্ভয়ে চরণসেবায় মন দিতে পার।

রাত্রি প্রায় বারোটার সময় ছুটি পেয়ে নিজেদের ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম। রাজকুমারী মাঝের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে।

অকস্মাৎ এই আশাতীত ভাগ্য-পরিবর্তনে আমরা অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম বটে, কিন্তু দিন-দুয়েকের মধ্যেই আমাদের এই অদ্ভুত জীবনযাত্রা সরল ও স্বাভাবিক হয়ে উঠল। তার কারণ, রাজকুমারীর ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা অমায়িকতা, আপনার ক'রে নেবার এমন একটা মিষ্টি কৌশল ছিল যে, দিন দুই যেতে-না-যেতেই মনে হতে লাগল যে, এ আমাদের অতি আপনার জন। এতদিন যেন বিদেশে কোথায় প'ড়ে ছিলুম, এবার ঘরের

ছেলে ঘরে ফিরে এসেছি। বর্তমানকে এমন মধুময় ও ভবিষ্যৎকে সে এমন রঙিন ক'রে তুলত যে, আর কি বলব! শুধু তাই নয়, সংসারের সমস্ত কাজে, এমনকি দেনা-পাওনার কাজে পর্যন্ত সে আমাদের এমন কর্তৃত্ব দিত যে, মধ্যে মধ্যে আত্মহারা হয়ে মনে হ'ত, সে-ই বুঝি আমাদের আশ্রিতা।

একদিন রাজকুমারী পরিতোষকে বললে, বন্ধু, তোমার তেতলার ভাড়াটে যে আজ তিন মাস ভাড়া দিচ্ছে না, আসছে মাসে যে টেক্স দিতে হবে, কোথা থেকে দেবে শুনি ?

তেতলার যে ভাড়াটেকে রাজকুমারী তাগাদা দিতে বললে, এখানে এসে অবধি তাকে দেখছি। বিধবা সে, ঘাড় অবধি কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, রঙ উজ্জ্বল শ্যাম, দীর্ঘ দেহ, মুখে সর্বদা একটা প্রসন্নতা বিরাজ করছে। একটি সাত-আট বছরের মেয়ে আছে তার। অল্প বয়সেই বিধবা হয়ে কাশীবাস করতে এসেছে, এখন বয়স তার ত্রিশ হবে। বাড়ির অবস্থা খারাপ নয়। সেখানে বড় বড ভাশুরপোরা আছে, তাদের বিবিধ অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে কাশীতে এসে বিশ্বনাথের চরণে আত্মসমর্পণ করেছে। ভাশুরপোদের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট, সে প্রায় তারই সমবয়সী; সে-ই মাসে মাসে নিয়মিত টাকা পাঠায়। মাঝে মাঝে দু-তিন-চার মাস কিছুই আসে না, তারপরে একেবারে তিন-চার-শো টাকা এসে উপস্থিত হয়। অবস্থা তার ভালোই, তবুও মাঝে মাঝে ভাড়া ফেলে রাখে, নইলে লোকটি বড় ভালো। তার নাম হচ্ছে জয়া। ভাড়াটে হ'লেও রাজকুমারীর সঙ্গে তার বড় ভাব, ঠাট্টাঠুট্টিও চলে; রাজকুমারী তাকে 'জয়ি' ব'লে ডাকে।

পরিতোষ বললে, চ তো স্থবিরে, আমার সঙ্গে তেতলায়, কেমন ভাড়া দিচ্ছে না একবার দেখি!

রাজকুমারী বাধা দিয়ে বললে, না না, গোপালকে নিয়ে যেও না, তুমিই যাও।

পরিতোষ তিন লাফে তেতলায় চ'লে গেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে সে নীচে নেমে এসে বললে, ও-বেলা সব ভাড়া চুকিয়ে দেবে বলেছে।

সেদিন দুপুরবেলাতেই আবার পরিতোষ তাগাদায় ওপরে উঠল, সন্ধ্যেবেলা আমার স্নান করতে যাবার কিছু আগে সে নেমে এল।

স্নান ক'রে ফিরে এসে রসিয়ার মার মুখে শুনলুম, ভাং-টাং টেনে সে আবার তাগাদায় গিয়েছে।

রাত্রিবেলা রাজকুমারী বাড়ি ফেরবার পর সে নেমে এসে বললে, আজ আর ভাড়া দিতে পারলে না। কোনও ভয় নেই; ও ঠিক দিয়ে দেবে, বেশ ভালো লোক।

আমি একটু ঠাট্টা করতেই রাজকুমারী বললে, না না বন্ধু, গোপালের কথা শুনো না। দিনরাত লেগে থাকো, মাগী ভারি বজ্জাত, ওর মুখের মিষ্টি কথায় ভুলো না, পয়সার আণ্ডিল মাগী, কিন্তু কিছুতেই বের করতে চায় না।

রাজকুমারীর নির্দেশ পরিতোষ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতে আরম্ভ করলে। অর্থাৎ দিনরাত্রি জয়া-গিন্নীকে তাগাদা দিতে লাগল। অচিরেই বিশ্বনাথ তার এই বিপুল অধ্যবসায়ের ফল হাতে হাতে দিয়ে দিলেন; কারণ দিন-তিনেক বাদেই একদিন রাত-ত্বপুরে ঘরে শুতে এসে দেখি, পরিতোষ বিছানায় নেই। বাইরে গিয়েছে মনে ক'রে তার অপেক্ষা করতে লাগলুম, কিন্তু রাত্রি দেড়টার পরও সে ফিরল না দেখে বুঝে নিলুম, তাগাদার ফল ফলেছে।

দিনগুলি বেড়ে কাটতে লাগল। সত্যি কথা বলতে কি, এমন নিরঙ্কুশ শান্তিময় দিন আমার জীবনে আর আসে নি। ইস্কুলে তাড়া নেই, বাবার ভয় নেই, পরীক্ষার বিভীষিকা নেই, অথচ ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। শুধু ত্বটো বছর কোনও রকমে কাটাতে পারলে হয়। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মুখ-টুখ ধুয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে ত্ব'জনে মিলে দশাশ্বমেধ ঘাটে যাই। পরিতোষ ও রাজকুমারী স্নান করে, আমি স্নান করি না, কারণ সন্ধ্যাস্নান আমার বাধ্যতামূলক। রাজকুমারী তার ভিজে শাড়ি ও গামছা আমাদের হাতে দিয়ে চ'লে যায় মন্দিরে। আমরা দশাশ্বমেধ ঘাটের বাজার থেকে তরি-তরকারি ও যেদিন যা প্রয়োজন, তা কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে রসিয়ার মা'র হাতে সেগুলো জিম্মে ক'রে দিয়ে রাত্রের বাসী লুচি, তরকারি ও ক্ষীর দিয়ে জলযোগ করি। জলযোগান্তে পরিতোষ ওপরে চ'লে যায় ভাড়ার তাগাদায়, কারণ ভাড়া তখনও আদায় হয় নি। আমি শুয়ে-শুয়ে বিছানা মাপতে থাকি। রাজকুমারী ফিরে এলে গল্প ক'রে তার রান্নায় সাহায্য করি। খাবার একটু আগেই পরিতোষ নেমে আসে। আহারান্তে পান-টান না খেয়েই আবার সে চ'লে যায় তাগাদা করতে, আর আমি কোনদিন সম্মোহিত আর কোনদিন-বা

মোহিত হয়ে :রাজকুমারীর কুসুমপেলব আলিঙ্গনের মধ্যে আত্মহারা হয়ে ভাসতে ভাসতে চ'লে যাই ভাব-যমুনার তরঙ্গ বেয়ে।

সন্ধ্যের সময় রাজকুমারীর সঙ্গে গঙ্গাস্নান ক'রে একলা বাড়ি চ'লে আসি, রাজকুমারী চ'লে যায় শিবের মাথায় জল ঢালতে। ফিরে এসে দেখি, পরিতোষ আর রসিয়ার মায়ি ভাঁড়ে করে ভাঙের শরবত খাচ্ছে, ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝতে পারি, জয়া-গিন্নীর কাছেও একটি বড় ভাঁড় পৌঁছে গেছে। ভাং খেয়েই সে তাগাদায় চ'লে যায় তেতলায়, রাজকুমারী বাড়ি ফেরবার আগেই নেমে আসে। রাত্রে আহারাদির পর পরিতোষ চ'লে যায় জয়া-গিন্নীর কাছে, বলে, তার মেয়েকে এ-বি-সি-ডি শিখিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়ি।

আর আমি? আমি রাত্রি বারোটা অবধি রাজকুমারীর অঙ্গসংবাহন করি। প্রতি রাত্রেই নতুন অভিজ্ঞতা! কোন রাত্রে মনে হয়, দু'হাতে চামেলীফুল দলন করছি; আবার কোন রাত্রে মনে হয়, যেন কেতকীকুসুম চয়ন করছি। কোনদিন সে কাঁদতে থাকে,—কি আকুলতা সে ক্রন্দনে, অতি করুণ সে কান্না! কোনদিন-বা দমকা চাপা হাসির আওয়াজে চমকে উঠি। কোনদিন সে ভাঙা গলায় 'গোপাল' নাম জপ করতে থাকে। কখন-বা ঘামতে ঘামতে দেহ পাথরের মতো ঠাণ্ডা ও নিস্পন্দ হয়ে যায়, ভয় হতে থাকে; মনে হয়, দেহে বুঝি প্রাণ নেই। ধাক্কা দিয়ে দিয়ে সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনি। বিচিত্র সে অভিজ্ঞতা!

মানুষ-মাত্রেই, সে নারী হোক বা পুরুষই হোক, ভালবাসার শক্তি তার সহজাত; কিন্তু ভালবাসা প্রকাশ করবার শক্তি, সে দেবদুর্লভ। ঠিক রসিক ও কবিতে যে পার্থক্য।

সে এক অভিনব শক্তি, যার আকর্ষণের আবর্তে পড়লে প্রতি প্রভাত, দ্বিপ্রহর, সন্ধ্যা, রাত্রি, জীবনের প্রতি মুহূর্ত মনে হতে থাকবে, এত সুখ, এত আনন্দ এর আগে আর কখনও পাই নি। আকাশ ও ধরণীতল, পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা কীট ও নরনারী, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা—প্রকৃতির যেখানে যা কিছু আছে, তারা যে কত সুন্দর, তারা যে কত আপনার, সকলের সঙ্গে একত্ববোধে যে কি আনন্দ, কোনও ভাষাতেই সে অনুভূতির বর্ণনা করা যায় না।

সে এক অদ্ভুত শক্তি, যার স্পর্শে মন থেকে বয়সের তারতম্য ঘুচে যায়, সুন্দর-কুৎসিতের ভেদাভেদ মুছে যায়। আঁখি মেলে যখনই তাকে দেখি, মনে হয় এই ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। যতক্ষণ সে কাছে থাকে, ততক্ষণ মনে হয়,

আমি যেন তার মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছি ; যতক্ষণ সে কাছে থাকে না, ততক্ষণ তারই চিন্তায় নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে আত্মহারা হই ; আবার তারই আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে নিজের অস্তিত্ববোধ ফিরে আসে—সন্তানের আবির্ভাবে নারীর অন্তরে যেমন জননীত্বের বোধ জাগে।

সে যেন নিত্যই নতুন, প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তনশীলা। কখনও মমতাময়ী কখনও কঠিনা, কখনও মোহিনী কখনও জননী, কখনও রূপসী কখনও প্রেয়সী, কখনও দাসী কখনও মহীয়সী—নিত্য নতুন, প্রতি মুহূর্তেই নতুন। মাধুর্যের বিশাল মহাসাগরের তরঙ্গাঘাতে মুহূর্তে মুহূর্তে নব নব ফেনপুঞ্জ উঠছে, আবার সেই সাগরের জলেই তা মিলিয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত সে অভিজ্ঞতা!

রাজকুমারী ছিল, সেই নারী, ভালবাসা প্রকাশ করবার গুপ্তবিদ্যায় যে ছিল ওস্তাদ। সে ছিল সেই কবি, পূর্বজন্মের পুণ্যফল ব্যতিরেকে যার কাব্য উপভোগ করা যায় না।

দিনগুলি যে কিরকম কাটছিল বোধ হয় তার আর বিশদ বর্ণনা করতে হবে না। এরই মধ্যে তুই বন্ধুতে মিলে মাঝে মাঝে এদিক সেদিক—একেবারে চৌক অবধি ঘুরে আসি। পরামর্শ ক'রে ঠিক করা গেছে, কাপড়ের ব্যবসা করাই ঠিক হবে। তু'বছর পরে হ'লেও দোকানটা কোথায় ফাঁদা যেতে পারে, এখন থেকেই তার স্থান ঠিক ক'রে রাখি। বড় দোকান ফাঁদতে হবে। নানা জায়গায় ব্র্যাঞ্চ খুলতে হবে। রাজকুমারী বলেছে, যত টাকা লাগে দেবে। পরিতোষ একদিন অত্যন্ত সহজভাবে স্বীকার করলে, জয়া-গিন্নীও তাকে ওইরকমই একটা আশ্বাস দিয়েছে। অস্থিরকেও আনিয়ে নিতে হবে। আমি, পরিতোষ ও অস্থির—এই তিনজনে সমান অংশীদার হব, হৈ-হৈ ক'রে আমাদের ব্যবসা চলবে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। এইসব কথা জানিয়ে অস্থিরকে একখানা চিঠি লিখব-লিখব করছিলুম, কিন্তু পরিতোষ বাধা দিয়ে বললে, এখন দিনকতক যাক।

আমি ঠিক করলুন, একদিন রাজকুমারীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তারপরে অস্থিরকে চ'লে আসতে লেখা যাবে, এখন তাড়াতাড়ি করবার কোন দরকার নেই।

বাদশা হারুন-অল-রশিদ আবুল হাসানকে একদিনের জন্যে রাজত্ব দিয়ে কেড়ে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু রাজত্বের বিনিময়ে আবুল হাসান পেয়েছিল রওশন আরাকে, সেও এক রাজ্য! আমার বাদশা এ-জীবনে আমাকে বহুবার রাজত্ব দান করেছেন ; অকৃতজ্ঞতা করব না, সঙ্গে সঙ্গে ভালো ভালো রাজকুমারীও

পেয়েছিলুম। কিন্তু রাজত্ব কেড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবারই তিনি রাজকুমারীকেও কেড়ে নিয়েছেন।

জয়া-গিন্নীর সঙ্গে পরিতোষের পরিচয় হবার বোধ হয় দিন পনেরোর মধ্যেই একদিন সকালবেলা তার ছোট ভাশুরপো হৈ-হৈ ক'রে এসে হাজির হ'ল, সঙ্গে আট-দশটি মোক্ষকামী বিধবা। তাঁরা তীর্থ করতে বেরিয়েছেন, চার ধাম তীর্থ করবেন—অর্থাৎ উত্তরে কেদার-বদরী, দক্ষিণে কন্যাকুমারী ও রামেশ্বর, পূর্বে কামাখ্যা, পশ্চিমে দ্বারকা শেষ ক'রে পুরুষোত্তমে গিয়ে মাথা মুড়িয়ে যে যার আস্তানায় ফিরে যাবেন। এত বড় পুণ্যকার্যে বিধবা ছোটকাকীকে বাদ দিতে তার মন চায় না ব'লেই তাকে নিতে আসা হয়েছে।

সংবাদটি শুনে তো পরিতোষ বেচারী একেবারে দ'মে গেল। জয়া-গিন্নী গুরুমার অবর্তমানে একবার আমাদের ঘরে এসে কত আদর ক'রে তাকে বুঝিয়ে গেল, মাস-ছয়েকের মধ্যেই সে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে, ছ'মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

বোধ হয় দিন-দুই পরে তারা চ'লে গেল। যাবার সময় বাকি ঘরভাড়া ও আগাম ছ'মাসের ভাড়া দিয়ে নিজের ঘর-দুখানি বাঙাল-মার জিম্মেতে রেখে গেল।

জয়া-গিন্নী চ'লে যাবার বোধ হয় দিন-দশেক পরে একদিন সকালবেলা স্নান সেরে রাজকুমারী বললে, গোপাল, আজ আমার ফিরতে একটু দেরি হবে। রসিয়ার মায়িকে ব'লো, ঘণ্টাখানেক পরে যেন উনুনে আগুন দেয়।

রাজকুমারী চ'লে গেল মন্দিরের দিকে, আমরা বাড়িমুখে রওনা হলুম। পথের মাঝে প্রতিদিনই একটা উঁচু রোয়াকে জনকয়েক লোককে ব'সে আড্ডা দিতে দেখতুম। রাজকুমারী প্রতিদিনই আমাদের সেই রাস্তাটুকু পার ক'রে দিয়ে একটা গলি দিয়ে অন্য পথে চ'লে যেত, আর আমরা বাড়ির দিকে চ'লে যেতুম। এই রোয়াকটার সামনে দিয়ে যখন আমরা যেতুম, তখন সেই লোকগুলো হুমড়ি খেয়ে আমাদের দেখতে থাকত আর নিজেদের মধ্যে কি-সব বলাবলি ক'রে চেঁচিয়ে অর্থাৎ আমাদের শুনিয়ে হাসতে আরম্ভ ক'রে দিত।

সেদিন এই রোয়াকটা পার হয়ে বোধ হয় দশ পা-ও অগ্রসর হই নি, এমন সময় পেছন থেকে ভাঙা গলায় কে যেন ডাকলে, ওহে ছোক্‌রারা!

আমরা ফিরে দাঁড়াতেই দেখি, একটা ঝাঁকড়া-চুলওয়ালা লোক, বোধ হয়

মাসখানেক দাড়ি কামানো হয় নি, লিক্‌লিকে রোগা, আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

লোকটাকে রোজই দেখি, তাদের হাসি প্রতিদিনই পিঠে এসে বিঁধতে থাকে, সুযোগ পেলে ওই হাসিকে একদিন কান্নায় বিগলিত করবার একটা প্রবল বাসনাও মনের মধ্যে উদ্যত হয়ে আছে; তার ওপরে কলকাতায় ভদ্র-সমাজে 'ছোক্‌রা' কথাটা সে-সময় ছিল অত্যন্ত অভদ্র উক্তি। 'ওহে ছোক্‌রা' ব'লে আমাদের কেউ ডাকলে নির্ঘাত সেখানে মারামারি বেধে যেত।

একে সেই 'ছোক্‌রা' ডাক, তার ওপরে আহ্বানকারীর সেই অপরূপ চেহারা, তার ওপরে প্রতিদিনকার সেই হ্যা-হ্যা হাসির ইতিহাস—এইসব মিলিয়ে মনের মধ্যে হাঙ্গামা বাধাবার একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছা লাফালাফি করতে শুরু ক'রে দিলে।

ফিরে দাঁড়িয়েই আমি বললুম, কি বলছ?

লোকটা ধমকের স্বরে বললে, বলি এসই না এদিকে।

পরিতোষ বললে, দরকার থাকে তো এখানে এসেই বল না। তোমার চাকর নাকি যে, ডাকলেই যেতে হবে?

পরিতোষটাকে চিরকাল ভয়-তরাসে ব'লেই জানতুম। দেখলুম জয়া-গিন্নী ক'দিনেই তাকে মানুষ ক'রে তুলেছে। আমাদের তরফ থেকে উত্তরের স্বর শুনে, তারা দু-তিনজন টপটপ ক'রে রোয়াক থেকে নেমে আমাদের কাছে এগিয়ে এল।

ঝাঁকড়া-চুলো জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের বাড়ি কোথায় হে?

লোকগুলো কাছে আসতেই ভক্‌ভক্‌ ক'রে গাঁজার গন্ধ বেরুতে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলুম, কেন বল দিকিন?

দরকার আছে।

আমাদের বাড়ি কলকাতায়। তোমার বাড়ি কোথায় বল তো?

লোকটা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে, লক্ষ্মীমণি কে হয় তোমাদের?

কে লক্ষ্মীমণি?

দু'বেলা দেখছি, তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছ, আর লক্ষ্মীমণিকে চেনো না যাদু!

গুরুমার কথা বলছ?

হ্যাঁ হ্যাঁ।

উনি আমাদের গুরুমা হন।

কথাটা শুনেই লোকগুলো হো-হো ক'রে হেসে উঠল। আবার খানিকটা গাঁজার গন্ধ পেলুম। হাসি থামিয়ে একজন আর-একজনকে বললে, ওহে, বদ্যিনাথকে খবর দাও, তার মাসী এবার জোড়া-ছোঁড়া পাকড়াও করেছে।

একজন লোক রোয়াক থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ছুটল বদ্যিনাথকে খবর দিতে।

সরু গলি হ'লেও ইতিমধ্যে কয়েকজন বাঙালী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল মজা দেখতে। দেখলুম একজন বিরাটদেহ ফোঁটা-তিলকধারী পাণ্ডাগোছের লোকও দাঁড়িয়ে শুনছে আমাদের বাগ্‌যুদ্ধ।

ইতিমধ্যে ঝাঁকড়া-চুলো একেবারে আমার ঘাড়ের ওপর প'ড়ে শাসাতে লাগল, দেখ যাদু, তোমাদের ও-কলকাতার চালাকি এখানে চলবে না, বুঝলে? এ কাশী, এখানে চালাকি করলে—

এই ব'লে অশ্লীল ভাষায় একটা গালাগালি দিলে।

তখন রাস্তায় বেশ লোক দাঁড়িয়ে গেছে।

অনেকদিন একাধারে মাধুর্যরসের চর্চা ক'রে মন থেকে হাঙ্গামা-হুজ্জতের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণটা আমার একরকম মুছেই গিয়েছিল। এতদিন পরে আকস্মিক এই আহ্বানে মঙ্গল-দেবতা একেবারে মাথায় চ'ড়ে বসলেন। বিদেশ-বিভূঁই, বন্ধুবান্ধব কেউ নেই, একটা হাঙ্গামা হ'লে বাঁচাবে কে—এইসব ভেবে এতক্ষণ সংযমই অভ্যাস করছিলুম। কিন্তু ঝাঁকড়া-চুলোর মুখে ওই গালাগালি শুনে একেবারে জ্ঞান হারিয়ে ফেললুম। আমার হাতে রাজকুমারীর ভিজে শাড়িখানা ছিল, আমি চিৎকার ক'রে উঠলুম, পরিতোষ, ধর্‌ তো এটা।

আমার কথা শেষ হবার আগেই পরিতোষ ঝাঁকড়া-চুলোর কানপাট্টায় এমন একটি চপেটাঘাত ঝাড়লে যে, লোকটা ঘুরতে ঘুরতে একটা বাড়ির দেওয়ালে গিয়ে দড়াম ক'রে প'ড়ে গেল।

একটা হৈ-হৈ ব্যাপার শুরু হয়ে গেল। ঝাঁকড়া-চুলোর বন্ধুরা টপাটপ রক থেকে লাফিয়ে প'ড়ে মারমুখো হয়ে আমাদের দিকে তেড়ে এল। আমরাও তৈরি। দু-এক হাত ঘুষোঘুষিও হয়ে গেল, এমন সময় সেই পাণ্ডাগোছের ষণ্ডা লোকটি মাঝে প'ড়ে আমাদের তারিফ করতে লাগল, সাবাস বেটা—সাবাস! তার পরে অপরপক্ষকে ধিক্কার দিয়ে বললে, লজ্জা করে না এইটুকু বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করতে!

রাস্তায় স্ত্রীপুরুষ যারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল, তারা সকলেই ওদের

ধিক্কার দিতে আরম্ভ ক'রে দিলে। এমন সময় যে লোকটা বত্তিনাথকে খবর দিতে গিয়েছিল, সে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে বললে, বত্তিনাথ বাড়িতে নেই।

বললুম, বত্তিনাথ এলে পাঠিয়ে দিও, আমাদের মাথা একেবারে কেটে নিয়ে যাবে'খন।

বাড়িতে এসে রসিয়ার মায়িকে রাজকুমারীর শাড়ি ও গামছা দিয়ে নিজেদের ঘরে গিয়ে খাটের ওপরে বসেছি, এমন সময় বাঙাল-মা উঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি দাতু, লোকগুলোর সঙ্গে কি হাঙ্গামা লাগিয়েছিলে?

রাজকুমারীর বাড়িতে দোতলা ও তেতলা মিলিয়ে আট-দশ ঘর ভাড়াটে থাকত, সকলেই বিধবা। শুধু সে-বাড়ি কেন, আশপাশের প্রায় সব বাড়িতেই দেখতুম, প্রায় ঘরে-ঘরেই বিধবা ভাড়াটে। সকলেই তারা বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে কাশীবাস করতে এসেছে—কেউ স্বেচ্ছায়, কেউ-বা বাধ্য হয়ে। এদের মধ্যে অনেকেরই দেশে খেয়ে প'রে স্বচ্ছন্দে থাকবার মতন সঙ্গতি ছিল, কিন্তু আত্মীয়দের ভাঁওতায় তারা জেনেছে, তাদের কিছুই নেই। এরা কাশীতে এসেছে জীবনটুকু কোনরকমে কাটিয়ে দিয়ে এইখানেই মরবে এই আশায়। পূর্বজন্মের অনেক পাপের ফলে এ-জন্মে বৈধব্য ভোগ করতে হ'ল, আর যেন জন্ম না হয়, আর যেন বিধবা হতে না হয়।

আহার্য তাদের নামমাত্র। বেলা তৃতীয় প্রহরে ভাতের সঙ্গে ডাল, কুমড়ো-বেগুন-সেদ্ধ; কারুর ভাগ্যে খই-বাতাসা; কারুর ভাগ্যে কিছুই নেই। এদের মধ্যে কেউ কেউ ভাগ্যবতী, কারণ তাদের বাড়ি থেকে তিন টাকা, পাঁচ টাকা, কারুর বা দশ টাকা আসে; প্রথম প্রথম মাসে-মাসেই আসত, এখন কখনও কখনও আসে। সে-টাকা কেউ-বা দয়াপরবশ হয়ে পাঠায়, কেউ-বা তাদেরই সম্পত্তির অংশ থেকে পাঠায়, কিন্তু প্রতিবারই তাদের টাকা পাঠাবার সময় তাদের মনে হয়, মাগী আর কতকাল বাঁচবে, কতকাল আর এইভাবে টাকা পাঠাতে পারা যায়!

এদের মধ্যে অনেকেই, কেউ-বা কোনও তীর্থযাত্রী পরিবারে দু-বেলা রেঁধে, কেউ-বা কাঁথা সেলাই ক'রে, কেউ-বা বড়ি দিয়ে মাঝে মাঝে কিছু রোজগার করে। বছরে দু-খানা কি তিনখানা থান, মাসে আট আনা এক টাকা থেকে তিন টাকা ঘর ভাড়া যোগাড় করতেই হবে। মধ্যে মধ্যে নানা প্রদেশের রাজা-মহারাজা এসে বিধবাদের কম্বল বিতরণ করে, তারই কখনও একখানা পাওয়া

যায়, তাই দিয়ে কাশীর দুর্জয় শীত নিবারিত হয় র‍্যাপার কিংবা শাল যার আছে, সে ভাগ্যবতী।

সংসারে তাদের আপনার কেই নেই, তারাও কারুর নয়। বাইরের ঘটনাবলী, সে যতই উত্তেজক বা চাঞ্চল্যকর হোক না, এদের জীবনে তা কোনও রেখাপাতই করে না। জীবন-মৃত্যু কিছুর প্রতিই তাদের বিরাগও নেই, কোনও আকর্ষণও নেই। বৈচিত্র্যহীন তরঙ্গহীন জীবনপ্রবাহ স্থিরভাবে ব'য়ে চলেছে মরণ-সাগরের পানে।

ধর্মকর্মের কোন স্পষ্ট ধারণা তাদের নেই (কারই বা আছে!)—অথচ প্রায় প্রত্যেকেই একটা-না-একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে চলে। ধর্মের নামে যে-কোন লোক যা বলে, তাই তাদের কাছে সাময়িক সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। বিচার করবার শিক্ষা, শক্তি বা ধৈর্যও তাদের নেই।

এরা কাশীতে এসেছে মরবে ব'লে, কারণ এখানে মরলে আর জন্মাতে হবে না; কিন্তু নিত্য শত শিবের মাথায় জল ঢালে, শিবের মতো স্বামী পাবে ব'লে। কোনও ঘটনাই তাদের মনে চাঞ্চল্য জাগায় না; কারণ তারা জানে, এমন কোন ঘটনাই ঘটতে পারে না, যার দ্বারা তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে। এই সত্যই তাদের কাছে একমাত্র সত্য। এরই পায়ে আত্মসমর্পণ ক'রে তারা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। যত দেরিই হোক, একদিন-না-একদিন বিশ্বনাথ দেখা দেবেনই মহেশ্বরের রূপ ধ'রে। অতি করুণ সে আত্মসমর্পণ! মৃত্যুদণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তি ফাঁসির দড়ির কাছে যেমন ক'রে আত্মসমর্পণ করে।

এদের মধ্যে কেউ-বা কখনও হয়তো পাথেয়স্বরূপ কারুকে পায় সঙ্গিরূপে। কিন্তু হায়! নারীর সাহচর্যে এলেই অধিকাংশ সুবোধ পুরুষের মন থেকে ভদ্রতার খোলস ঝ'রে প'ড়ে যায়। আবার এক অভিনয় দুর্বিপাকের আবর্তে তাকে ফেলে দিয়ে সে-ব্যক্তি স'রে পড়ে। অথবা কোনও সত্যিকারের ভদ্রলোক আমরণ একত্রেই জীবন কাটিয়ে দেয়, সকলের কাছে ঘৃণ্য হয়েও সে-নারী নিজে ধন্য হয়। সবাই তাকে গালাগালি দেয়, ঈর্ষার মেঘ থেকে নিন্দার বজ্র বর্ষিত হয়।

আগে যে বাঙাল-মা'র কথা উল্লেখ করেছি, তিনি এই বাড়িরই তেতলায় বাস করতেন। বয়স আশি পার হয়ে গেলেও বেশ শক্ত-সমর্থ ছিলেন। পূর্ববঙ্গে কোন এক পল্লীগ্রামে ছিল তাঁর পিত্রালয়, শৈশবেই পিতৃহীন হয়েছিলেন।

বাপের কথা মনে নেই, বিধবা মার একমাত্র সন্তান, আদরেই মানুষ হচ্ছিলেন। এর বেশি বাপের বাড়ির কথা আর স্মরণ নেই।

বাঙাল-মা'র জীবন-কথা তাঁর নিজের জবানিতেই বলি :

ছ'-সাত বছর বয়সে বিয়ে হয়ে মাকে ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ি চ'লে গেলুম। সেখানে তারা অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বড় দালান-বাড়ি তিনমহলা, জমি-জমা, চাকর-দাসী জনমজুর—জমজমে সংসার। গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গাই-বলদ। সংসারে শ্বশুর নেই, চারিটি ভাই একেবারে রাম-লক্ষ্মণ, আমি হচ্ছি ছোট বউ। শাশুড়ী বুকে তুলে নিয়ে নিজের সন্তানের মতন মানুষ করতে লাগলেন। কোন কষ্ট নেই, দুঃখ নেই, শুধু মধ্যে মধ্যে মার জন্যে মন-কেমন করতে থাকে, তাই কান্নাকাটি করি। শাশুড়ী মাঝে মাঝে মাকে আনিয়ে বাড়িতে রাখেন, আনন্দে দিন কাটে।

তার পরে এল যৌবন। সিঞ্চলে সূর্যোদয়ের মতন মর্মাচলের শিখরে শিখরে অনুরাগের ছোপ একটু একটু ক'রে লাগতে আরম্ভ করেছে মাত্র, এমনই একদিনে মা এসে তাঁর জামাইকে ধরলেন, বাবা, আমার তো ছেলে নেই; তুমিই আমার ছেলে, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও, ছেলের কাজ কর। একটা বিধবার সেখানে থাকতে কতই-বা খরচ হবে! মাসে তিনটে টাকা হ'লেই আমার চ'লে যাবে।

মা ছিলেন ভালো মানুষ। এজন্যে আমার শ্বশুরবাড়ির সকলেই, ভাশুরেরা পর্যন্ত তাঁকে পছন্দ করতেন। মা'র ছিল অল্প বয়েস, আমার বড় ননদ মা'র চেয়ে বয়েসে বড় ছিল। শাশুড়ী মাকে মেয়ের মতন যত্ন করতেন, এলে ছাড়তে চাইতেন না।

ভাশুরেরা সব ভাইয়ে মিলে পরামর্শ ক'রে ঠিক করলেন, সরকারী তহবিল থেকে মাসে পাঁচ টাকা ক'রে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, আর আমার স্বামী গিয়ে তাঁকে কাশীতে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

তখন নৌকো চ'ড়ে কাশী যাওয়া হ'ত।

ভাশুরেরা তাঁদের মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে এলেন, মার অনুমতি বিনা কিছুই হবার জো নেই। শাশুড়ী ছেলেদের মুখে সব শুনে বললেন, আমিও কাশীবাসী হব।

বাড়িতে হৈ-হৈ প'ড়ে গেল। মা'র কাশী যাওয়া সে তো চাট্টিখানি কথা নয়! সবাই তাঁকে মানা করতে লাগল, ভাশুরেরা আমার স্বামীর নাম ক'রে

বলতে লাগলেন, ওর ছেলেপিলের মুখ দেখে তার পরে যেও। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা, কাশীবাসী হবেনই।

অগত্যা বন্দোবস্ত শুরু হ'ল। ঠিক হ'ল, আমার বড় ও মেজো ভাশুর, আমার বড় জা, শাশুড়ী ও মা যাবেন। মাকে ও শাশুড়ীকে সেখানে স্থিতি করিয়ে দিয়ে দুই ভাশুর ফিরে আসবেন বড় জাকে নিয়ে, সে প্রায় ছ'মাসের ধাক্কা।

বাইরে সব বন্দোবস্ত চলেছে। শুভযাত্রার বোধ হয় আর মাসখানেক দেরি আছে। শাশুড়ী প্রতিদিনই সন্ধ্যের সময়, কোনদিন কোন বউকে, কোনদিন কোন ছেলেকে ডেকে উপদেশ দেন। আমাকে দিনরাত বলেন, মা লক্ষ্মী, তুমি এ সংসারে সবার শেষে এসেছ, শেষ অবধি দেখো, যেন আমার শ্বশুরের সংসার না ভেঙে যায়! আমার স্বামীকে কোন উপদেশ দিতে গেলে তিনি কোন কথা কানে না তুলে মাকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে থাকেন।

এমনই দিন চলেছে, এমন সময় চৈত্র মাসের প্রথমেই ওলাউঠা হয়ে তিন দিনের দিন আমার স্বামী মারা গেলেন।

তার পর একদিন সন্ধ্যাবেলা কালবৈশাখীর ঝড় বুকে ভ'রে নিয়ে আমাদের নৌকো তিনটি বিধবাকে নিয়ে কাশীর দিকে ভেসে চলল, সঙ্গে রইলেন মেজো ভাশুর।

কাশীতে এসে পৌছেছিলুম ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগে (অর্থাৎ আজ থেকে এক শতাব্দীরও পূর্বে)। মা, শাশুড়ী ও আমি—তিনটি বিধবা, তখনকার দিনে মাসে দু'টাকায় একজন বিধবার রানীর হালে চ'লে যেত। আর আজ পাঁচ টাকাতেও চলে না।

এখানে এসে কত ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামীই দেখলুম, সে সবার ইতিহাস বলতে গেলে এখন একটা মহাভারত হয়ে যাবে।

বাড়ি থেকে মাসে মাসে নিয়মিত টাকা আসতে লাগল। আমাদের তিনটি বিধবার কোনও কষ্টই ছিল না। বছর-দশেক এই ভাবে স্বচ্ছন্দে কাটবার পর আমার শাশুড়ী মাস-ছয়েক আমাশায় ভুগে ভুগে কাশীতে দেহরক্ষা করলেন, আমার বয়েস তখন ছাব্বিশ, মার বয়েস বেয়াল্লিশ।

তখন আমার বড় মেজো দুই ভাশুর গত হয়েছেন, একমাত্র ছোট ভাশুর

শাশুড়ীর অসুখ করা থেকে আরম্ভ ক'রে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা নিয়মিত

বাড়িতে খবর পাঠিয়েছিলুম, মাঝে মাঝে ছোট ভাশুর জবাবও দিতেন; কিন্তু সেখান থেকে মাকে কেউ দেখতে আসে নি। শাশুড়ীর শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে যাবার পর মেজো ভাশুরের এক ছেলে আমাকে ও মাকে গালাগালি দিয়ে এক দীর্ঘ পত্র লিখে জানালে যে, আমরা তার পিতামহীকে বিনা চিকিৎসায় মেরে ফেলেছি।

মা ওদের চিঠি প'ড়েই বললেন, ব্যস্, আর ওরা খরচপত্র পাঠাবে না ব'লে মনে হচ্ছে, এবার তা হ'লে কাজকর্মের যোগাড় করতে হয়।

মার কথা অক্ষরে-অক্ষরে ফ'লে গেল। সেই থেকে তারা আর আমাদের কোনও খোঁজই নেয় নি, টাকাকড়িও আর পাঠায় নি। অনেক চিঠি লিখেছিলুম, কিন্তু তার কোনও জবাবই পাই নি।

সেই থেকে দুই মা-বেটীতে কখনও লোকের বাড়িতে রান্নার কাজ ক'রে, জাঁতা ভেঙে, কাঁথা সেলাই ক'রে, বড়ি দিয়ে দু'জনের পেট সুখে-দুঃখে চালিয়ে নিতে লাগলুম। দেখতে দেখতে কাশীর কত পরিবর্তনই হ'ল, কত লোক এল গেল, আমরা দুটি বিধবা অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে চললুম। একমাত্র ভাবনা, আমাদের মধ্যে কে আগে যায়, কে প'ড়ে থাকে! যে আগে যাবে, সে-ই বেঁচে যাবে। শেষকালে মা-ই আগে চ'লে গেল, সেও আজ পঁচিশ-তিরিশ বছর হবে।

বাঙাল-মা এই বাড়িরই তেতলায় বাস করতেন। কাশীর ছোট-বড় সব বাঙালী-মাত্রেই বাঙাল-মাকে চিনত, তিনিও প্রায় সকলেরই নাড়ীনক্ষত্র অবধি জানতেন। জয়া-গিন্নীর ঘর দু-খানার পাশে তেতলায় ছোট্ট একখানা ঘর ছিল, তার পাশেই ছাত। এই ঘরখানা রাজকুমারী বাঙাল-মাকে বিনা ভাড়ায় থাকতে দিয়েছিল। জয়া-গিন্নী তাঁকে খেতে-পরতে দিত, তার বদলে তিনি তাদের রান্না করতেন, তার মেয়ের তদারক করতেন, মোট কথা, তার সমস্ত সংসারটাই তিনি দেখতেন। কোন্ রাত থাকতে উঠে একটা বড় বালতি নিয়ে তিনি গোবর সংগ্রহ করতে বেরুতেন। বেলা দশটার মধ্যে প্রায় মাইল পাঁচ-সাত ঘুরে তিন বালতি গোবর এনে উঠোনের এক কোণে জমা করতেন। দু-তিন দিন পরে পরে সেই গোবর ছাতে তুলে নিয়ে গিয়ে ঘুঁটে দিতেন। জয়া-গিন্নীর ইন্ধনের খরচ লাগত না। আমরা দেখতুম, বাড়িসুদ্ধ লোক যখন যার প্রয়োজন, তাল-তাল গোবর নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করছে, কিন্তু কোনদিন বাঙাল-মা'র মুখে এজন্যে একটু ক্ষীণ আপত্তিও শুনি নি। জয়া-গিন্নী

তীর্থে যাবার আগে ঘর-দোর দেখবার ভার তাঁরই ওপর দিয়ে গিয়েছিল। এই ক'মাসের খরচও দিয়ে যেতে সে ভোলে নি।

বাঙাল-মা আমাদের ওপরে ডেকে নিয়ে গিয়ে জয়া-গিন্নীর ঘরে বসিয়ে বলতে লাগলেন, ও লোকগুলো ভালো নয়, সব নেশাখোর। আর ওই যে বষ্ঠিনাথ, যাকে ওরা ডাকতে গিয়েছিল, সে একটা সাংঘাতিক লোক। কত বউ-ঝির সর্বনাশ যে সে করেছে, কত যে মানুষ হত্যা করেছে, তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই। সে-লোকটা লক্ষ্মীমণির বোনপো হয়।

তার সঙ্গে ঝগড়া করতে বাঙাল-মা আমাদের পই-পই ক'রে বারণ ক'রে দিলেন।

আমরা নীচে নেমে এসে পরামর্শ করতে লাগলুম, কি করা যায়! কোথা থেকে যে কি হ'ল কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। কে বষ্ঠিনাথ? কোনও জন্মে তাকে চোখে পর্যন্ত দেখি নি, সে কেন আমাদের এত বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াল? হায় ভগবান! দু'দিনের জন্যেও কি তুমি শান্তি দেবে না? কল্পনায় এতদিন ধ'রে যে মনোরম ভবিষ্যতের ছবি তৈরি করেছিলুম, মনের মধ্যে তা মিলিয়ে যেতে লাগল। অত্যন্ত ক্ষুণ্নমনে কালকের বাসী লুচি তরকারি ও ক্ষীর নিয়ে খেতে বসা গেল।

খাওয়া চলছে, এমন সময় পরিতোষ দপ ক'রে জ্ব'লে ওঠার মতো আসনপিঁড়িতে হঠাৎ উবু হয়ে ব'সে বললে, দেখ্ স্থবিরে, ওই বষ্ঠিনাথ না ফষ্ঠিনাথ সে এসে যদি কিছু বলে কিংবা মারধোর করে, তা হ'লে সহজে ছাড়া হবে না কিন্তু, আমরা যে কলকাতার ছেলে সে-কথা ব্যাটাকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে।

পরিতোষের কথায় হাঁ দিয়ে আর একখানি লুচি ক্ষীরে সাপ্‌টে মুখে তুলেছি, এমন সময় বাজখাঁই গলায় উঠোনে কে যেন হুঙ্কার ছাড়লে, মাসী আছ, মাসী?

আমরা দুজনে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছি, বাক্য নেই, কারণ মুখগহ্বর লুচি ও গব্যে একেবারে নিরেট ঠাসা। এমন সময় আবার হুঙ্কার উঠল, এই যে, মাসীর দরজা খোলা রয়েছে—

'মাসী' ব'লে যে লোকটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, ছ'-ফুটেরও ওপর সে লম্বা আর সেই অনুপাতে চওড়া, দেখলেই মনে হয় খুনে।

আত্মরক্ষার সংস্কারবশত তখুনি বুঝে নিলুম, এই লোকটাই বষ্ঠিনাথ।

শুধু তাই নয়, তার চেহারার সঙ্গে আমাদের কাশীপ্রাপ্তির একটা নিয়ত সম্ভাবনায় আমার বুকের মধ্যে মহাপ্রাণী বার-দুয়েক ডানা-ঝাপটা দিয়ে উঠল।

লোকটা চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে কঠিন দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। তার চোখ-দুটো জবাফুলের মতো লাল, বোধ হয় তক্ষুনি গাঁজা-টাঁজা টেনে এসেছে। গায়ে একটা লম্বা-হাতা কোমর অবধি ঝোলা পিরান, তার ওপরে কালো গরম কাপড়ের ওয়েস্ট-কোটের মতন একটা কোর্তা, আজকের দিনে হ'লে সেটাকে জওহর-কোট বলা চলতে পারত। এক কাঁধে একখানা আলোয়ান বেশ পরিপাটী ক'রে পাট করা, কোঁচা ঝুলিয়ে ধুতি পরা।

পরিতোষের দিকে ফিরে দেখলুম, সে নিশ্চিন্তমনে লুচির পর লুচি মুখের মধ্যে পুরে চলেছে।

লোকটা কিছুক্ষণ আমার দিকে কটমট ক'রে চেয়ে থেকে আবার হুঙ্কার ছাড়লে, ওহে ছোক্‌রা, একবার এদিকে এস তো।

লোকটাকে সেখান থেকেই আর একবার বেশ ক'রে দেখে নিলুম, সে আমার বাবার চাইতে ষণ্ডা কিনা!

দেখলুম, বাবার চাইতে সে লম্বা বটে, কিন্তু চওড়ায় কিছু কম। মনে মনে পিতৃনাম স্মরণ ক'রে উঠে পড়া গেল। তার পর বেশ ধীরে-সুস্থে হেলে-দুলে চৌকাঠের কাছে গিয়ে আঙুল চাটতে চাটতে জিজ্ঞাসা করলুম, কি বলছ?

বলছি, তোমরা কারা?

আমি বললুম, আমরা? আমরা—আমরা।

বদ্যিনাথ এবার সিংহের মতন গ'র্জে উঠে বললে, তা জানি। জিজ্ঞাসা করছি, তোমাদের বাড়ি কোথায়? এখানে এসে জুটলে কি ক'রে?

আমাদের বাড়ি কলকাতায়, গুরুমা আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন।

বদ্যিনাথের হুঙ্কার শুনে তেতলা থেকে বাঙাল-মা, দোতলার দু-তিন ঘর থেকে ভাড়াটেরা, রসিয়ার মায়ি ইত্যাদি সব ইতিমধ্যে নীচে এসে জমা হয়েছিল। তারা সকলেই তাকে চেনে, সবাই তাকে নিরস্ত হবার জন্যে অনুনয় করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। সবাই মনে করতে লাগল, ছেলে-দুটোর অকালমৃত্যু অনিবার্য।

কিন্তু সকলের অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে বদ্যিনাথ আবার হুঙ্কার ছাড়লে, তোমার বাবাকেলে গুরুমা, শালা! দেখ, অনেক শালা কলকাতার লোক

এখানে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ভালো চাও তো এক্ষুনি বেরোও এখান থেকে, নইলে—

বষ্ঠিনাথের গালাগালি শুনেই পরিতোষ যে কাঁসিটায় খাচ্ছিল, তার কানা ধ'রে উঠে এসে দাঁড়াল আমার পাশে ; ভরসায় বুক ভ'রে উঠল।

বললুম, দেখ চাঁদ, যা বলবার বল, গালাগালি করলে ভালো হবে না ব'লে দিচ্ছি।

'তবে রে শালা' ব'লে বষ্ঠিনাথ সেইখান থেকেই তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে একটি ঝট্‌কায় আমার দেহটাকে ফাৎনার মতন বাইরে টেনে নিয়ে গিয়েই মারলে এক চড। আমি বাঁ হাত দিয়ে চড়ের বেগ কিছু আটকালুম বটে, কিছু যেটুকু এসে মাথায় লাগল, তাতেই ভবিষ্যদ্দৃষ্টি খুলে গেল।

কেউ হাত চেপে ধরলে তার বুড়ো-আঙুলটা মুচড়ে দিতে পারলে, সে যত বড় পালোয়ানই হোক, তাকে হাত ছাড়তেই হবে। আমি এক হাত দিয়ে বষ্ঠিনাথের বুড়ো-আঙুলটা মুচড়ে দেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু সে ছিল শক্তিশালী, আমি এক হাত দিয়ে তার আঙুলটা নাড়তেও পারলুম না। শেষকালে উপায়ান্তর না দেখে তার বুড়ো-আঙুলটা কামড়ে ধরলুম। সে অন্য হাত দিয়ে আমার মুখে ঘুষো মারতে আরম্ভ ক'রে দিলে, আমার নাক দিয়ে দরদর ক'রে রক্ত ছুটতে লাগল। বাঙাল-মা ও রসিয়ার মা তারস্বরে চিৎকার করতে আরম্ভ করলে। আমি প্রাণপণ ক'রে আঙুল কামড়িয়েছি। তার মাংস কেটে দাঁত ব'সে যাচ্ছে বুঝতে পারছি। সঙ্কল্প যে, হাত না ছাড়লে ব্যাটাকে নির্ঘাত একলব্য ক'রে ছাড়ব, এমন সময় পরিতোষ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার কোঁচাটা ধ'রে ফর্‌র্‌র্‌র্ ক'রে টেনে ধুতিখানা খুলে নিলে।

আচমকা অধমাঙ্গ বস্ত্রশূন্য হওয়ায় বষ্ঠিনাথ মুহূর্তের জন্যে হক্‌চকিয়ে গেল। চারদিকে মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে, তারা সবাই তাকে সাক্ষাৎ যমের মতন ভয় করে, তাদের সামনে এতবড় বেইজ্জত! সে চট্ ক'রে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে কাঁধ থেকে পাট-করা র‍্যাপারটা টেনে নিয়ে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পাট খুলে পরবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি আর কালবিলম্ব না ক'রে তার তলপেটে মারলুম এক লাথি। 'উ' 'উ' আওয়াজ ক'রে একবার ঘুরপাক খেয়ে সে মাটিতে ব'সে পড়ল। আমি দৌড়ে গিয়ে কুয়োর ধারের লোটাখানা তুলে নিয়ে তার মাথা টিপ করছি, এমন সময় তড়াক ক'রে উঠে সে আমার দিকে দৌড়ে

আসতে লাগল। লোটাটা ছুঁড়ি আর কি, ঠিক সেইসময় একটা বড় গোবরের তাল তার মুখের ওপর এসে পড়ল।

বষ্ঠিনাথ যেভাবে দুই চোখ পাকিয়ে হিংস্র জানোয়ারের মতো মুখ হাঁ ক'রে দাঁত বের ক'রে আমার দিকে তেড়ে আসছিল, তাকে দেখে মনে হয়েছিল যে, লোটার আঘাতে যদি তাকে সাংঘাতিকভাবে কাবু না করতে পারি, তা হ'লে আমার মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু জয় বাবা বিশ্বনাথ—যাঁর দয়ায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, অতি দুঃখের দিনেও সাড়ে তিন টাকা খরচ ক'রে সেদিন যাঁর পূজো দিয়েছি, তিনি যে বাঙাল-মা'র গোবর্ধনগিরির মধ্যে ইন্দ্রজিতের শক্তিশেল লুকিয়ে রেখেছিলেন, কে তা জানত! আর অব্যর্থ বন্ধু পরিতোষের সন্ধান!—বষ্ঠিনাথের চক্ষু ও মুখগহ্বর পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

গোবরের তালটা পডতেই বষ্ঠিনাথ চোখের যন্ত্রণায় চিৎকার ক'রে দুই হাত চোখে দিয়ে বোঁ-বোঁ ক'রে ঘুরতে আরম্ভ ক'রে দিলে। পরিতোষ সেই তালে একলাফে এগিয়ে গিয়ে তার কোমর থেকে র‍্যাপারটা টেনে নিয়ে একেবারে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলে।

রসিয়ার মা, বাঙাল-মা ও বাডির অন্যান্য ভাডাটেরা আর্তনাদ করতে লাগল। ইতিমধ্যে আমি একতাল গোবর বষ্ঠিনাথের মুখে মারতেই সে চোখের যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে কবন্ধের মতন উঠোনময় দুই হাতে শূন্য আলিঙ্গন ক'রে ছুটোছুটি করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। রসিয়ার মায়ি কোথা থেকে একখানা গামছা এনে বষ্ঠিনাথের হাতে দিতেই সে সেখানা কোমরে জড়িয়ে মাটিতে ব'সে পড়ল। ঠিক সেইসময় কমণ্ডলু-হস্তে রণক্ষেত্রে গুরুমা'র আবির্ভাব।

তখন উঠোনময় গোবরের ছড়াছড়ি, বষ্ঠিনাথ চলতি বাংলায় চিৎকার ক'রে জানাচ্ছে যে, অচিরভবিষ্যতেই আমাদের স্থানবিশেষে আশ্রয় নিতে হবে। রসিয়ার মা, বাঙাল-মা ও বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটের দল সকলেই সশব্দে এই গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য করছে, আমার নাক দিয়ে তখনও টপটপ ক'রে রক্ত পড়ছে।

গুরুমা শান্ত দৃষ্টিতে চারদিক দেখে কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কি ব্যাপার বষ্ঠিনাথ?

বষ্ঠিনাথ কোমরে গামছা জড়াতে জড়াতে দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলে, এ ছোঁড়া-ছুটো কে জিজ্ঞাসা করি?

গুরুমা তার কথার কোনও জবাব না দিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, গোপাল, একি, তোমায় মেরেছে ?

তারপর বঙ্কিনাথের দিকে ফিরে বললেন, কেন মেরেছ তুমি একে ? তোমার কি ক্ষতি করেছে এ ?

বঙ্কিনাথ এ-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে গুরুমাকে বলতে লাগল, তুমি কোথা থেকে এ ছোঁড়া-ছুটোকে নিয়ে এসে বাড়িতে রেখেছ, নিন্দেয় আমার পথ-চলা দায় হয়েছে—

বঙ্কিনাথ আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু গুরুমা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, আমি ছোঁড়া ধরি কি বুড়ো ধরি, তাতে তোমারই বা কি আর তোমার বাবারই বা কি? আমার যা খুশি আমি তাই করব, সেজন্যে কি তোমার কাছে জবাবদিহি হতে হবে ?

আমাকে তো সমাজে বাস করতে হয় !

কে তোমাকে সমাজে বাস করতে বারণ করেছে ? আমার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কিসের ? আমার মাকে তো তোমরা বেশ্যা বল, তার পয়সা আর তার বাড়ি ছেড়ে দাও তা হ'লে। বেশ্যার অন্ন খেয়ে সমাজে বাস করছ কি ক'রে জিজ্ঞাসা করি ?

বঙ্কিনাথ একেবারে চুপ।

গুরুমা বললেন, যাও, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। গুণ্ডামি ক'রো কাশীর রাস্তায়, এদের সঙ্গে গুণ্ডামি করতে এসে মজা বুঝতে পেরেছ তো ? এরা জাত-সাপের বাচ্চা।

বঙ্কিনাথ সাপের মতন নিশ্বাস ছেড়ে বললে, আচ্ছা, কেমন জাত-সাপের বাচ্চা আমিও বুঝে নোব—আমার নাম বঙ্কিনাথ।

গুরুমা বললেন, যা বোঝবার এ-বাড়ির বাইরে বুঝো, এখানে ঢুকে ফের যদি হাঙ্গামা কর তো বাপের বিয়ে দেখিয়ে দোব। জান তো আমাকে, আমার নাম লক্ষ্মীমণি।

গুরুমা'র কথার কোনও জবাব না দিয়ে গামছার এক খুঁট দিয়ে চোগ-মুখের গোবর পরিষ্কার করতে করতে বঙ্কিনাথ বললে, আমার ধুতি র‍্যাপার কোথায় ?

রসিয়ার মা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, কুয়োর মধ্যে।

বঙ্কিনাথ বোধ হয় সাংঘাতিক একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়

রসিয়ার মা বললে, তুমি বাড়ি যাও, আমি তোমার ধুতি, গায়ের চাদর পৌঁছে দিয়ে আসব।

বিষ্টিনাথ আর কোনও কথা না ব'লে দরজার দিকে অগ্রসর হ'ল। দু-কদম গিয়ে আবার ফিরে এসে আমাদের বললে, রাস্তায় বেরিও।

লোকটা চ'লে গেল। গুরুমা একবার চারিদিক দেখে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, আমাদের সঙ্গে কোনও কথা বললেন না। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলুম, কমণ্ডলুটা যথাস্থানে রেখে নামাবলীখানা গা থেকে খুলে বিছানার ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তারপর দরজাটা বন্ধ ক'রে সশব্দে খিল লাগিয়ে দিলেন।

বাঙাল-মা ও বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেরা যে-যার ঘরে ফিরে গেল। রসিয়ার মা উঠোন মুক্ত ক'রে কাঁটাওয়ালা ডেকে নিয়ে এসে বিষ্টিনাথের ধুতি ও র‍্যাপার তুলে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে চ'লে গেল। আমরা স্নান ক'রে গোবর-মুক্ত হয়ে ঘরে এসে বসলুম। রসিয়ার মা বিষ্টিনাথের বাড়ি থেকে ফিরে এসে উনুনে আগুন দিয়ে গুরুমা'র দোরগোড়ায় উনুন রেখে বাড়িতে নাইতে-খেতে চ'লে গেল।

আমার নাক দিয়ে রক্ত-পড়া বন্ধ হয়ে গেল বটে, কিন্তু দেখতে দেখতে নাকটা ফুলে ঢোল হয়ে উঠল। বাড়িটা সেদিন অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় থমথম করতে লাগল। ভাড়াটেরা যে-যার রান্না-খাওয়া শেষ ক'রে ফেললে। উঠোনে আমাদের তোলা-উনুন জ্ব'লে জ্ব'লে নিবে গেল। আমরা দুজনে পাশাপাশি শুয়ে, কিন্তু কারুর মুখে কোনও কথা নেই। উত্তেজনার পর অবসাদে দুজনেরই শরীর ও মন ক্লান্তিতে অবসন্ন। অবশেষে দুজনেই পাশবালিশ জড়িয়ে শুয়ে পড়লুম।

রসিয়ার মা'র গলার আওয়াজে যখন ঘুম ভাঙল, তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ঘুম ভাঙতেই মনে হতে লাগল, যেন ভোর হয়ে গিয়েছে।

গুরুমা তখনও দরজা খোলেন নি। ঘণ্টাখানেক ধ'রে ডাকাডাকি ক'রে কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

চৌকে গিয়ে দুজনে দু'ভাঁড় সিদ্ধি খাওয়া গেল। সারাদিন পেটে ভাত পড়ে নি। একটা খাবারের দোকান থেকে পুরি-কচৌড়ি খেয়ে বিশ্বনাথ দর্শন ক'রে ঘণ্টা-দুয়েক রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে অবসাদটা কাটিয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন আটটা বেজে গিয়েছে।

গুরুমা তখনও দরজা খোলেন নি। দরজায় দমাদ্দম ধাক্কা মারতে শুরু ক'রে দিলুম। চেঁচিয়ে বললুম, দরজা না খুললে কোতোয়ালকে খবর দেব, তারা এসে

দরজা ভেঙে ফেলবে। কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দই পেলুম না, আমরা নিজেদের ঘরে গিয়ে অন্ধকারে ব'সে রইলুম, কারণ গুরুমা'র ঘরে তেল থাকে, তাই আমাদের ঘরে প্রদীপ জ্বলে নি।

রাত্রি ভোর হ'ল। রসিয়ার মা'র কাছে শুনলুম, গুরুমা নাকি শেষরাত্রির দিকে একবার মিনিট-পাঁচেকের জন্যে দরজা খুলে বেরিয়েছিলেন। আমরা মুখ-টুখ ধুয়ে খানিকক্ষণ দরজা-ধাক্কাধাক্কি করলুম, কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়াই পেলুম না।

ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর হয়ে দাঁড়াতে লাগল। কাল সারাদিন গুরুমা জলগ্রহণ করেন নি, আজও সারাদিন তেমনই কাটল। সমস্ত দিন ধ'রে দরজা-ধাক্কাধাক্কি ক'রে কোনও সাড়া না পেয়ে সন্ধ্যের পর বেরিয়ে গিয়ে আমরা বাজার থেকে খাবার খেয়ে এলুম। সেদিন পরিতোষ বললে, যাবার সময় জয়া-গিন্নী তাকে কুড়িটা টাকা দিয়ে গিয়েছে।

বাড়িতে ফিরে এসে বিছানার ওপরে দুজনে মুখোমুখি হয়ে ব'সে রইলুম। কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারলুম না। ঘণ্টাখানেক এইভাবে কাটবার পর বাঙাল-মা উঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি দাদারা, অন্ধকারে ব'সে কি করছ? চল, ওপরে গিয়ে বসি।

বাঙাল-মা'র সঙ্গে ওপরে উঠে গেলুম। প্রদীপ জ্বালিয়ে আমাদের দুজনকে তাঁর দু'পাশে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

বললুম, বাজার থেকে কিছু খাবার কিনে খেয়েছি।

বাঙাল-মা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ফিসফিস ক'রে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ছেনাল মাগী দরজা খুলেছিল?

ঘাড় নেড়ে জানালুম, না।

বাঙাল-মা বললেন, তোরা বাড়ি থেকে না গেলে ও দরজা খুলবে না।

বাঙাল-মা অতি মৃদুস্বরে বললেন বটে, কিন্তু কথাগুলোর গুরুত্ব এত বেশি যে, পরিতোষ—যে কানে শুনতে পায় না—সেও চমকে উঠে বললে, সে কি!

বাঙাল-মা দয়ার্দ্রকণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ দাদু, তাই তো মনে হচ্ছে। তোমরা তো আর প্রথম নও, এই কাণ্ডই তো দেখে আসছি বরাবর।

আমরা আর কথা কইতে পারলুম না। বাঙাল-মা গোটা দুই-তিন মোটা কাঁথা এনে আমাদের দুজনের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে নিজে মাঝখানে বসলেন। সেই দয়াবতী নারী—সারাজীবন দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করতেই যাঁর জীবন কেটেছে

—আমাদের মনে যে কি ঝড় উঠেছে, তা বুঝতে পেরে আশ্বাস দিতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন, কোনও ভয় নেই দাদু, ভগবান আছেন, তিনি তোদের রক্ষা করবেন। একবার ভেবে দেখ্, সহায়সম্পদহীনা বিধবা আমি এই নির্বান্ধব দেশে সারা জীবনটাই তো কাটিয়ে দিলুম, সুখে-দুঃখে কেটে তো গেল।

পরিতোষ বললে, বোধ হয় ওর বোনপোকে আমরা মেরেছি ব'লে চ'টে গিয়েছে।

বাঙাল-মা একটা ঘৃণার 'হুঁ' উচ্চারণ ক'রে বললেন, ওর চোদ্দপুরুষের বোনপো! না না, ও-মাগীর চিরকেলে স্বভাবই ওইরকম। আমি তো ওকে আজ নতুন দেখছি না!

বাঙাল-মা রাজকুমারীর ইতিহাস বলতে লাগলেন—

অনেক—অনেক দিন আগে এই বাড়িতে শাহুমশায় নামে এক ভদ্রলোক বাস করতেন। ঢাকা অঞ্চলে বাড়ি ছিল, নিজের বড় কারবারও ছিল। ছেলে ছিল না, একমাত্র মেয়ে, সেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই রেখেছিলেন। সেই সময় ঢাকার দিকে প্রতিবৎসরই কলেরার মড়ক লাগত। একবার ওই ব্যামোয় একসঙ্গে স্ত্রী ও জামাই মারা যাওয়ায় শাহুমশায় ব্যবসাপত্র তুলে সব বেচে পুঁজিপাটা ও মেয়ে নিয়ে এলেন কাশীবাস করবেন ব'লে। এখানে এসে খান-তিনেক বাড়ি কিনে ভাড়াটে বসিয়ে নিজে এই বাড়িটাতে বাস করতে লাগলেন। শাহুমশায় জাতিতে ছিলেন গন্ধবণিক। তাঁর মতন সচ্চরিত্র লোক এখানে বাঙালীদের মধ্যে খুব কমই ছিল। কত ব্রাহ্মণের ছেলে তাঁর পায়ের ধুলো নিত, তার ঠিকানা নেই।

স্বামীজী অর্থাৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামী তখনও বেঁচে। শাহুমশায় গিয়ে তাঁর শিষ্য হলেন। মেয়ের নাম ছিল তরঙ্গিণী। কিছুদিন যেতে-না-যেতে শাহুমশায় তরঙ্গিণীকে নিয়ে স্বামীজীর কাছে যেতে আরম্ভ করলেন। মাসকয়েক বাদেই শুনলুম, তরঙ্গিণীও তাঁর শিষ্যা হয়েছে, অথচ কাশীতে এসে অবধি আমরা শুনতুম, স্বামীজী কারুকেই শিষ্য কিংবা শিষ্যা করেন না।

বাপ-বেটীতে গেরুয়া প'রে সাধন-ভজন আরম্ভ ক'রে দিলে। একদিন দু'দিন অন্তর খায়, সারা দিনরাত দরজা বন্ধ ক'রে ঘরে ব'সে সাধন-ভজন করে।

তরঙ্গিণীর নানারকম বিভূতি দেখা দিতে লাগল। যাকে যা বলে, তাই ফ'লে যায়। কাশীসুদ্ধ মেয়েমদ্দ সেই গন্ধবণিকের মেয়ের পায়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল। ইতিমধ্যে র'টে গেল, স্বামীজী নাকি ব'লে দিয়েছেন—তরঙ্গিণী এই

জন্মেই সিদ্ধিলাভ করবে। সেইসঙ্গে এ-কথাও র'টে গেল যে—শাহুমশায়ের সিদ্ধিলাভ হবে, তবে এখনও দেরি আছে। তাঁর নাকি এ-জন্ম ছাড়া আরও দু'বার জন্মাতে হবে, তবে মুক্তিলাভ হবে।

তরঙ্গিণীর অনেকরকম বিভূতি থাকা সত্ত্বেও অনেক লোক মনে মনে তার বাবা শাহুমশায়কেই ভক্তিশ্রদ্ধা করত বেশি। তারা মনে করত যে, তিনি মেয়ের চাইতে অনেক উঁচুতে উঠে গেছেন ব'লেই বিভূতি-টিভূতিগুলো চেপে রেখে দিয়েছেন; কিন্তু মুক্তি পেতে দেরি আছে শুনেই তাঁর প্রতি ভক্তির মাত্রা লোকের মনে একেবারে ক'মে গেল, রাজ্যসুদ্ধ লোক এসে পড়ল তরঙ্গিণীর পায়ে।

যশের মজাই এমন, তরঙ্গিণীও মনে করতে লাগল যে, সে তার বাপের চাইতে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। তারা যখন প্রথম কাশীতে আসে, তখন শাহুমশায় বলতেন যে, তাঁর মেয়ে সতরো বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল। কিন্তু তরঙ্গিণী এখন বলতে লাগল যে, স্বামী যখন মারা যায়, তখন তার মাত্র আট বছর বয়স ছিল, অর্থাৎ সে আজন্ম ব্রহ্মচারিণী।

মেয়ের হালচাল দেখে বাপের মনেও প্রতিযোগিতার ঈর্ষা অঙ্কুরিত হতে লাগল। তিনি দিনরাত সাধন-ভজনের দিকে মন দিলেন। এক-একবার এমনও হয়েছে যে, সাত দিন তিনি দরজা বন্ধ ক'রে থেকেছেন। তিন জন্মের কর্মফল এক জন্মে কাটিয়ে উঠতে পারা যায় কিনা তারই মহলা চলতে লাগল।

তারপর একদিন, ওই লক্ষ্মীমণি এখন যে ঘরে থাকে, সেই ঘরের দরজা ভেঙে দেখা গেল, মাথার শিরা ছিঁড়ে শাহুমশায়ের মৃত্যু হয়েছে।

শহরময় বাঙালীদের মধ্যে হৈ-হৈ প'ড়ে গেল। তরঙ্গিণী চন্দনকাঠ দিয়ে বাপের শব দাহ করলে।

বাপের শ্রাদ্ধশান্তি সমারোহের সঙ্গে হয়ে যাবার পর তরঙ্গিণী একদিন তার শিষ্য-টিষ্য নিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। কিন্তু মহাপুরুষদের চেনা মুশকিল। সেদিন সকলের সামনেই তিনি তরঙ্গিণীকে ব'লে দিলেন, কে তুই? তোকে তে চিনতে পারছি না!

তরঙ্গিণী কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমার বাবা মারা গিয়েছেন—

কিন্তু স্বামীজী তাকে গ্রাহ্যই করলেন না।

শিষ্য-শিষ্যা ও অনুগতদের সামনে এইভাবে অপমানিতা হয়ে তরঙ্গিণী গেল মহা চ'টে। সেও সকলের সামনেই স্বামীজীকে যাচ্ছেতাই ক'রে গালাগালি দিতে

দিতে সেখান থেকে চ'লে এল। সেদিন স্বামীজীকে তাঁর এক ভক্ত খাওয়াচ্ছিল। তিনি তরঙ্গিণীর কথার কোনও জবাব না দিয়ে নিজের মনে খেয়ে যেতে লাগলেন।

তরঙ্গিণী তো রেগে-মেগে সেখান থেকে চ'লে এল। তার সাধন-ভজন চুলোয় গেল, বাড়িতে লোক এলেই সবার কাছে স্বামীজীকে গালাগালি দেওয়াই হ'ল তার একমাত্র কর্ম।

কিছুদিন এমনই চলল। তারপর একদিন আপনা থেকেই তার বাড়িতে এক সন্ন্যাসী এসে হাজির হলেন। অদ্ভুত ছিলেন এই সন্ন্যাসী, আর অদ্ভুত ছিল তাঁর শক্তি! তিনি ছিলেন বাঙালী; কিন্তু কোথায় বাড়ি, কার শিষ্য, তা আমরা কেউ জানতে পারি নি। হঠাৎ কোথা থেকে একদিন তরঙ্গিণীর বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়ে বললেন, বেটী, আমি তোকে দীক্ষা দেব।

তরঙ্গিণী ছিল অতিশয় দাম্ভিকা, কিন্তু সন্ন্যাসীর কথা শুনে সে তখুনি একেবারে তার পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে বললে, বাবা, আমায় রক্ষে কর।

এই সন্ন্যাসী তরঙ্গিণীকে নতুন ক'রে দীক্ষা দিলেন। সারারাত্রি সন্ন্যাসী একটা ঘর বন্ধ ক'রে তরঙ্গিণীকে কি-সব শেখাতেন। অনেকে ওঁদের নামে অপবাদও রটাতে লাগল; কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি, এই সন্ন্যাসীর আওতায় আসার পর তরঙ্গিণীর শক্তি দশগুণ বেড়ে গেল।

বাঙাল-মা ব'লে চললেন, এই সন্ন্যেসীকে আমি দেখেছি, আমায় তিনি বড় স্নেহ করতেন। আমায় বলতেন, তুইও যোগিনী, তবে নিজেকে চিনতে পারিস নি।

আমার মা কিন্তু মুখে কিছু না বললেও বেশ বুঝতে পারতুম, তাঁর কাছে যাওয়া-আসা করাটা বিশেষ পছন্দ করতেন না।

এই সন্ন্যাসী ছিলেন তান্ত্রিক। তিনি কখনও থাকতেন কামাখ্যায়, কখনও বা হাজারিবাগের জঙ্গলে ছিন্নমস্তার মন্দিরে, কখনও কাশীতে, কখনও বা চ'লে যেতেন হিমালয়ে, যেখানে তাঁর গুরু থাকতেন। কখনও রেলে চড়তেন না, যেখানে যাবার দরকার হাওয়ায় উড়ে চ'লে যেতেন।

এতক্ষণ চলছিল মন্দ নয়। কিন্তু বাতাসে চ'ড়ে ঘোরাফেরার কথা শুনে আমাদের হাসি পেল; কারণ কোনও অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে যথোচিত লবণসহযোগে গ্রহণ করাই আমাদের সংস্কারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তার ওপরে আমাদের গোষ্ঠীপতি মহাত্মা রামমোহন প্রকাশ ক'রে গিয়েছিলেন

যে, দুর্বলাধিকারিগণের পক্ষে মূর্তিপূজাই প্রশস্ত; এ স্বতঃসিদ্ধ অনুসারেই মূর্তিপূজকদের আমরা দুর্বলাধিকারী ব'লেই জ্ঞান করতুম এবং সেইসঙ্গে নরাকার সগুণ ব্রহ্মোপাসকদের বংশধর হওয়ার ফলে নিজেরাও যে এক-একটি সবল-অধিকারী—এ জ্ঞানও ছিল টনটনে। এহেন সবল অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও চলতে-ফিরতে রাহাখরচ দিতে দিতে আমাদের প্রাণান্ত হতে হয়, আর কোথাকার কে একজন মূর্তিপূজক, তান্ত্রিক, দুর্বলাধিকারী—সে কিনা হাওয়ায় চ'ড়ে বিনা পয়সায় ঘোরাফেরা করে, এতবড় গুলটি গিলতে গলায় বেধে গেল। একটু শ্লেষের সঙ্গে হেসে জিজ্ঞাসা করলুম, খুব গাঁজা-টাজা টানতেন বুঝি?

বাঙাল-মা বললে, গাঁজা খেতে তো কখনও দেখি নি, তবে দিনরাত কারণ চলত।

তা হ'লে সাঁতার কেটে যাতায়াত করতেন বলুন।

এতক্ষণে বাঙাল-মা আমাদের রসিকতা বুঝতে পেরে জিভ কেটে বললেন, দাদু, মহাপুরুষদের নিয়ে অমন ঠাট্টা করতে নেই, ওতে অমঙ্গল হয়। আমার কথা বিশ্বাস না হয় তো ওই রসিয়ার মাকে জিজ্ঞাসা করিস। ও সেই তরঙ্গিণীর আমলের ঝি, ওর চোখের সামনেই সে-সব ঘটনা ঘটেছে।

একদিন, শীতকাল, রাত্রি বারোটা অবধি আমরা সন্ন্যেসীর কাছে ব'সে আছি, তিনি আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন আর মড়ার খুলিতে কারণ ঢেলে ঢেলে খাচ্ছেন, এমন সময় আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ব'লে উঠলেন, কি হয়েছে? অ্যাঁ, অসুখ? বাঁচবে না? আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, কোনও ভয় নেই।

সেদিন রাত্রি গভীর হয়ে পড়ায় তরঙ্গিণী আমাদের বাড়ি যেতে দিলে না। আমরা সন্ন্যাসীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সারারাত্রি সবাই মিলে বাকি রাতটুকু জেগে-জেগেই কাটিয়ে দিলুম। সন্ন্যোসী দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বাতি নিবিয়ে দিলেন। অতি প্রত্যুষে তিনি ও তরঙ্গিণী দুজনে গঙ্গা নাইতে যেতেন। সেদিন আমরা ঠিক করলুম, তাঁদের সঙ্গে গঙ্গাস্নান ক'রে যে-যার বাড়ি চ'লে যাব। কিন্তু কি আশ্চর্য! সকালবেলা উঠে দেখা গেল, ঘরের মধ্যে সন্ন্যাসী নেই। প্রায় তিন মাস বাদে একদিন 'কালী' 'কালী' ব'লে চিৎকার করতে করতে কোথা থেকে সন্ন্যাসী এসে হাজির হলেন।

আর একবার, আমার মা মারা যাবার অনেক পরে, একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বাবা, আমার শ্বশুরবাড়ির খবরাখবর জানতে ইচ্ছে করে, অনেক কাল সেখানকার কোনও সংবাদ পাই নি।

তিনি বললেন, আচ্ছা, কাল আসিস, ব'লে দেব।

পরদিন সকালবেলা তাঁর কাছে যাওয়া-মাত্র তিনি বললেন, ওরে, তোর ছোট ভাণ্ডরের যক্ষ্মা হয়েছে, সে আর বাঁচবে না, মাসখানেকের মধ্যেই মারা যাবে।

পরে জানতে পেরেছিলুম, তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

সন্ন্যাসীর সব ভাল ছিল, কিন্তু ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর নাম শুনলেই বলতেন, ও ব্যাটার পেটসর্বস্ব! কিছু বিভূতি-টিভূতি আছে এই যা—না হ'লে ও কিছুই নয়।

বেশ চলছিল, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে তরঙ্গিণীর দোতলায় একখানা ঘর ভাড়া করলে। ব্রাহ্মণের কোনও কুলে কেউ ছিল না, স্ত্রী কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছে, সঙ্গে একটি বছর আষ্টেকের মেয়ে।

সন্ন্যাসী তখন এখানে ছিলেন না। মাস-কয়েকের মধ্যেই ফিরে আসব ব'লে কোথায় চ'লে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণের নাম ছিল যদু মুকুটী। অতি সাত্ত্বিক লোক, দু-বেলা গঙ্গাস্নান, পূজা-অর্চনাতেই দিন কাটে—ব্রাহ্মণ হয়েও তিনি তরঙ্গিণীর পাদোদক খেতেন। শুধু তাই নয়, চাকরের মতন তার সেবা করতেন।

বছর-দুয়েক এইভাবে কাটল, কিন্তু সন্ন্যাসীর দর্শন নেই। তরঙ্গিণীই যোগাড়যন্ত্র ক'রে নিজের টাকা খরচ ক'রে মুকুটীমশায়ের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলে। সেই মেয়েরই ছেলে ওই বদ্যিনাথ, যে আজ সকালে তোদের সঙ্গে মারামারি করতে এসেছিল।

আরও প্রায় বছর দুই এই ভাবে চলল, তখনও সন্ন্যাসীর দেখা নেই। তরঙ্গিণী কিন্তু বলত, গুরুদেব নিশ্চয়ই আসবেন, মরবার আগে তাঁর সঙ্গে আর একবার দেখা হবেই। তার যশ দিনে দিনে বেড়েই চলল, এমন সময় শোনা গেল যে, সে মৌনব্রত অবলম্বন করেছে, কারুর সঙ্গে দেখা করবে না, কিছুকাল নির্জন-সাধনা করবে। একেবারে সিদ্ধ না হ'লে আর লোকালয়ে মুখ দেখাবে না।

তরঙ্গিণী আর কারুর সঙ্গে দেখা করে না। তার ঘরে কারুর ঢোকবার হুকুম নেই, যদু ঠাকুর ছাড়া। আমরা রোজই আসি আর নীচে থেকেই তার সংবাদ নিয়ে চ'লে যাই। তার ওপরে আমাদের শ্রদ্ধার মাত্রা দিনে দিনে বেড়েই চলল। তারপর গ্রীষ্মের এক রাত্রিশেষে ছাদের ওপরে সারারাত এপাশ-ওপাশ ক'রে ক'রে প্রতিবেশীদের চোখে সবে একটু তন্দ্রার ঘোর লেগেছে

মাত্র, এমন সময় সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠের চিৎকারে তরঙ্গিণীর সিদ্ধাই-লাভের সংবাদ মহল্লাময় ঘোষিত হতে লাগল। কৌতূহলী প্রতিবেশিনীরা চমকে বিছানায় উঠে বসল, তারপর সবাই ছুটল তার বাড়ির দিকে। সবাই এসে দেখলে তরঙ্গিণীর ঘরের দরজার চৌকাঠে মুকুটীমশায় গালে হাত দিয়ে উদাস-ভাবে ব'সে আছেন। ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখা গেল, মেনকার পাশে শকুন্তলার মতন তরঙ্গিণীর পাশে একটি শিশুকন্যা প'ড়ে আছে একরাশ জুঁইফুলের মতন।

সকাল হতে-না-হতে কাশীময় টি-টি প'ড়ে গেল—সকলের মুখেই ছি-ছি! সবাই বলতে লাগল, সন্ন্যাসিনীর এমন পতনের নজির নাকি মহাভারতেও নেই, মুকুটীর মতন পাষণ্ড সংসারে দুর্লভ।

আমরা তিন-চারটি বিধবা ছাড়া আর সকলেই তরঙ্গিণীকে পরিত্যাগ করলে। সে আমার গুরু হ'লেও ছিল আমার বন্ধু। এতখানি বয়স হ'ল আমার, কিন্তু তার মতন মেয়ে আমি আর দুটি দেখি নি।

তরঙ্গিণী কিন্তু আর বিছানা থেকে উঠল না। সন্তান হবার আগে থাকতেই তার অসুখ করেছিল, সন্তান জন্মাবার পর সে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। পুরো একটি বছর ভুগে ভুগে অস্থিচর্মসার হয়ে যায়-যায় এমন অবস্থা, সেই সময় হঠাৎ একদিন 'কালী' 'কালী' চিৎকার করতে করতে সন্ন্যাসী কোথা থেকে এসে হাজির হলেন। আমাদের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে তিনি বললেন, বেশ হয়েছে, এই তো চাই।—ব'লে তার ঘরে ঢুকলেন।

তরঙ্গিণী পাশ ফিরতে পারত না, সে তবুও উঠে গুরুদেবের পায়ের ধুলো নিয়ে একেবারে এলিয়ে পড়ল। সন্ন্যাসী তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, কিছু ভয় নেই মা, নির্ভয়ে চ'লে যা।

তরঙ্গিণী আবার উঠে মেয়েটিকে সন্ন্যাসীর কোলে তুলে দিয়ে লুটিয়ে পড়ল বিছানায়—আর তার জ্ঞান হ'ল না। চব্বিশ ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে থেকে সে চ'লে গেল।

তরঙ্গিণীর মৃত্যুর পর সন্ন্যাসী তার মেয়েটিকে কোলে ক'রে নীচে নেমে গিয়ে ওই ঘরটিতে আশ্রয় নিলে, যেখানে আজ লক্ষ্মীমণি থাকে। সন্ন্যাসীই ওর নাম

দিয়েছিলেন লক্ষ্মীমণি। সন্ন্যাসী ওকে মানুষ করতে লাগলেন, আর যদু মুকুটী দিনরাত, যে ঘরে তরঙ্গিণী মারা গিয়েছিল, সেই ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে সাধনা আরম্ভ ক'রে দিলেন। লোকে বলতে লাগল, তরঙ্গিণী অদ্ভুত স্ত্রীলোক ছিল, সন্ন্যাসীকে ক'রে গেল গৃহী আর গৃহস্থকে ক'রে গেল সন্ন্যাসী।

সেই থেকে সন্ন্যাসী এখানেই থেকে গেলেন। তিনি লক্ষ্মীমণিকে লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। মেয়েটার ছিল অদ্ভুত বুদ্ধি, পাঁচবছর বয়সেই বাংলা লিখতে-পড়তে শুরু ক'রে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তখনই অনেক সংস্কৃত কবিতা মুখস্থ বলতে পারত—সন্ন্যাসীই ওকে শিখিয়েছিলেন।

লক্ষ্মীমণির যখন আট বছর বয়েস, তখন সন্ন্যাসী খুব ধুমধাম ক'রে তাকে দীক্ষা দিলেন—সে তো সেদিনের কথা। তার পর কিছুদিন যেতে-না-যেতেই ওর মধ্যে অদ্ভুত সব বিভূতি প্রকাশ পেতে লাগল। লোক দেখলেই ও ব'লে দিতে পারত, কি তার নাম, কোথা থেকে সে আসছে, কোথায় তার বাড়ি, তার সারাজীবনের ইতিহাস গড়গড় ক'রে বলতে থাকত। পুরনো দিনের অনেকেই তখন ম'রে গিয়েছে, নতুন লোকের ভিড়ে আবার বাড়ির উঠোন দিনরাত ভর্তি হ'য়ে উঠতে লাগল—সকলেই নিজের ভবিষ্যৎ জানতে চায়। বারো বছরের মেয়ে লক্ষ্মীমণির পায়ে কাশীসুদ্ধ লোক লুটিয়ে পড়তে আরম্ভ করলে।

এই সময় একদিন সন্ন্যাসী যদু মুকুটীকে ডেকে বললেন, আমি চললুম, আর আমি আসব না। লক্ষ্মীকে মানুষ ক'রে দিয়ে গেলুম—ওর বিয়ে দিস নি।

সন্ন্যাসী চ'লে গেলেন। মুকুটীমশায় আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। সেই থেকে ওই বারো বছরের মেয়ে ভাড়াটেদের তদারক, বাপের সেবা, সংসারের সব কিছু দেখতে আরম্ভ ক'রে দিলে। মাঝে মাঝে মুকুটীমশায়ের মেয়ে অর্থাৎ ওই বদ্যিনাথের মা, এখানে সব তদারক করতে আসত বটে, কিন্তু লক্ষ্মীমণি তাকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিত। সেই বয়স থেকেই ওর এমন একটা ভারিক্কী চাল ছিল যে, বুড়োরা পর্যন্ত ওর কাছে ঘেঁষতে পারত না।

লক্ষ্মীমণির যখন প্রায় আঠারো বছর বয়েস, তখন ওর বাপ মুকুটীমশায় মারা গেলেন। তরঙ্গিণী যাবার আগে কাশীর তিনখানা বাড়ি, আর কেউ-বা বলে লাখ কেউ-বা বলে পঁচাত্তর হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ মুকুটী-মশায়কে লিখে দিয়ে গিয়েছিল। মুকুটীমশায় একখানা বাড়ি বদ্যিনাথের মাকে দিয়ে বাকি সমস্ত বিষয় লক্ষ্মীমণিকে দিয়ে গেলেন। সেই থেকে ও

নিজের সমস্ত বিষয়-আশয় দেখছে ও আপন-মনে সাধন-ভজন ক'রে চলেছে। ওর সব ভালো, কিন্তু ঐ এক দোষ—ঐ এক দোষেই ও সর্বনাশ করেছে। মাঝে মাঝে দেহজ্বরে ওকে বড় কাবু ক'রে ফেলে। সেইসময় রাস্তা থেকে এই তোদের মতন ছোট ছোট ছেলে ধ'রে নিয়ে এসে ওষুধস্বরূপ তাদের ব্যবহার করে, নইলে ওর মতন মেয়ে পৃথিবীতে দুটো মেলে না। এইজন্যে কাশীসুদ্ধু লোক ওর ওপরে চটা। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর মন্ত্রশিষ্যার এহেন বৈষ্ণবজনোচিত ব্যবহার লোকের সহ্য হয় না।

প্রায় এক-নাগাড়ে ঘণ্টা-দেড়েক বকবক ক'রে বাঙাল-মা এবার চুপ করলেন। শীতের রাত্রি, কাশীর গলি একেবারে নিস্তব্ধ—মাঝে মাঝে কাছে দূরে প্যাঁচার কর্কশ চিৎকার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের মুখে কোনও কথা নেই, মাঝে মাঝে পরিতোষ করুণ চোখে আমার ও বাঙাল-মা'র মুখের দিকে চাইছে। বাঙাল-মা এতক্ষণ ধ'রে যা বললেন, তা সবই সত্যি, আমাদের কাছে মিথ্যে বলবার তাঁর কি প্রয়োজন! কিন্তু তবুও, কি জানি কেন, আমার মনে হতে লাগল—এতদিন যা হয়েছে তা হয়েছে, আমার সঙ্গে রাজকুমারী সেরকম ব্যবহার কখনও করবে না। যক্ষ্মারোগে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—এ-কথা সর্বজনবিদিত। তবুও যারই যক্ষ্মা হয়, এমনকি চিকিৎসকেরও যক্ষ্মা হ'লে, সে মনে করে, অন্য সবার বেলা যাই হয়ে থাক্ না কেন, সে বেঁচে যাবে। সে রোগের লক্ষণই তাই।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর আমি বাঙাল-মাকে বললুম, গুরুমা আমাদের বলেছে যে, তোরা আমার কাছ থেকে যেতে পাবি না। আমি তোদের ব্যবসা ক'রে দেব, তোরা এইখানেই থাক্, আমি তোদের ছাড়ব না।

আমার কথা শুনে বাঙাল-মা খানিকটা হি-হি ক'রে হেসে নিয়ে বললেন, দাদু, জ্বর যত বেশি হয়, রুগী তত বেশি ভুল বকে। বিকারের ঘোরে মুখ দিয়ে যত কথা বেরোয়, তা কি বিশ্বাস করতে আছে?

রাত্রি প্রায় দশটার সময় আমরা তেতলা থেকে নীচে নেমে এলুম। নিজেদের ঘরে ঢুকে দেখি, প্রদীপ জ্বলছে আর রসিয়ার মা আমাদের খাটের কাছে ব'সে ঢুলছে। আমরা ঘরে ঢুকতেই রসিয়ার মা চমকে উঠল, তার পর একটু আড়ামোড়া ভেঙে আমাদের কাছে এসে নিম্নস্বরে বললে, তোমরা কাল চ'লে যাচ্ছ তো?

পরিতোষ জিজ্ঞাসা করলে, কেন ?

তোমরা না গেলে তো ও দরজাও খুলবে না, খাবেও না। লোকটা কি শেষে ম'রে যাবে ?

পরিতোষ কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে, রাজকুমারী যাতে শুনতে পায় এমন উচ্চকণ্ঠে বললুম, হ্যাঁ, আমরা কাল সকালে চ'লে যাব। তোমার মনিবকে ব'লো যে, আমরা ভিখিরী নই। সে-ই আমাদের পথ থেকে সেধে ডেকে নিয়ে এসেছিল। ভদ্রলোকের ছেলেদের ডেকে নিয়ে এসে চাকর দিয়ে এমন ক'রে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেবার কোনও দরকার ছিল না, আমাদের বললেই আমরা চ'লে যেতুম।

রসিয়ার মা জবাব দেবার আর কোনও কথা না পেয়ে গজগজ ক'রে কি বকতে বকতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমরা দুজন খাটের ওপরে উবু হয়ে ব'সে ভাবতে লাগলুম। পরিতোষ কি ভাবছিল জানি না, আমার মনের মধ্যে পুঞ্জে পুঞ্জে অভিমানের মেঘ ঘনিয়ে উঠতে লাগল। রাজকুমারীর প্রতিটি কথা, তার প্রতি অঙ্গভঙ্গী, এতদিন ধ'রে এত প্রতিজ্ঞা ও আশ্বাস, থাকবার জন্যে এত অনুনয় ও অনুরোধ, এত ভালবাসা—এ কি সব অভিনয়! তবুও, কেন জানি না, মনে হতে লাগল, এ কখনও হতে পারে না, এ হবে না। এখুনি রাজকুমারী মাঝের দরজা খুলে ঘরের মধ্যে এসে আমাকে বলবে, গোপাল, এ ক'দিন বড় কষ্ট হয়েছে, না? কিন্তু আমার সমস্ত অনুমান ব্যর্থ ক'রে ও-ঘরের ঘড়ি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে যেতে লাগল। শেষকালে পরিতোষ আমাকে ধাক্কা দিয়ে বললে, শুয়ে পড়্, মিছে রাত জেগে কি হবে ?

পরিতোষ শুয়ে পড়ল। আমিও খাট থেকে নেমে প্রদীপটা নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লুম।

শুয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু ঘুম কোথায়! অভিমানক্ষুব্ধ হৃদয় নিঙড়ে নিঙড়ে অশ্রুধারা গ'লে পড়তে লাগল বালিশের ওপর। তবু, আশ্চর্য মানুষের মন! ওরই মধ্যে আশা-কুহকিনী সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করলে—কোনও ভয় নেই, এত বড় বিশাল পৃথিবীর মধ্যে কোথাও কোনও-না-কোনও জায়গায় একদিন-না-একদিন বন্ধুর দেখা পাবেই পাবে, এই ক্ষতবিক্ষত অন্তরের সমস্ত সন্তাপ সে জুড়িয়ে দেবে।

হায়! তার দেখা কি কখনও পাব ?

কাঁদতে কাঁদতে কোন্ সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম তা জানতেও পারি নি। ভোর হতে-না-হতে পরিতোষ ঠেলে তুলে দিলে। মুখ ধুয়ে আমরা নিজেদের কাপড়-চোপড়গুলো পুঁটলি ক'রে বেঁধে নিলুম। রাজকুমারী আমাদের একজোড়া ক'রে ধুতি আর একখানা ক'রে টুইলের শার্ট কিনে দিয়েছিল। সেগুলোকে বিছানার ওপর রেখে দিয়ে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

তখন ভাড়াটেরা অথবা রসিয়ার মা কেউ ঘুম থেকে ওঠে নি। আমরা সোজা চ'লে যাচ্ছিলুম সদর-দরজার দিকে। যেতে যেতে দেখলুম, রাজকুমারীর দরজা তেমনি বন্ধ রয়েছে। চলতে-চলতে হঠাৎ পরিতোষ ফিরে গিয়ে রাজকুমারীর দরজার চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে আমাকে বললে, যাবার আগে একটা প্রণাম ক'রে চল্।

আমি আর আপত্তি না ক'রে হাঁটু গেড়ে রাজকুমারীর ঘরের চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলুম। আমার চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল ঝরঝর ক'রে সেই চৌকাঠের ওপর ঝ'রে পড়ল। তার পরে উঠে নিঃশব্দে সদর-দরজা খুলে দুই বন্ধুতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

আজও কতদিন স্বপ্নে দেখি, রাজকুমারীর দরজা তেমনই বন্ধ রয়েছে আর তার চৌকাঠের ওপর আমার সেই অশ্রুজল টলটল করছে।

রাস্তায় তো বেরিয়ে পড়া গেল, কিন্তু যাই কোথায়? এতদিন পরে অতি দুঃখের দিনের বন্ধু গিরিধারীর কথা মনে পড়ল। দু-তিন ঘণ্টা এদিক-সেদিক ঘুরে বেলা দশটা নাগাদ গিরিধারীর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। শুনলুম, সে বাড়িতে নেই, কে একজন ধনী মক্কেলকে আনতে ভোরবেলাতেই মোগলকা-সরাই চ'লে গিয়েছে, ফিরতে তিনটে-চারটে বেজে যাবে।

সেখান থেকে বেরিয়ে গঙ্গাস্নান ক'রে একটা ময়রার দোকানে ঢুকে কিছু খেয়ে আবার গিরিধারীর বাড়িতে এসে ধুতিগুলো শুকোতে দিয়ে শুয়ে পড়লুম।

বেলা প্রায় চারটে নাগাদ গিরিধারী এসে হাজির হ'ল। সে তো এতদিন পরে আমাদের দেখে একেবারে অবাক! বললে, আমি মনে করলুম, তোরা

কলকাতায় ফিরিয়ে গিয়েছিস ; ভাবলুম কি, ভালোই হ'ল, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়ে গেল।

আমরা গিরিধারীকে রাজকুমারীর কথা বলতেই সে চমকে উঠে বললে, ওরে বাবা! সেটা তো ডাইনী আছে রে! প্রাণ লিয়ে সেখান থেকে ফিরে এসেছিস, তোদের ভাগ্য ভালো আছে। বাবা বিশ্বনাথ রক্ষা করিয়েছেন। জয় বাবা বিশ্বনাথ!

আমরা বললুম, যা হবার তা হয়ে গিয়েছে দাদা, এবার আমাদের একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে দাও।

গিরিধারী বললে, মুন্সী মাধোলালের দপ্তরে তোদের কাজ তো একরকম ঠিকই হয়েছিল সব, তোরাই কোথা গায়েব হোইয়ে গেলি, তো হামি কি করবে বল্?

গিরিধারী আরও বললে, আজই সন্ধ্যের সময় এক বড়লোকের পরিবার-বর্গকে নিয়ে তাকে 'বিন্দ্রাবন' যেতে হচ্ছে। দিল্লী, আগ্রা সফর ক'রে কাশীতে ফিরে আসতে অন্তত পনেরো-বিশ দিন লাগবে।

এ-কথার আর কি উত্তর দেব? হয়তো আমাদের মুখ-চোখের করুণ অবস্থা দেখে গিরিধারীর অন্তরে দয়া হ'ল। সে আশ্বাস দিয়ে বললে, এ-ক'টা দিন কোনরকমে কাটিয়ে দে, কাশীতে ফিরে হামি তোদের একটা-না-একটা ব্যবস্থা করিয়েই দেব, জয় বাবা বিশ্বনাথ!

নিরাশার ঘন অন্ধকারে একটুখানি আশার আলো পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠলুম। তাকে বললুম, পনেরো-বিশ দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে দাদা, আমাদের কাছে যে কয়েকটা টাকা আছে, তাতে একবেলা খেয়ে কোনরকমে কাটিয়ে দেব। শুধু রাতে যাতে এখানে শুতে পারি, তার একটু ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যাও।

আমাদের কথা শুনে গিরিধারী হেসে বললে, এখানে শুবি তার আবার ব্যবস্থা কি করব রে? এ তো তোদের নিজেরই বাড়ি আছে, বেপরোয়া শুয়ে পড়বি।

গিরিধারী তখুনি চ'লে গেল। বাজারে তার কিছু জিনিসপত্র কিনতে হবে। দেখলুম, সে বেশ খুশিই আছে। পুরনো মালদার যজমানের গিন্নী বউ সব এসেছে, তাদের নিয়ে সফর করতে হবে,—নগদে সোনাদানায় বেশ মোটা রকমের কিছু আশা আছে।

আমরা সন্ধ্যাবেলায় বেরিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে বিশ্বনাথের পুজো

দেখে বাজার থেকে কচৌড়ি-পুরি মেরে রাত্রি প্রায় ন'টার সময় গিরিধারীর বাড়িতে ফিরে এলুম। একটা ঠাকুরদালানের মতন জায়গা, থিলেনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে তেরপলের পর্দা দেওয়া—শীত আটকাবার জন্যে। খান দশ-পনেরো দড়ির খাটিয়া প'ড়ে আছে পাশাপাশি, বাকি জায়গাটা ফাঁকা। আমাদের পুঁটুলিটাকে দু-ভাগ ক'রে দুটো বালিশ ক'রে নিয়ে দুজনে দুটো খাটে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়া গেল। কিন্তু ঘুম আর কিছুতেই আসে না। প্রথমত খাটলি একেবারে উপবাসী খট্‌মলে ভরা, তার ওপরে মাসখানেক ধ'রে নিশ্চিন্ত আরামে লেপ-চাপা দিয়ে গদিতে শুয়ে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল খারাপ। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের ঠেলায় বেনের পুঁটুলির মতন গড়াতে আরম্ভ করেছি, এমন সময় হৈ-হৈ ক'রে গিরিধারীদের একজন ছড়িদার বোধ হয় জন-পঞ্চাশেক বেহারী যাত্রী নিয়ে এসে হাজির হ'ল। ছড়িদার আমাদের ঠেলে তুলে দিয়ে বললে, কে তোমরা? বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

বললুম, আমরা গিরিধারী পাণ্ডার যজমান।

কিন্তু ছড়িদার ব্যাটা কোনও কথাই শুনতে চায় না। তার সঙ্গে আরও তিন-চারজন স্ত্রী-পুরুষ মিলে চিৎকার করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। প্রায় আধঘণ্টা-টাক চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি চলবার পর তারা আমাদের একরকম টেনে সেই দালান থেকে উঠোনে নামিয়ে দিয়ে ঝপ্‌ঝপ্‌ ক'রে তেরপলের পর্দাগুলো ফেলে গালগল্প শুরু ক'রে দিলে।

এইটুকু বয়সের মধ্যে আমার জীবনে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতাই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শীতকালের শেষরাত্রে পশ্চিমের মতন জায়গায় একেবারে আচ্ছাদনহীন আকাশের তলায় ব'সে রাত্রিযাপন এই প্রথম। সে যে কি অভিজ্ঞতা, তা শীতকাতর কলিকাতাবাসী ছাড়া অন্যের পক্ষে বোঝা হয়তো কিছু কঠিন হবে। পরিতোষ আমারই মতন শীতকাতর তো ছিলই, তার ওপর সে ছিল অস্বাভাবিক রকমের ঘুমকাতর।

কি আর করব! উঠোনের একধারে মাথা মুড়ি দিয়ে দুজনে থেবড়ে বসলুম। ঠাণ্ডায় একেবারে জ'মে যাওয়ার অবস্থা, ঘণ্টাখানেক সেইভাবে ব'সে থাকতে থাকতে পরিতোষের কানে এমন যন্ত্রণা শুরু হ'ল যে, সে ছোট ছেলের মতন চেঁচিয়ে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলে। ঘরের মধ্যে পঞ্চাশ-ষাট জন স্ত্রী-পুরুষ বাতি জেলে শুয়ে ব'সে তামাক খাচ্ছে আর সশব্দে গল্পগুজব করছে, আর বাইরে দুটো লোক সেই শীতে ব'সে রয়েছে—তাদের মধ্যে

একজন কানের যন্ত্রণায় তারস্বরে চিৎকার করছে, কিন্তু একজনও বাইরে এসে একবারও জিজ্ঞাসা করলে না যে, তোমাদের কি হয়েছে?

যা হোক, কোনরকমে কালরাত্রি প্রভাত হ'ল। গিরিধারীর বাড়ি ছেড়ে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। পরিতোষের কানের যন্ত্রণা একটু কমার সঙ্গে সঙ্গে আমার শুরু হ'ল দাঁতের যন্ত্রণা। রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে এক-জায়গায় একটা চায়ের দোকান দেখে দুজনে দু-কাপ চা খেয়ে আবার ঘুরতে লাগলুম। কোতোয়ালির কাছে একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দোকান দেখে ঢুকে পড়া গেল। ডাক্তার বাঙালী, বয়সও বেশি নয়। আমাদের রোগের অবস্থা ও কারণ শুনে ভেবে-চিন্তে এক ড্রাম ওষুধ দিলেন, দাম দু-আনা। সারাদিনে তিনবার ক'রে খেতে হবে, দুজনের একই ওষুধ।

হোমিওপ্যাথি, তুমি ধন্য! দু-আনার মধ্যে ডাক্তারের ফী ও ওষুধের দাম হয়ে গেল। ওইসঙ্গে পথ্যের ব্যবস্থাটাও যদি ক'রে দিতে পার, তা হ'লে দশ বছরের মধ্যে ভারতের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ ও ইস্কুলকে পাততাড়ি গুটিয়ে Quit India করতে হবে।

এক ফোঁটা ক'রে ওষুধ সেইখানেই খেয়ে আধঘণ্টা-টাক ব'সে থেকে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লুম। হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস না থাকলেও, সত্যি কথা বলতে কি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমার দাঁতের সেই অসহ্য যন্ত্রণা একেবারে ক'মে গেল। পরিতোষও বললে, তার কানের যন্ত্রণা অনেক কম পড়েছে।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি—উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ। রাত্রে কোথায় থাকব ঠিক নেই, ভোজনং যত্র-তত্র তো ক'দিন থেকেই শুরু হয়েছে। অথচ চার-পাঁচ দিন আগেই এইসব রাস্তায় কি নিশ্চিন্ত মনেই ঘুরে বেড়িয়েছি! পুরুষের ভাগ্য ও নারীর চরিত্র যে দেবতাও জানতে পারে না—এ সত্য আমাদের অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু নারীচরিত্রের সঙ্গে পুরুষের ভাগ্য যে কি অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত, সেই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি ক'রে ভাগ্যবিধাতার পায়ে মনে মনে গড় করতে করতে রাজঘাট ইস্টিশানে গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল।

ইস্টিশানে ব'সে ব'সে দুজনে পরামর্শ ক'রে ঠিক করা গেল, গিরিধারী যতদিন না ফিরে আসে, ততদিন কাশীর বাইরে কোনও একটা ছোট শহরে গিয়ে আত্মগোপন করা যাক। সেখানে কোনও ধর্মশালায় একটি ঘরে থাকব, নিজেরাই রান্না ক'রে খাব। পনেরো-বিশ দিনে তাতে পাঁচ টাকার বেশি

খরচ হবে না। বাড়ির গ্যাঁড়া-মারা টাকার দশটি টাকা তখনও অবশিষ্ট ছিল, তার ওপরে জয়া-গিন্নীর কুড়ি টাকা—একুনে ত্রিশটি টাকা তখনও আমাদের হাতে মজুত। এও ঠিক হ'ল, মাস-ছয়েক কোনরকমে কাটাতে পারলে, ততদিনে জয়া-গিন্নী ফিরে আসবে, তখন আর কোনও ভাবনা থাকবে না। বড়লোক না হতে পারলেও সুখে খেয়ে-দেয়ে দুজনে কাশীতে কাটিয়ে দিতে পারা যাবে। এই ঠিক ক'রে কাশীর কাছাকাছি একটা স্টেশনের টিকিট কেটে সেখান থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

বেলা প্রায় বারোটার সময় আমরা এক নতুন জায়গায় এসে পৌছলুম। ছোট্ট জনবিরল শহর, একদিন কিন্তু সে-স্থান জনবহুল ছিল। চওড়া মাটির রাস্তা, দু-পাশে বড় বড় ভাঙা বাড়ি অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। ইস্টিশানের একটু দূরেই প্রকাণ্ড ধর্মশালা, রাজবাড়ির মতন ফটক, বোধ হয় তিন শতাব্দী আগে তৈরি হয়েছিল। অসংখ্য ঘর, তার অধিকাংশই ভাঙা। উঠোনময় দেড়-মানুষ-সমান জঙ্গল হয়ে আছে। ধর্মশালার জীর্ণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে তার রক্ষকের চেহারাও তেমনই। তারা পুরুষানুক্রমে এই ধর্মশালা রক্ষা ক'রে আসছে, বছরে দশ টাকা মাইনে পেয়ে। আমরা পনেরো-বিশ দিন থাকতে চাই শুনে সে দার্শনিকের হাসি হেসে বললে, সারি জিন্দিগী এখানে থাকতে পার, কেউ তোমাদের মানা করবে না। ফটকের পাশেই তার থাকবার ঘরের সঙ্গে লাগা একটা ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললে, এই ঘরে থেকে যাও।

ঘরের মেঝে মাটির। লোকটা দুটো খাটিয়া এনে বললে, মাটিতে শুয়ো না। বিচ্ছুতে কেটে দিলে বড় তকলিফ হবে।

খাটিয়ার ভাড়া কত লাগবে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, যা খুশি দিও, তোমাদের অবস্থা তো আমারই মতন দেখছি।

বাজার থেকে চাল, ডাল, কাঠ, নুন, মসলা, ঘি, পেঁয়াজ, আলু, হাঁড়ি, সরা কিনে নিয়ে এসে খিচুড়ি চড়িয়ে দেওয়া গেল। বোধ হয় সর্বসমেত বারোটা পয়সা খরচ হয়েছিল। চারদিন বাদে চাল-ডাল পেটে পড়ায় মহাপ্রাণী একটু ঠাণ্ডা হলেন। বেলা প্রায় পাঁচটার সময় সেই যে শুয়ে পড়লুম, ঘুম ভাঙল পরদিন সকালবেলায়।

ঘুম থেকে উঠে সরাইয়ের কুয়ো থেকে নিজেরাই জল তুলে স্নান ক'রে এক এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেয়ে ঠিক করলুম, জায়গাটা একটু

ঘুরে ফিরে দেখে দুপুরবেলা ভাত আর মাংস রাঁধা যাবে। আমাদের কাছে তালা ছিল না। কাজেই নিজেদের সম্বল পুঁটুলিটি বগলদাবা ক'রে বেরিয়ে পড়া গেল।

অতি দরিদ্র দেশ। রাস্তার দু-ধারে অধিকাংশ বাড়িই একতলা। মাঝে মাঝে এক-একখানা বড় বাড়ি দেখা যায় বটে, কিন্তু সেগুলির অবস্থা আরও জীর্ণ, 'কোনমতে আছে পরাণ ধরিয়া'। রাস্তায় প্রায় একহাঁটু ক'রে ধুলো, একখানা এক্কা গেলে চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায়। মাঝে মাঝে এক-আধখানা আস্ত বাড়ি দেখা যায় বটে, কিন্তু সে খুবই কম। রাস্তায় ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছে, ধূলিধূসরিত তাদের দেহ, দেখে মনে হয়, সাত জন্মে স্নান করে না, দেহের বসনও তেমনই ময়লা ও শতচ্ছিন্ন। কিন্তু তবুও তারা সুস্থ এবং পুষ্ট।

ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটা চওড়া ও অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার রাস্তায় এসে পৌঁছলুম। পরামর্শ করতে লাগলুম, কাশীতে চাকরি করলেও এখানেই একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে থাকা যাবে। এখানে ভালো খাসীর মাংসের সের চোদ্দ পয়সা। সকালবেলা চার পয়সার জিলিপি খেয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করা গেছে। ধরাতলে এমন স্বর্গও আছে, আমাদের কল্পনার অতীত ছিল।

চলতে চলতে রাস্তার ধারে একজায়গায় দেখলুম, একটা দড়ির খাটিয়ার ওপরে আচিট্ ময়লা একখানা ভিজে ন্যাকড়া পেতে এক অতি বৃদ্ধা তার ওপরে ঘুঁটের মতন বড় বড় বড়ি দিচ্ছে।

দাঁড়িয়ে গেলুম মজা দেখতে। বুড়ীর যেমন চেহারা, তেমনই ময়লা কাপড় আর তার বড়ির রঙও তেমনই ; কিন্তু কি তৃপ্তিদায়ক গন্ধ বেরুচ্ছিল সেই বড়ি থেকে, তা কি বলব! আমরা দাঁড়িয়ে বড়ি-দেওয়া দেখছি আর আমাদের দেশের বড়ির সঙ্গে সেই বড়ির তুলনামূলক সমালোচনা করছি, এমন সময় বৃদ্ধা ঘাড় তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দেখে গজগজ ক'রে কি বকতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

বুড়ী বড়ি দিচ্ছে আর বকবক করছে, আমরা তখনও দাঁড়িয়ে আছি দেখে এবার সে খাটিয়া থেকে নেমে এসে চিৎকার ক'রে আমাদের গালাগালি দিতে আরম্ভ করলে। আমরা তো অবাক। কি হয়েছে, আমরা কি অপরাধ করেছি কিছুই ঠিক করতে না পেরে যতই তাকে প্রশ্ন করি, ততই সে ক্রুদ্ধ হয়ে হাত নেড়ে অঙ্গভঙ্গী ক'রে গালাগালি দিতে থাকে। দেখতে

দেখতে সেই জনবিরল রাস্তায় দু-চারজন লোকও দাঁড়াতে আরম্ভ করলে। কোথা থেকে একপাল ছেলে এসে জুটল। তারা বুড়ীকে কি-একটা কথা বলামাত্র সে তেলে-বেগুনে জ্ব'লে তাদের মারতে ছুটল। বয়স্ক যারা তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের বললে, যাও বাবু, নিজেদের কাজে যাও, ও-মাগীর মাথা খারাপ।

আমরা তো একেবারে হতভম্ব।

এইরকম হাঙ্গামা চলেছে, এমন সময় দূরে হাততালি ও চিৎকার শুনে আমরা ফিরে দেখি, সেখান থেকে একটু দূরে রাস্তার বিপরীত দিকের একটা একতলার ছাদে কতকগুলো লোক ঝুঁকে আমাদের দেখছে আর একজন জোরে হাততালি দিচ্ছে। আমরা তাদের দিকে ফিরতেই সেই লোকটা হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকতে লাগল। আমরা বুড়ীকে ছেড়ে সেই বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। লোকটা ওপর থেকে হেসে-হেসে বললে, কি, বাংগালী তো?

আমরা তো অবাক্। জিজ্ঞাসা করলুম, আমাদের বলছেন?

হাঁ হাঁ, তোমাদেরই বলছি। তোমরা বাংগালী তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তো সোজ্‌হা এই সিড়্‌হি দিয়ে উপ্‌রে চ'লে এস।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখলুম, বাঁ-পাশে একটা মইয়ের মতন খাড়া সিঁড়ি। ওপর থেকে একটা মোটা দড়ি ঝুলছে, সেটার ওপর ভর না করলে ওপরে ওঠা সম্ভব নয়।

সিঁড়ি বেয়ে তো দুজনে কোনরকমে হেলে-দুলে ওপরে ওঠা গেল। একটা বড় ছাদ। রাস্তার ধারের পাঁচিল ঘেঁষে একখানা খাট পাতা, তার ওপরে সুন্দর-কাজ-করা একখানা শতরঞ্চির ওপরে ব'সে রয়েছে সেই ব্যক্তি, যে আমাদের ওপরে আসতে আহ্বান করেছিল। তার মাথায় একটা ছিটের রামপুরী টুপি, যার নাম আজ গান্ধী-টুপি। গায়ে ঢিলে-হাতা মলমলের পাঞ্জাবির ওপরে পট্টুর দিশী ওয়েস্টকোট, বাংলাদেশে যার নাম আজ জওহর-কোট। লুঙ্গি পরা, কিন্তু বাঁ পা-টার প্রায় কুঁচকি অবধি তুলে রাখা হয়েছে। পা-টা এমন শুকনো ও দোমড়ানো যে, দেখে মনে হয়, যেন তার ওপর দিয়ে মিলিটারি লরি চ'লে গিয়েছে—ছুঁচ-সুতো দিয়ে একটা সুতির ফতুয়া সেলাই ক'রে চলেছে বনবন ক'রে। হাত চলার সঙ্গে সঙ্গে অনর্গল ব'কে চলেছে। কথাবার্তার ধরন শুনলেই মনে হয়, বেশ মজলিসী লোক। বাঁ-পাশে মাথা-সমান

উঁচু একটা বাঁশের লাঠি প'ড়ে রয়েছে। শুকিয়ে হরতুকীর মতন চেহারা হয়ে গেলেও তার বয়স ত্রিশের চাইতে বেশি ব'লে মনে হয় না। সে যে একদিন সুপুরুষ ছিল, তার চিহ্নও কিছু অবশিষ্ট রয়েছে সেই চেহারায়। একপাশে এক-রাশ বিড়ি ও একটা দেশলাই। খাটের ওপরে ও নীচে নানা বয়সের বোধ হয় পনেরো-বিশ জন লোক—কেউ ব'সে, কেউ-বা দাঁড়িয়ে।

আমরা ওপরে ওঠবার কিছুক্ষণ পরে একবার আমাদের দিকে বেশ হাসি-হাসি মুখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বিশুদ্ধ বাংলায় সে জিজ্ঞাসা করলে, কি বাবা, ঘর্‌সে ছুট্‌কেছো তো? কোথায় ঘর?

কলকাতায়।

ঘর্‌সে না ছুট্‌কে দুই বন্ধুতে সল্লা ক'রে যদি একটা তেজারৎ করতে তো কত ভালো হ'ত?

এই মন্তব্য প্রকাশ ক'রে উপস্থিত বন্ধুদের উদ্দেশ্যে চোস্ত উর্দুতে সে বললে, এই হচ্ছে বাংগালীর রীত্‌। কিছুতেই খুশি নয়। ঘরে ব'সে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছিল, মাথায় যে কি ভূত সওয়ার হ'ল, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে।

জিজ্ঞাসা করলে, নাম কি?

নাম বললুম। সে বললে, ব'সো, দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাকবে?

আমরা খাটের একপাশে বসলুম। এতক্ষণে চারপাশের লোকদের ভালো ক'রে দেখবার অবসর হ'ল। দেখলুম, দু-একজন হিন্দু ছাড়া সকলেই মুসলমান। যার যখন প্রয়োজন হচ্ছে, সে উঠে এসে একটা বিড়ি ধরিয়ে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসছে।

গল্পগুজব চলেছে। তার কিছু বুঝতে পারছি, কিছু পারছি না। মধ্যে মধ্যে আমাদের সম্বন্ধেও কেউ কেউ মন্তব্য করছে। আমাদের আহ্বানকারী ঘাড় নীচু ক'রে বনবন ক'রে সেলাই ক'রে চলেছে, মাঝে মাঝে মুখ তুলে খানিকটা গড়গড় ক'রে কথা ব'লে আবার ঘাড় নীচু ক'রে সেলাইয়ে মন দিচ্ছে। আমরা চুপ ক'রে ব'সে আছি উজবুগের মতন। এমন সময়ে সেই সোজা সিঁড়ি বেয়ে আসরে একটি ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর মাথায় জরিদার টুপি, কিন্তু সে-জরি প্রায় কালো হয়ে এসেছে। দামী কিন্তু শতচ্ছিন্ন শেরওয়ানী অঙ্গে, তার ওপরে বোধ হয় পাঁচশো বছরের পুরানো একটা পাট-করা জামেয়ার, তার অবস্থাও তেমনই।

লোকটি আসরে উপস্থিত হওয়ামাত্র সকলেই উঠে তাকে কুর্নিশ করলে।

আমাদের আহ্বানকারী তাকে দেখে সেলাম ক'রে বললে, তশ্‌রিফ রাখিয়ে নবাবসাহেব।

তারপরে উর্দুতে দুজনের বাক্যালাপ শুরু হ'ল, তার কিছু বুঝলুম, কিছু বুঝলুম না। নবাবসাহেব বললেন, ছোটেসাহেবের দুশমনের তবিয়ত দিন-বদিন যে খারাপই হতে চলেছে, তা একবার দেহ্‌লীতে গিয়ে হকিমসাহেবকে দেখালে হয় না? বলেন তো, বাবুজীর কাছে প্রস্তাব করি।

ছোটেসাহেব সেলাইয়ের ফোঁড় তুলতে তুলতে মিষ্টি হেসে জবাব দিলে, নবাবসাহেব, আপনার বহুৎ মেহেরবানি, খোদা আপনার মঙ্গল করুন। আপনি আমায় ভালবাসেন, তাই এমন প্রস্তাব করছেন, কিন্তু মালাকুল-মওৎ যাকে টেনেছে, কোনও আদমজাদের সাধ্য নেই যে তাকে রক্ষা করে।

ছাদসুদ্ধ লোক সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, খোদা না করে, খোদা না করে ছোটেসাহেব, অ্যায়সা না কহিয়ে—

নবাবসাহেব ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন, তাপ আজকাল কত ডিকৃরি উঠছে?

ছোটেসাহেব উদাসভাবে বললেন, বগলে আর বাত্তি নিই না। সারাদিনই জ্বর থাকে, সন্ধ্যেবেলা খুব বাড়ে, পরমাত্মার নাম করতে করতে শুয়ে পড়ি।

মিনিট দশ-পনেরো আদর-আপ্যায়নের পর নবাবসাহেব বিদায় নিলেন। যতক্ষণ তিনি ছিলেন, ততক্ষণ অন্য লোকগুলো সব চুপ ক'রে ছিল। তিনি চ'লে যেতেই আবার সকলে সমস্বরে কথা বলতে শুরু ক'রে দিলে। তারপরে বিড়ির তাড়া শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একে একে সকলে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।

সকলে চ'লে যাওয়ার পর লোকটি আমাদের বললে, তো শর্মাজী, রায়-সাহেব, কি মতলোব? আমাদের বাড়িতে থাকবে?

বললুম, আপনি দয়া ক'রে আশ্রয় দিলেই থাকব।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, আরে, দয়া কিসের! কে কার ওপর দয়া করতে পারে ভাইয়া? আমাদের বাড়িতে কত বাংগালীর ছেলে এসে থাকল। দু-পাঁচ বছর রইল, তাদের ওপরে মায়া প'ড়ে গেল, তারপর একটু সুবিধা কোথাও বুঝলে বা বড়েসাহেব—আমার বড়ভাই কিছু গালিমন্দ করিলে কি, আর স'রে পড়ল। বলছি, তোমরা সেরকম স'রে পড়বে না তো?

পরিতোষ বললে, আমাদের তাড়িয়ে না দিলে কেন চ'লে যাব?

লোকটি আবার হেসে বললে, হামি কিংবা বহেন্‌জী অর্থাৎ দিদিমণি

তোমাদের কখনও চ'লে যেতে বলব না। আরে, বহেন্‌জীর পাল্লায় পড়লে তো তোমাদের একেবারে জেহেলখানা হয়ে গেল। আর বাবুজী তো দেবতা, সে কখনও কোনও চাকরকেই কিছু বলে না, তো তোমরা মেহমান আছ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর সে বললে, আমি তো ভাই, মরীজ আছি, সকালবেলা বিছানা থেকে উঠে এখানে এসে বসি, সারাদিন এমনই কেটে যায়, সন্ধ্যেবেলা নিজেদের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আপনার কি অসুখ ?

একটু ম্লান হেসে বাঁ পা-টা দেখিয়ে দিয়ে সে বললে, এই পায়ের হাড়ে দিক্‌ হয়েছে।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। জিজ্ঞাসা করলুম, দিক্‌ কি ?

ছোটেসাহেব কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বললে, আরে যক্ষ্মা—যক্ষ্মা।

কথাটা যেন কিরকম লাগল। হাড়ে যক্ষ্মা, মাথায় কলেরা, জিভে অর্শ বা হাতে উরুস্তম্ভ—এইসব অসামাজিক ব্যামোর রেওয়াজ আমাদের ছেলেবেলায় চলতি ছিল না। বললুম, হাড়ে আবার যক্ষ্মা হয় নাকি ?

ছোটেসাহেব বললে, বাবুজী বলেছেন। বাবুজী বড় ডাক্তার, তোমরা ছেলেমানুষ, কিছুই জান না। সারাদিন যন্ত্রণার শেষ নেই, জ্বর লেগেই আছে। সন্‌ঝের সময় তাপ বাড়তে থাকে, সে-সময়ে কেউ কাছে থাকে না। দিদিমণি তো সারা দিন ও রাত বাড়ির কাজ নিয়েই আছে। তবু বেচারা রোজ সে-সময় এসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। তোমরা থাকলে সে-সময় একটু কাছে ব'সে গল্পসল্প করলে ভালো লাগবে।

ছোটেসাহেবের কথার কি জবাব দোব তাই ভাবছি, এমন সময় একটা কাঁসার গেলাস হাতে নিয়ে ওই-দেশীয়া এক বৃদ্ধা ছাতে এসে হাজির হ'ল। বৃদ্ধা একটু এগিয়ে এসে তার নিজের ভাষায় বললে, কি রে ছোটে! কেমন আছিস ?

ছোটেসাহেব কোনও কথা না ব'লে সেলাই থামিয়ে তার হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে এক ঢোঁকে সবটা খেয়ে গেলাসটা আবার তার হাতে ফিরিয়ে দিলে। বৃদ্ধা গেলাসটা খাটের পায়ার কাছে রেখে সেই ময়লা পায়েই বিছানায় উঠে ব'সে ছোটেসাহেবের পিঠে আস্তে-আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে শুরু ক'রে কি আওড়াতে লাগল, আর ছোটেসাহেব ক্ষিপ্রহস্তে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলতে থাকল।

কিছুক্ষণ এইভাবে নিঃশব্দে কাটবার পর বৃদ্ধা বললে, দিন ও রাত কি সেলাই করিস বল্ দিকিন! তোর বাপ কি তোকে জামা তৈরি ক'রে দেয় না, না, তার পয়সার অভাব আছে?

ছোটেসাহেব হেসে হেসে জবাব দিলে, আহিয়া, আমি মরলে এই জামাটা পরিয়ে শ্মশানে পাঠিয়ে দিস। খবরদার, বাজারের কেনা জামা-টামা দিস নি যেন।

দেখতে দেখতে বৃদ্ধার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল, তারপরে নিঃশব্দে তার দুই তোবড়ানো গাল বেয়ে চোখের জল ঝ'রে পড়তে লাগল। ছোটেসাহেব সে দৃশ্য দেখতে পেলে না, কারণ বৃদ্ধা ব'সে ছিল তার পিঠের কাছে।

সেলাইয়ের আরও কয়েকটা ফোঁড় দিয়ে ছোটেসাহেব আমাদের বাংলায় বললে, এই যে মেয়েমানুষটা দেখছ, এ আমাদের ভাই বোন সবাইকে মানুষ করেছে। এ আমাকে মায়ের চাইতে বেশি ভালবাসে।

এতক্ষণে বৃদ্ধা আমাদের দিকে ফিরে ভালো ক'রে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, কারা এরা?

ছোটেসাহেব হাসতে হাসতে বললে, আরে, দেখে বুঝতে পারছিস না, এরা বাড়ি থেকে ভেগেছে। এই রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে দেখে, ডেকে নিয়ে এসেছি। এরা এখানেই থাকবে।

বৃদ্ধা কিছুই মন্তব্য করলে না। ছোটেসাহেব আরও কিছুক্ষণ সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে বললে, আহিয়া, এদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ভালো ঘরের ছেলে এরা, এরা পালাবে না।

বৃদ্ধা এবার নিজের মনে খানিকক্ষণ কি গজগজ ক'রে ব'কে বললে, আরে দুর, তুইও না যেমন, ও কারুকে বিশ্বাস নেই। লল্‌হিত ও সুদনের মতন ছেলে ক'টা হয়?

ছোটেসাহেব সেলাই বন্ধ ক'রে বললে, যা বলেছিস আহিয়া! লল্‌হিত আর সুদনের মতন ছেলে আর হয় না। জানো রায়সাহেব, শর্মাজী, শুনো। বাবুজী তখন সরকারী চাকরি থেকে পেন্‌সিন নিয়ে বাঁন্‌স্ বেরিলিতে চাকরি নিয়েছেন। আমার উমর তখন দশ কি বারো, একদিন বাবুজীর সঙ্গে বাজারে জামা কিনতে বেরিয়েছি, দেখি দুটো বাংগালীর ছেলে, একেবারে নাদান্, আমারই হাম-উমর্ হবে, বিমর্ষ হয়ে রাস্তার ধারে ব'সে রয়েছে। বেরিলিতে যত বাংগালীর ঘর আছে তাদের সবাই আমাদের চেনা, এরা তাদের কেউ

নয়। বাবুজী জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের বাড়ি কোথায়? তারা কাঁদতে কাঁদতে ব'লে ফেললে যে, তারা ঘর্‌সে ভেগে পচ্ছিম চ'লে এসে এখন মুশকিলে ফেঁসে গেছে। সাবাস বাংগালী, দশ বছরের ছেলে বাবা ঘর্‌সে ভেগেছে! বাবুজী তাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়িতে নিয়ে এসে একেবারে আমার মায়ের জিম্মে ক'রে দিলে।

সেই থেকে তারা আমাদের ঘরেরই ছেলে হয়ে গেল, আর বাড়ি ফিরলে না। একই-বয়সী কিনা, তাই আমার সঙ্গে তাদের এমন ভাব হয়ে গেল যে, লোকে মনে করত, আমরা বুঝি সব মায়ের পেটের ভাই। আমার মায়ের তো লল্‌হিত ছাড়া এক লম্‌হাও চলত না। বহেন্‌জী তখন ছিল শ্বশুরাল, আমার বড়েভাই বিয়ে করে নি, মা'র সেবা করবার কেউ নেই। লল্‌হিত মা'র খুব সেবা করত। রোজ সন্‌ঝের সময় দু-ঘণ্টা ক'রে মা'র গোড় দাবানো, এখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া, লল্‌হিত ছাড়া মা'র আর একদণ্ডও চলে না।

এইরকম প্রায় দশ বছর কেটে যাওয়ার পর সেবারে বেরিলিতে ভারি চেচক্ শুরু হয়ে গেল। কোথা থেকে লল্‌হিত বেচারা চেচক্ নিয়ে এল। বাবুজী শহরের সেরা সেরা ডাক্তার দেখালে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। বেচারার চোখ-দুটো আগেই নষ্ট হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, মা, আমার চোখই যখন নষ্ট হয়ে গেল, তখন আর বেঁচে লাভ কি? মা তাকে বোঝাতে লাগল, যতক্ষণ আমার চোখ আছে বেটা, ততক্ষণ তোর ভাবনা কি? আমি গেলে ছোট্‌কা রইল, স্থদন রইল, তারা তোকে দেখবে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। দু-মাস ভুগে লল্‌হিত বেচারা চ'লে গেল, আমার মায়ের কোলেই মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমার মা তো বেহোঁশ হয়ে সেই মুর্দা জড়িয়ে ধ'রে প'ড়ে রইল, শেষকালে বাবুজী এসে তাকে ছাড়িয়ে নিলে। মা যে সেই পাশ ফিরলে সাতদিন আর উঠল না। শেষকালে আমার এই আহিয়া, এই মেয়েমানুষটা, তাকে তুলে নাওয়ালে খাওয়ালে।

এতখানি এক-নাগাড়ে ব'লে ছোটেসাহেব একটু দম নিয়ে বৃদ্ধার উদ্দেশ্যে বললে, আহিয়া, তুম্‌হে ইয়াদ্ হয় উও সব বাতেঁ?

আহিয়া গজগজ ক'রে কি বললে, বুঝতে পারলুম না।

পরিতোষ জিজ্ঞাসা করলে, স্থদন কোথায়?

ছোটেসাহেব সেলাই থামিয়ে তার দিকে চেয়ে বলতে আরম্ভ করলে,

আরে ভাইয়া, তার আসল নাম হচ্ছে মদ্‌সূদন। আমার মা তাকে 'সূদন' ব'লে ডাকত। সেই থেকে মদ্‌সূদন সূদন হয়ে গেছে। লল্‌হিত মারা যাবার পর বাবুজী সূদনের চাকরি ক'রে দিলেন মিউনিসিপ্যালিটিতে, বাইশ টাকা মাইনেয়। সে বেচারী মাইনের সব টাকা এনে আমার মায়ের হাতে দিত। এইরকম বছরখানেক যেতে-না-যেতেই লল্‌হিত আমার মাকেও টেনে নিলে। মাও ওই চেচকেই ম'রে গেল।

এতক্ষণে ছোটেসাহেবের কণ্ঠে একটু যেন অশ্রুর আমেজ পাওয়া যেতে লাগল। সে ব'লে চলল, মা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাবুজী ওখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কাশীতে চ'লে এলেন। সূদন ওইখানেই র'য়ে গেল, আজ সে আশি টাকা তন্‌খোয়া পায়। সূদন বেচারা বড় ভালো। আগে পুজো ও বড়দিনের ছুটিতে দু'বার ক'রে বাড়ি আসত, কিন্তু আমার অসুখ বাড়বার খবর পেয়ে আজকাল দু-তিন মাস অন্তরই একবার-দু'বার ক'রে এসে আমাকে দেখে যায়। সে তো চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে চ'লে আসতে চায়, কিন্তু বাবুজী আর দিদিমণি তাকে চাকরি ছাড়তে দেয় না। সূদন যতদিন এখানে থাকে, ততদিন বেশ ফুর্তিতেই দিন কাটে, এই তো দিন-পনেরো আগে সে গেছে।

ছোটেসাহেব আবার কিছুক্ষণের জন্যে চুপ ক'রে বোঁ-বোঁ ক'রে সেলাই ক'রে যেতে লাগল। তারপর হঠাৎ একবার মুখ তুলে বললে, আমি এবার সূদনকে ব'লে দিয়েছি, ভাইয়া, এবারে লল্‌হিত আমাকেও টেনেছে, কবে নিয়ে যাবে সেই আশায় ব'সে আছি। আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।

দেখতে দেখতে ছোটেসাহেবের চোখ-দুটো জলে ভ'রে উঠল ; কিন্তু বেশ বুঝতে পারলুম যে, সেই দুর্বলতাকে দমন করবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। হঠাৎ ছোটেসাহেব ঘাড় নীচু ক'রে আবার সেলাইয়ে মন দিলে।

মানুষের জীবনে অথবা মানুষের মনে প্রেম ও শোক—এই দুটি অনুভূতিই প্রধান। প্রেমের মতন শোকও অজানা-অপরিচিতকে আপনার করে, দূরকে নিকটে টেনে নিয়ে আসে, অনাত্মীয়কে পরমাত্মীয় ক'রে তোলে। শোকাশ্রুই পলাতকা অতীতকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে বর্তমানের বাহুবন্ধনে। আজ সকালে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম ক'রে যখন উঠে বসেছিলুম, তখন এই পরিবারের সুখদুঃখ তো দূরের কথা, তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানই আমার ছিল না। এই মৃত্যুপথযাত্রী পঙ্গু যুবকের মুখের কয়েকটি কথা

আর ওই বৃদ্ধার কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল তাদের সঙ্গে আমাদের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে ফেললে। কে কোথাকার লল্‌হিত আর সুদন, যাদের কখনও চোখেও দেখি নি, তারা হয়ে উঠল আমাদের জীবনবন্ধু। চোখের সামনে যেন দেখতে লাগলুম, আমাদেরই মতন দুটি অসহায় বালক পথের ধারে বিষণ্ণ মুখে ব'সে আছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ভবিষ্যতের অন্নবস্ত্রের চিন্তায় যখন তারা দিশাহারা, সেই সময় অতি অপ্রত্যাশিতভাবে দেবদূতের মতন এসে এই সংসারের কর্তা তাদের তুলে নিয়ে এলেন নিজের গৃহে, সেই থেকে এই গৃহই তাদের আপন হয়ে গেল। এদের দুঃখসুখের সঙ্গেই তাদের জীবনসূত্র জড়িয়ে গেল চিরদিনের জন্যে।

বেলা বেড়েই চলল। আমরা দুটিতে চুপ ক'রে ব'সে আছি আর ভাবছি, লোকটা যে থাকতে বললে, কিন্তু সে-সম্বন্ধে আর কোন কথাই বলছে না তো! বুড়ীও কোন কথা কয় না। সেও কলের মতন ছোটেসাহেবের পিঠে হাত বুলিয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে ঢুলে তার মাথাটা ছোটেসাহেবের পিঠে গিয়ে ঠেকছে; কিন্তু সে নির্বিকার, বোঁ-বোঁ ক'রে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে চলেছে, মাঝে মাঝে ছুঁচের গর্তে সুতো ভ'রে নিয়ে আবার সেলাই শুরু করছে।

বোধ হয় ঘণ্টা-খানেক এইভাবে চুপচাপ কাটবার পর ছোটেসাহেব বুড়ীর দিকে ফিরে তার কানে কানে কি বললে, শুনতে পেলুম না।

বৃদ্ধা ধীরে-সুস্থে খাট থেকে নেমে গেলাসটা তুলে নিয়ে বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কি নিয়ে গজগজ করতে করতে নীচে নেমে গেল।

ছোটেসাহেব আমাদের সঙ্গে গল্প করতে লাগল, তার বাবার কাশীতে মস্ত ডিস্‌পেন্‌সারি, ওখানকার যত রইস আছে প্রায় সবার বাড়িরই তিনি গৃহ-চিকিৎসক, কাশী-নরেশের বাড়ি থেকেও তাঁর ডাক আসে। সব জায়গা থেকেই মাসোহারা পান, এতেই তাঁর প্রায় পাঁচশো টাকা আমদানি আছে, এ ছাড়া কাশীর সিক্‌রোলে বড় বাড়ি আছে, নীচে বড় দাওয়াখানা, সকাল-সন্ধ্যেয় প্রায় দু-তিন-শো রুগী আসে, তাদের ওষুধ বিক্রি ক'রেও দৈনিক প্রায় শতখানেক টাকা রোজগার আছে। সে ব্যবসা বড়েভাই দেখে; বাবুজী তা থেকে কিছুই পায় না, সে-ই সব মেরে দেয়। মাঝে মাঝে বহেন্‌জী হাঙ্গামা-হুজ্জৎ ক'রে তার কাছ থেকে সংসার-খরচ বাবদ দু-পাঁচ-শো টাকা আদায় ক'রে নেয়। আমার ভাইটা হচ্ছে বদমাইশ। সব টাকা মাগী, ইয়ার আর সরাবেই ফুঁকে দেয়। বাবুজী একেবারে শিবের মতন, সে তো কিছু বলে না; কিন্তু বহেন্‌জী হচ্ছেন

একেবারে পহ্‌লোয়ান, বড়েভাইয়ের মতন দশটা মরদকে সে গায়ের জোরেই ঠাণ্ডা ক'রে দিতে পারে। দাওয়াখানার হিসাবপত্তর সব বহেন্‌জী দেখে, এই নিয়ে হর্‌হপ্তা ঘরে ভাইবোনে খুনোখুনি চলতে থাকে।

কিছুক্ষণ আবার সেলাই-ফোঁড়াই চলবার পর ছোটেসাহেব মুখ তুলে বললেন, বহেন্‌জীর নিজের টাকার অভাব নেই, সে আমার জন্যেই—ভাইয়ার সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করে। বেচারা তো জানে না যে, আমার দিন খতম হয়ে এসেছে।

এবার আমি বললুম, আপনি বৃথাই ভয় পাচ্ছেন। আপনি ঠিক সেরে উঠবেন।

ছোটেসাহেব একটু হেসে সেলাইটা একপাশে রেখে ডান পায়ের আচ্ছাদনটা তুলে বললেন, এ পা-টা দেখছ?

তারপরে বাঁ পা-টা দেখিয়ে বললে, এই পা-টাও এমনিই ছিল, এখন দুটোতে তফাত দেখ।

দেখলুম, দুটো পায়ে আকাশ-পাতাল তফাত হয়ে গিয়েছে, তবুও তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম এ পা-টাও সারবে, তবে পা-টা পঙ্গু হয়ে যাবে।

ছোটেসাহেব হেসে সেলাইটা তুলে নিয়ে বললে, শর্মাজী, তোমরা ছেলেমানুষ। আমার চাইতে কম আজ্‌ কম দশ-পনেরো বছরের ছোট হবে, তোমরা কি জান?

আমাদের কথাবার্তা চলেছে, এমন সময় একটা লোক দু-হাতে দু-থালা জলখাবার নিয়ে এসে আমাদের সামনে রেখে দিয়ে চ'লে গেল। ছোটেসাহেব বললে, নাও রায়সাহেব, শর্মাজী, কিছু জল খেয়ে নাও। এ-বেলা তো ভাত-টাত কিছুই হ'ল না।

বিশেষ অনুরোধ আর করতে হ'ল না। বেলা তখন দ্বিপ্রহর—ক্ষুধাও বেশ চন্‌চনে হয়েছিল। দেখতে-না-দেখতে থালা সাফ হয়ে গেল। যে লোকটা খাবার দিয়ে গিয়েছিল, সে-ই একটা গেলাস ও একটা জল-ভরা ঘটি নিয়ে এসে আমাদের জল খাইয়ে গেল।

একটু পরে ছোটেসাহেব আমাদের বললে, কি, বিড়ি-টিড়ি ফোঁকা অভ্যেস আছে নাকি?

বললুম, অভ্যেস না থাকলেও মাঝে মাঝে ফুঁকে থাকি, আপত্তি কিছুই নেই।

আমাদের কথা শুনে সে কিছুক্ষণ পেছনের তাকিয়ার ওপর শুয়ে নির্বিকার

হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। তারপরে উঠে পাশের সেই লম্বা বাঁশের লাঠিটার ওপর ভর ক'রে দাঁড়াল। দেখলুম, তার সেই পঙ্গু দোমড়ানো পা-খানা জমি থেকে বোধ হয় হাতখানেক উঁচুতে নড়বড় ক'রে ঝুলতে লাগল। ডান হাত দিয়ে সেই পা-খানা লাঠির চারিদিকে এক-ফের কি দু-ফের জড়িয়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে নেংচে নেংচে ছাদের এক কোণের ঘেরা বারান্দা দিয়ে বোধ হয় বাড়ির ভেতরে চ'লে গেল। কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর পরিতোষ বললে, সরাইওয়ালাকে যে মাংস কেনবার জন্যে পয়সা দিয়ে আসা গেল, তার কি হবে ?

দেখা যাক কি হয়! বরাতে মাংস খাওয়া আজ নেই ব'লেই তো মনে হচ্ছে।

কথাবার্তা চলছে, এমন সময় ছোটেসাহেব সেইরকম লাঠির ওপরে ভর দিয়ে করুণ কাতরধ্বনি করতে করতে ফিরে এল, হাতে তার এক বাণ্ডিল বিড়ি।

বিড়ির বাণ্ডিলটা আমার হাতে দিয়ে বললে, নাও শর্মাজী, পিও।

তারপর তেমনই কাতরাতে কাতরাতে খাটের ওপর গিয়ে ব'সে পড়ল। আমরা দু'জনে দুটো বিড়ি ধরিয়ে মোক্ষম টান মেরে কাশতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। ছোটেসাহেব আমাদের দিকে চেয়ে সহাস্যবদনে বললে, কি, খুব কড়া বুঝি ?

কাশতে-কাশতেই বললুম, না, অনেকদিন টানি নি কিনা, তাই কাশি হচ্ছে।

বাণ্ডিলটা তোমাদের কাছে রেখে দাও, ফুরিয়ে গেলে আমাকে ব'লো।

এই ব'লে সে তাকিয়ায় হেলান দিলে। কিছুক্ষণ সেইভাবে থেকে বললে, শর্মাজী, একটু লেট্‌ছি ভাই, কিছু মনে ক'রো না, এই মিনিট পাঁচেক, চ'লে যেয়ো না যেন।

বললুম, না না, মনে করব কি! আপনি নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ুন।

ছোটেসাহেব বালিশে মাথা দিয়ে চোখ বুজে ফেললে। আমরা দুটিতে ব'সে ব'সে বিড়ি ফুঁকতে লাগলুম। অনেকদিন পরে ধোঁয়ার আস্বাদ পেয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বোধ হয় গোটা-পঁচিশেক বিড়ি শেষ ক'রে ফেললুম। বিড়ি ফুঁকছি আর অদৃষ্ট এবার আমাদের কি নতুন প্যাঁচ মারলে তারই গবেষণা চলেছে। দেখতে দেখতে ছাতের একপাশ থেকে রোদ গড়াতে গড়াতে রাস্তায় নেমে পড়ল। ছোটেসাহেব তেমনই প'ড়ে আছে খাটের ওপরে—চোখ বুজে একপাশ ফিরে কুঁকড়ে-শুঁকড়ে। একবার উঠে গিয়ে তার কপালে

হাত দিয়ে দেখলুম, আগুন গরম—বোধ হয় একশো চার ডিগ্রী জ্বর হবে। কপালে হাত দেওয়া-মাত্র ধরা গলায় সে বললে, আহিয়া!

হাত সরিয়ে নিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসলুম। কি করব তাই পরামর্শ করতে লাগলুম।

পরিতোষ বললে, চল্, সরাইয়ে ফিরে যাই।

কিন্তু ভদ্রলোক বার বার অনুরোধ ও মিনতি ক'রে বলেছে তার কাছে থাকবার জন্যে। এইসব আলোচনা চলছে, এমন সময় ও-বেলাকার সেই বৃদ্ধা আবার একটা গেলাস হাতে নিয়ে ছাতে এসে উপস্থিত হ'ল।

বৃদ্ধা খাটের কাছে গিয়ে বেশ উচ্চস্বরে হাঁক ছাড়লে, আরে ছোটে!

ছোটেসাহেব চমকে চোখ চেয়ে বললে, আহিয়া, আয়ি তুম্?

তার পরে কঁ্যাকাতে কঁ্যাকাতে উঠে ব'সে বৃদ্ধার হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে এক চুমুকে সেটা নিঃশেষ ক'রে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললে, শঙ্কর আর ভরতকে পাঠিয়ে দে, আমাকে ঘরে নিয়ে যাবে।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলে, তাপ এসেছে বুঝি?

ছোটেসাহেব চোখ বুজেই বললে, ওঃ, বড়ি তক্লিফ!

বৃদ্ধা সিঁড়ির দরজার দিকে অগ্রসর হ'ল। ছোটেসাহেব তাকে ডাক দিলে, আহিয়া, শুন্।

বৃদ্ধা কাছে আসতে সে আমাদের দেখিয়ে বললে, এদের কথা বহেন্‌কে বলেছিস? সারাদিন যে এদের খাওয়া-দাওয়া হ'ল না, সেই সকাল থেকে ব'সে আছে বেচারারা—

ছোটেসাহেবের কথা শুনে বুড়ী একেবারে চিৎকার ক'রে উঠল, হায় রামা! আমাকে কি তুই কিছু বলেছিস? সে মাগী শুনলে তো আমার জান খেয়ে ফেলবে। বলবে, মেহ্‌মানদের এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছিস! হায় রামা! অনেক তো দেখালি, আর কেন, এবার আমাকে টেনে নে।—বলতে বলতে বুড়ী দেওয়ালে ঢকাঢক ক'রে মাথা কুটতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

বুড়ী আরও হাঙ্গামা লাগাবার উপক্রম করছিল, এমন সময় ছোটেসাহেব চেঁচিয়ে উঠল, হারামজাদী—নিগোড়ে! আমাকে না খেয়ে কি তুই মরবি? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তো শেষ ক'রে এনেছিস। যে ক'টা দিন আছি, একটু শান্তি দে।

কথাগুলো শুনে বুড়ী একেবারে চুপ হয়ে গেল। ছোটেসাহেব বললেন, যা, বহেন্‌জীকে বল্‌গে যা, আমি ব'লে দেব, সে কিচ্ছু বলবে না তোকে।

বুড়ী আর কোন কথা না ব'লে কাঁপতে কাঁপতে নীচে নেমে গেল। ছোটে-সাহেব আমাদের দিকে ফিরলে, দেখলুম, তার চোখ-দুটো রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে। একটুখানি হাসবার চেষ্টা ক'রে সে বললে, আজকের তাপটা খুবই চড়েছে ব'লে মনে হচ্ছে। একটুখানি লেট্‌ব মনে ক'রে একেবারে শুয়ে পড়েছিলুম, কিছু মনে ক'রো না ভাই, তোমাদের বড় তক্‌লিফ হ'ল। কাল থেকে আর এমন হবে না।

আমি বললুম না না, আমাদের কোনও তক্‌লিফ হয় নি। আপনি কেন এসব কথা বলছেন?

ছোটেসাহেব বললে, না ভাই, তোমাদের রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে এসে এখানে বসিয়ে আমি শুয়ে পড়লুম! কি বলব, আমায় মাপ ক'রো ভাইয়া, বড় কসুর হয়ে গেল আমার।

এতদিন পরে এই জাতক লেখার তাড়নায় সেই সুপ্ত স্মৃতিকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে জাগিয়ে তুলছি আর মনে হচ্ছে, সেদিনের সঙ্গে আজকের দিনের কত তফাত হয়ে গিয়েছে! আজ ভারতবাসী পূর্ণস্বাধীনতা-প্রয়াসী, অর্থে সামর্থ্যে আজ তারা অনেক উন্নত, অনেক সমৃদ্ধ। কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার—সেদিক দিয়ে যে তারা কত দরিদ্র হয়ে পড়েছে, তা আমার মতো অভিজ্ঞতা যার আছে, সে-ই জানে।

ছোটেসাহেবের কথা শুনে আমাদের চোখে জল এসে গেল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তাকে বললুম, আপনি আমাদের এত উপকার করলেন আর আপনার নামটি পর্যন্ত আমরা জানতে পারলুম না!

ছোটেসাহেব বললে, আরে, আমার নাম বিশ্বনাথ বন্দ্যোউপাধ্যায়, আমার ভাইয়ের নাম শ্রীঅমরনাথ বন্দ্যোউপাধ্যায়। আমাদের ঠাকুরের নাম ডাক্তার শিবনাথ বন্দ্যোউপাধ্যায়। তোমরা আমার ছোটভাইয়ের মতন। আমাকে বিশুদা ব'লে ডেকো।

এতখানি ব'লেই সে আবার বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজে ফেললে।

ব'সে আছি তো ব'সেই আছি। দেখতে দেখতে রোদ প'ড়ে যেতে লাগল। ব্যাপারটা রাজকুমারীর বাড়ির চেয়েও রহস্যজনক হয়ে উঠছে দেখে আমরা ঠিক করলুম, আর কিছুক্ষণ দেখে আস্তে আস্তে নেমে চ'লে যাব। এমন সময় দুজন ষণ্ডা-ষণ্ডা চাকর ছাতে এসে উপস্থিত হ'ল। ছোটেসাহেব চোখ বুজে অজ্ঞানের মতন প'ড়ে ছিল, তাদের সাড়া পেয়ে সে চোখ চেয়ে বিজ্‌বিজ্‌ ক'রে

কি বললে। তারপর তারা তাকে চ্যাংদোলা ক'রে তুলে নিয়ে চ'লে গেল। যাবার সময় ছোটেসাহেব বললে, আমি ঘরে শুতে যাচ্ছি, তোমরা চ'লে যেয়ো না যেন।

বিশুদা চ'লে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ কেটে গেল। আমরা উঠি-উঠি করছি, এমন সময় আহিয়া এসে বললে, চল, তোমাদের ভেতরে ডাকছে।

আবার সেই মইয়ের মতন সোজা সিঁড়ি বেয়ে নেমে একটা সরু গলিপথ দিয়ে আমরা বাড়ির ভেতরে চললুম। প্রকাণ্ড একটা উঠোন, উঠোনের এক কোণে তিনটে মুলতানী গাই বাঁধা রয়েছে—এমন সুন্দর গরু কলকাতার লোকের চোখে কমই পড়ে। সেই উঠোন পেরিয়ে আবার একটা আধা-অন্ধকার লম্বা গলিপথ পার হয়ে দালান। সেই দালানের এক কোণ দিয়ে সিঁড়ি। অপেক্ষাকৃত চওড়া হ'লেও প্রায় সেই মইয়ের মতন সোজা। সেই সিঁড়ি প্রায় হামাগুড়ি মেরে অতিক্রম ক'রে ওপরে একটা বড় দালানে পৌঁছলুম। দালানের গায়ে একসারে পাশাপাশি তিন-চারটে ঘর। বৃদ্ধা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে আমাদের বললে, এই যে, এদিকে এস। আমরা—আমি আগে আর পেছনে পুঁটুলি-বগলে পরিতোষ—অতি সঙ্কোচের সঙ্গে পা পা ক'রে সেই ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখলুম, ঘরের মধ্যিখানে আমাদের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে একটি নারী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সদ্যোস্নাতা, মাথার মাঝখানে চূড়োর মতন উঁচু ক'রে চুল বাঁধা। একখানা ধপধপে সাদা পাতলা ফিন্‌ফিনে থান পরা। তার ভেতর দিয়ে দেহের প্রায় সবই দেখা যাচ্ছে। বয়স কুড়ি থেকে ত্রিশের কোনও একটা জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। দেহলতা, দাঁড়াবার ভঙ্গী, চোখের দৃষ্টি ও মাথার সেই চূড়ো মিলিয়ে একটি নিষ্কম্প দীপশিখার সঙ্গে তার তুলনা করা চলে। বার-বাড়ির সেই পঙ্গু, ভগ্নস্বাস্থ্য যুবকের যেন এটা উল্‌টো পিঠ। এরকম উদ্ধত যৌবনশ্রী এর আগে আর আমার চোখে পড়ে নি।

মিনিট-খানেক আমাদের দিকে সেইভাবে চেয়ে থেকে তিনি বললেন, খুব কষ্ট হয়েছে তো ? ছোট্‌কার কোনও আক্কেল নেই। সারাদিন নিজের কাছে বসিয়ে রেখে গাল-গল্প করলে আর বাড়ির ভেতর একটা খবর পর্যন্ত পাঠালে না ! সারাটা দিন খাওয়া হয় নি তো ?

আমি বললুম, না, আমাদের কষ্ট কিছুই হয় নি। সকালবেলা খেয়েই বেরিয়েছিলুম। দুপুরে তো আপনি খাবার পাঠিয়েছিলেন, তাই খেয়েছি।

জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি?

নাম বললুম। পরিতোষের নাম শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জাত?

পরিতোষ বললে, আমরা কায়স্থ।

তিনি বললেন, আমাদের সুদনও কায়স্থ। তোমাদের সঙ্গে কিছুই নেই বোধ হয়?

তারপরে মৃদু হেসে বললেন, পালাবার সময় কে আর জিনিসপত্র নিয়ে পালায়! কি বল?

পরিতোষটা এতক্ষণ আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। স্ত্রীলোকের সামনে এলে অতিশয় লজ্জিত হয়ে পড়াই ছিল তার স্বভাব। হঠাৎ তার মনে যে কি অনুপ্রেরণা এল বুঝতে পারলুম না, সড়াক ক'রে এগিয়ে এসে তাঁকে একটা প্রণাম ক'রে ফেললে। তার দেখাদেখি আমিও একটা প্রণাম করলুম। প্রণামের পালা শেষ হবার পর তিনি হেসে বললেন, আমাকে কি ব'লে ডাকবে?

'মাসী' বলব, কি 'দিদি' বলব, এই নিয়ে মনের মধ্যে জল্পনা চলেছে, এমন সময় তিনি নিজেই তার সমাধান ক'রে দিয়ে বললেন, আমাকে 'দিদিমণি' ব'লে ডাকবে, কেমন?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালুম।

দিদিমণির কথাবার্তার মধ্যে পশ্চিমী সুরের একটু আমেজ থাকলেও বিশুদার মতন তিন ভাগ উর্দু নেই। কথাবার্তা ও হালচালের মধ্যে শুদ্ধ বাঙালী-ঘরেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

এবার তিনি বৃদ্ধাকে ডেকে ঠেট-হিন্দীতে বলতে লাগলেন, বড়েভাইয়ের ঘরে এদের দুটো নতুন বিছানা পেতে দাও। অমুক জায়গা থেকে নতুন বালিশ নেবে, অমুক স্থানে যে-সব তোষক আছে তা থেকে নিও না, অমুক ঘরে কাঠের সিন্দুকে বালিশের ওয়াড় ও বিছানার চাদর আছে, ইত্যাদি।

বৃদ্ধার প্রতি বক্তব্য শেষ ক'রে আমাদের বললেন, আমার বড়েভাইয়ের ঘরে তোমাদের শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। বাড়িতে ঘরের অভাব নেই, তবে সব ঘরই আসবাব-জিনিসপত্রে ঠাসা। একটা ঘরের জিনিসপত্র সরিয়ে দিয়ে তোমাদের ঘর ক'রে দেব। কয়েকটা দিন এখন ওই ঘরেই থাক। আমার দাদা প্রায় কাশীতেই থাকে। সপ্তাহে একদিন কি দু-দিনের বেশি বাড়ি আসে না, কোনও অসুবিধা হবে না তোমাদের।

আহিয়া চ'লে গেল আমাদের বিছানাপত্রের ব্যবস্থা করতে। দিদিমণি দালানে একখানা শতরঞ্চি পেতে আমাদের নিয়ে ব'সে বাড়ির কথা, কেন বাড়ি থেকে পালিয়েছি, পালিয়ে কতদিন কোথায় ছিলুম, ইত্যাদি সব কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। দিদিমণি বললেন, তাঁর বাবা সেই ভোরের ট্রেনে চ'লে যান কাশীতে শুধু এক লোটা দুধ খেয়ে। সকাল-সন্ধ্যে সেখানেই খাবার ব্যবস্থা আছে। বাড়ি ফেরেন রাত্রি দশটার ট্রেনে, স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরতে প্রায় সাড়ে দশটা বেজে যায়। আজ যদি তোমরা ঘুমিয়ে পড়, তা হ'লে আর তুলব না, কাল ভোরবেলা তুলে দেব, বাবুজীর সঙ্গে দেখা করবে। না হ'লে বাবুজী রবিবারে বাড়িতে থাকেন, সেই দিন দেখা হবে।

আমি বললুম, আমাদের ভোরবেলাতেই তুলে দেবেন।

দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলেন, রাত্তিরে রুটি খেতে কোনও অসুবিধা হবে না তো?

কিছু না।

আচ্ছা, চল, তোমাদের ঘরে যাই।—ব'লে দিদিমণি উঠে ঘরের মধ্যে ঢুকে একখানা ধপ্‌ধপে সাদা শাল গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপরে সেই প্রায়ান্ধকারের মধ্যে এ-গলি সে-গলি, উঁচু-নীচু পথ দিয়ে আমাদের একটা বড ঘরে নিয়ে এলেন। ঘরের মেঝেতে একদিকে একটা দু-জনের মতন বড় বিছানা, আর-একদিকে একজনের মতন একটা বিছানা পাতা। ঘরের মধ্যে ঢুকে সেই বড় বিছানাটা দেখিয়ে আমাদের তিনি বললেন, ওইটে তোমাদের বিছানা, এটা দাদার বিছানা।

ঘরের দেওয়ালে খুব উজ্জ্বল একটা দেওয়াল-গিরি জ্বলছিল। দেখলুম, এ বাড়িতে রেড়ির তেলের কারবার একেবারেই নেই। ঘরের আর-এক দেওয়ালে ছোট্ট চৌকো একখানা আয়না ঝোলানো রয়েছে। আর-একদিকে ঘরের মেঝেয় একটা বড় কাঠের সিন্দুক, এ ছাড়া ঘরে আসবাব আর কিছুই নেই।

দিদিমণি হেসে পরিতোষকে বললেন, তোমার সম্পত্তি ওই সিন্দুকের ওপর রেখে দাও, ভয় নেই, কেউ নেবে না।

পরিতোষ লজ্জিত হয়ে সিন্দুকের ওপরে আমাদের পুঁটুলিটা রেখে দিলে। দিদিমণি বললেন, আচ্ছা, এবার চল, আমার ঘর দেখবে।

আবার তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, চারদিক ঘোর অন্ধকার, আমরা একরকম হাতড়ে-হাতড়ে চলেছি

তাঁকে অনুসরণ ক'রে। এই ঘরের পরেই অন্ধকার ছাত, তারই মাঝামাঝি রেলের গুমটির মতন একটা চোরা-কুঠুরি-গোছের ঘর। তারই কয়েক গজ দূরেই একটা প্রকাণ্ড চার-জানলাওয়ালা হল্-ঘরে দিদিমণি আমাদের নিয়ে এলেন। ঘরের একদিক জুড়ে প্রকাণ্ড একটা পালং, বোধ হয় চার-পাঁচটা জোয়ান তাতে গড়িয়ে গড়িয়ে শুতে পারে। পালঙের ওপরে চমৎকার বাহারী মশারি —মশারি যে এত সুন্দর ও বাহারী হতে পারে তা এই প্রথম দেখলুম। ঘরের চারধারে সুন্দর ও সুদৃশ্য ছোট-বড় দেরাজ, আলমারি ; লোহার সিন্দুকই বোধ হয় তিন-চারটে। এই ঘরে নিয়ে এসে দিদিমণি বললেন, এইটে আমার ঘর।

তারপরে একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, কেমন সাজানো! পছন্দ হয়?

বললুম, চমৎকার!

ঘরের এক কোণে একটা উর্দি-পরা ষণ্ডা-গোছের চাকর টুলের ওপরে ব'সে ছিল। আমাদের ঢুকতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। দিদিমণি এবার তাকে হিন্দীতে কি ব'লে আমাদের বললেন, লোকটা সারাদিন এই ঘরে পাহারা দেয়। রাত্রিবেলা আর-একটা লোক ওই চোরা-কুঠুরিতে শুয়ে থাকে পাহারা দেবার জন্যে।

তারপরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বললেন, ঘরে অনেক দামী জিনিস আছে কিনা। আমি তো সারাদিন অন্য ঘরে থাকি, রাত্রে বাবুজীকে ঘুম পাড়িয়ে ঘরে ফিরতে রাত্রি প্রায় বারোটা বেজে যায়, ততক্ষণ এরা পাহারা দেয়। আমি ঘরে এলে পাহারা চ'লে যায় চোরা-কুঠুরিতে, সকালে আবার পাহারা বদলি হয়। রাতে আমার ঘরে আহিয়া শোয়।

দিদিমণির খাটের পাশেই দেখলুম, একটা স্ট্যাণ্ডে দুটো দো-নলা বন্দুক সাজানো রয়েছে। বললুম, দিদিমণির কি শিকার-করা অভ্যেস আছে নাকি? বিছানার পাশেই বন্দুক কিসের জন্যে?

দিদিমণি বললেন, আরে ভাই, শিকার-খেলার অভ্যেস তো খুবই ছিল এককালে, নিশানাও ছিল খুব ঠিক, কিন্তু সে-সব এখন চুকে-বুকে গেছে। ও-দুটো আছে মানুষ-শিকারের জন্যে। এখানে ডাকাতের ভয় আছে কিনা, যদি দরকার হয় তাই রাখা।

আবার সেই লোকটাকে কি ব'লে দিদিমণি বললেন, চল, এবার ছোট্‌কার কাছে যাই।

সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আবার খানিকটা ছাত, তার পরে আর-একটা

চোরা-কুঠুরি, তার পরেই বিশুদার ঘর। বিশুদার ঘরের কাছাকাছি পৌছেই শুনতে পাওয়া গেল, ঘরের ভেতরে খুব মজলিস চলেছে। ঘরের দরজায় একটা লোক ব'সে ছিল, দিদিমণিকে দেখেই সে উঠে দাঁড়াল। দিদিমণি তাকে বললেন, শঙ্কর, ছোটেসাহেবকে বল, আমি এসেছি।

এই ব'লেই তিনি পাশের চোরা-কুঠুরিতে ঢুকে আত্মগোপন করলেন, শঙ্কর ভেতরে চ'লে গেল।

কয়েক মিনিট পরেই ঘর থেকে দশ-বারোটা লোক হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে ছাতের এক কোণের একটা গলিপথ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বোধ হয় সেই ছাতে যেখানে সকালে আমরা এসে বসেছিলুম। লোকগুলো বেরিয়ে যাবার পর শঙ্কর চোরা-কুঠুরির সামনে গিয়ে কি বলতেই দিদিমণি বেরিয়ে এসে আমাদের বললেন, এস।

বিশুদার ঘরে ঢুকলুম। ঘরখানা প্রায় দিদিমণির ঘরের মতনই বড়। মেঝেতে ঘর-জোড়া বিছানা। দু-দিকের দেওয়ালে দুটো উজ্জ্বল কেরোসিনের বাতি জ্বলছে, ঘর একেবারে ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আছে। চারিদিকে, এমনকি বিছানার ওপরে পর্যন্ত, বিড়ির টুকরো আর দেশলাইয়ের কাঠি। দুটো-তিনটে সটকার মাথায় কলকের ওপরে তখনও গন্‌গন্‌ ক'রে ছোট ছোট গুল জ্বলছে। বিছানার এক কোণে একটা উঁচু গদির ওপর আধশোয়াভাবে পিঠে বালিশ দিয়ে বিশুদা ব'সে আছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দিদিমণি সেই বিছানার ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে বিশুদাকে একরকম জড়িয়ে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাইয়া, কেমন আছিস?

ভাই-বোনের সম্বন্ধ একেবারে বাঙালী ঘরের মতন হ'লেও উর্দুতে কথাবার্তা শুরু হ'ল। দিদিমণি বলতে লাগলেন, ছোটে, তুই কেন কিছু খাচ্ছিস না? এমন ক'রে ক'দিন বাঁচবি ভাই? বাবুজী বললে, দুধ আর গোশ্‌তের সোরুবা না খেলে তুই বাঁচবি না। খাওয়া-দাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলি কেন?

বিশুদা বলতে লাগল, বহেন্‌, খেতে যে পারি না ভাই। তুই বুঝছিস না, তুই তো কিছুতেই মানবি না, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার দিন প্রায় শেষ হয়ে এল। সারাদিন বাদে তুই এলি—কোন্‌দিন এসে দেখবি, তোর ছোটে আখ্‌রি শ্বাস ছেড়েছে।

পাঁচ মিনিট আগে এই ঘরে হাসির হর্‌রা চলছিল, আমরা নিজের কানে শুনেছি।

দেখতে দেখতে দিদিমণির চোখে অশ্রু দেখা দিল। অত্যন্ত ধরা গলায় করুণকণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন, ছোটে, তুই চ'লে গেলে আমি কি নিয়ে থাকব ভাই—আমার আর কি রইল?

দিদিমণির অশ্রু ও করুণ কণ্ঠের চাইতে করুণতর হাসি হেসে বিশুদা বললে, বহেন্, পরমাত্মার দয়ার সীমা নেই। দেখ্, আমি চ'লে যাবার আগেই সে তোকে এই দুটো ভাই এনে জুটিয়ে দিয়েছে।

আমরা দিদিমণির দু-পাশে—একটু পেছনে ব'সে ছিলুম। বিশুদা কথাটা বলামাত্র দিদিমণি একবার পাশ ফিরে আমাদের দেখে আবার ভাইয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

ছোটেসাহেব বলতে লাগল, এই শর্মাজী ও রায়সাহেব—এরা তো এখনও বাচ্চা, তুই এদের নিজের মতন তৈরি ক'রে নে। এদের মুখ দেখেই বুঝতে পারা যায়, এরা শরীফ ঘরের ছেলে।

তার পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে, আর সূদন তো রইল—আমি গেলে তাকে আর চাকরি করতে দিস নে, কাছে এনে রাখিস।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। তার পরে বিশুদা আমাকে ডেকে তার অদ্ভুত বাংলা-ভাষায় বললে, দেখো শর্মাজী, আমার দিদিমণিকে তোমরা দেখো। বেচারা বড় দুঃখীলোক আছে, ওর সাথ কখনও ছেড়ো না।

এই অবধি ব'লেই বিশুদা একদৃষ্টে সামনের দিকে চেয়ে রইল। দিদিমণি বাঁ হাতখানা দিয়ে ভাইকে জড়িয়ে ধ'রে ছিল। আমি ঠিক তার পাশেই অথচ একটু পেছনে ব'সে ছিলুম। সেই অবস্থাতেই সে তার ডান হাতখানা হাতড়ে-হাতড়ে আমার বাঁ হাতটা আস্তে ধ'রে ফেললে। সে স্পর্শের মধ্যে সঙ্কোচ ছিল বটে, কিন্তু অনুনয় ছিল অতি গভীর। এক হাতে মুমূর্ষু ভাই, যার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে সে একত্রে বেড়ে উঠেছে, সারাজীবনের কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি যার সঙ্গে জড়িত—মুষ্টিবদ্ধ বালুকণার মতন যত জোরে সে তাকে আঁকড়ে ধরছে তত তাড়াতাড়িই তার জীবনকণা নিঃশেষ হয়ে চলেছে, এ-কথা যে সে বুঝতে পারছে না তা নয়—অন্য হাতে অজানা, অপরিচিত, অনাত্মীয়, নবাগত আমরা। দু-দিকে দুই তরফকে নিয়ে দিদিমণি ব'সে রইল। আমি দেখতে লাগলুম, তার দুই চোখ দিয়ে নিঃশব্দে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল বিশুদার ডান কাঁধের ওপর।

প্রকাণ্ড হল্-ঘর, দুটো দেওয়ালগিরিতেও ঘরের সবটা আলোকিত হয় নি।

দূর প্রান্তের কোণগুলোতে অন্ধকার জমা হয়ে রয়েছে। বিশুদা অশ্রুবিহীন উদাস দৃষ্টিতে সেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। বিড়ি ও গড়গড়ার ধোঁয়াগুলো ঠাণ্ডার চোটে স্তম্ভিত হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘরের মাঝখানে স্থির হয়ে শূন্যে ঝুলতে থাকল। একবার পরিতোষের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার বড় বড় টানা চোখ-দুটোতে অশ্রু টলটল করছে। সব স্থির নিস্তব্ধ—এরই মধ্যে স্থাণুর মতন আমরা চারটি প্রাণী ব'সে রইলুম।

আজ শীতের এই সন্ধ্যায়, আলোকহীন কলিকাতা নগরীর মধ্যে নির্বান্ধব পুরীতে একটা ঘরে একলা ব'সে এই জাতক লিখছি। মাথার ওপরে কালিমালিপ্ত বিজলীবাতির ফানুস জলছে, তা থেকে আলোর চাইতে অন্ধকারই বিকিরণ করছে বেশি। জগদ্ব্যাপী মরণ-যজ্ঞের মন্ত্র মাথার ওপর গিয়ে গর্জন করতে করতে আকাশময় ছুটোছুটি করছে। চারিদিকে মৃত্যু ছাড়া আর কথা নেই, মৃত্যু ছাড়া আর সংবাদ নেই, মৃত্যু ছাড়া আর কাব্য নেই। প্রভাত-সূর্য উঠছে মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে, পূর্ণিমার চাঁদ সে তো মৃত্যুরই দূত। ব'সে ব'সে মৃত্যুর কথাই মনে হচ্ছে। মৃত্যু—সে তো আমার অজানা নয়। শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত বারে বারে আমি মৃত্যুর রূপ দেখেছি কত ভাবে! আমার কত প্রিয়জনকে যে সে নিয়ে চ'লে গিয়েছে, তার আর ঠিকানা নেই। কিন্তু গভীরভাবে মৃত্যুর কথা এর আগে আর কখনও চিন্তা করি নি। আজ অকস্মাৎ অনুভব করলুম, ধীরে, সন্তর্পণে, অতি অতর্কিতে মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে আমার সম্মুখে, অতি নিকটে। এত নিকটে যে, একটুখানি হাত বাড়ালেই তাকে ছুঁতে পারা যায়। মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে দূর-অতীতের আর-এক শীত-সন্ধ্যার সেই ছবিখানা মনের মধ্যে ফুটে উঠছে। মনে হচ্ছে, সেই অন্ধকার গৃহ-কোণের দিকে চেয়ে-চেয়ে মৃত্যুপথযাত্রী বিশুদার মনে সেদিন কি ভাবের উদয় হচ্ছিল!

বোধ হয় আধ ঘণ্টা সেইরকম চুপচাপ কাটবার পর দিদিমণি বিশুদাকে বললে, খানকয়েক হালকা লুচি আর একটু মাংসের সোরুবা পাঠিয়ে দিচ্ছি, খেয়ে ফেল্।

এতক্ষণে বিশুদা বাংলায় বোনের কথার উত্তর দিলে, তুই তো কিছুতেই মানবি না। পাঠিয়ে দে, যদি খেতে পারি তো খাব।

এবার দিদিমণি উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও টেনে তুললে, কারণ আমার বাঁ হাতখানা তখনও সে তেমনই চেপে ধ'রে ছিল।

বিশুদার ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। আমাদের ঘরের কাছে এসে দিদিমণি বললে, তোরা ততক্ষণ ঘরে গিয়ে আরাম কর্, খাবার তৈরি হতে দেরি হবে, আমি একটু দেখিগে যাই। বই পড়বি?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতে দিদিমণি বললে, আচ্ছা, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দিদিমণি চ'লে গেল। আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকে নির্দিষ্ট বিছানায় শুয়ে গল্প করতে লাগলুম। প্রথমেই পরিতোষ ধরা-ধরা গলায় বললে, গুরুমা'র চেয়ে এরা ঢের ভালো লোক। এদের ছেড়ে কখনও যাব না।

আমি চুপ ক'রে রইলুম, কারণ গুরুমা যে কিরকম লোক সে-সম্বন্ধে আজও আমার কোন স্পষ্ট ধারণা হয় নি। মৃত্যুর মতন আজও সে আমার কাছে রহস্যই হয়ে আছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর পরিতোষ বললে, জয়া ফিরে এলে তাকে এইখানেই একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে এনে রাখা যাবে। তারও কাশীর ওই হুল্লোড় ভালো লাগে না।

এবার আমি তাকে একটু খোঁচা দিয়ে বললুম, তুই কি মনে করেছিস, তোর কথা শুনে কাশী ছেড়ে জয়া এখানে চ'লে আসবে? মেয়েমানুষকে তা হ'লে এখনও চিনতে পারিস নি তুই।

আমার কথা শুনে পরিতোষ বললে, জয়া তোর রাজকুমারীর মতন নয়। আমি বললে সে আমার জন্যে হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারে।

পরিতোষ ভাগ্যবান! জয়া সম্বন্ধে এই ধারণা নিয়েই সে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছে।

বোধ হয় পনেরো-বিশ মিনিট বাদে বিকেলবেলাকার সেই ভরত এসে খান তিন-চার বাংলা বই আমাদের দিয়ে চ'লে গেল। আমরা এক-একখানা বই নিয়ে শুয়ে পড়তে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ভরত আমাদের জাগিয়ে খাবার-ঘরে নিয়ে গেল।

রান্নাঘরের এক কোণে কাঠের উনুনে হিন্দুস্থানী ঠাকুর রাঁধছে, কাছেই একটা মোড়ার ওপর দিদিমণি ব'সে। দেখলুম, দুটো বড় বড় পিঁড়ির সামনে দুখানা খালি থালা পাতা রয়েছে। আমরা সেখানে উপস্থিত হওয়ামাত্র দিদিমণি বললে, নাও, ব'সে পড়, আর রাত ক'রে কি হবে?

ঠাকুর গরম-গরম রুটির দু-পিঠে ঘি মাখিয়ে আমাদের থালার ওপরে দিয়ে

গেল। দিদিমণি দু-বাটি মাংস আমাদের দুই থালার পাশে রেখে বললে, আর কিছু নেই, এই দিয়েই খেতে হবে।

দুটি বেশ বড় বাটি ভর্তি ঘন দুগ্ধ মেরে আহার সমাধা ক'রে ঘরে এসে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়া গেল।

শীতের প্রত্যুষে ঘুমটি যখন বেশ জমেছে, ঠিক সেইসময় দিদিমণি আমাদের ঘরে এসে চেঁচামেচি ক'রে আমাদের তুলে বললে, চল, বাবুজীর সঙ্গে দেখা করবে না?

তখনও ফরসা হয় নি; কিন্তু দেখলুম, তার স্নান হয়ে গিয়েছে। মাথার ওপরে তেমনই চূড়ো ক'রে চুলের রাশি, গায়ে শুধু একখানি দামী শাল জড়ানো।

দিদিমণির সঙ্গে গিয়ে আমরা ঢুকলুম সেই ঘরে—কাল বিকেলবেলা যেখানে তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলুম, পেন্টুলান ও হাঁটু অবধি ঝোলা গরম-কোট-পরা একটি ভদ্রলোক খাটের ওপরে ব'সে রয়েছেন। রোগা, লম্বা, মাথার চুল অধিকাংশই কাঁচা, তবু দেখলে মনে হয়, বেশ বয়স হয়েছে। তাঁর পাশে একটা নীচু জলচৌকির ওপর একটা কাঁসার ঘটি বসানো, শঙ্কর চাকর পায়ের জুতোর ফিতে বেঁধে দিচ্ছে।

আমরা ঘরে ঢুকেই তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। আমার মেয়ে মনোরমা কাল রাতে তোমাদের সব কথা আমায় বলেছে। তোমরা এসেছ, ভালোই হয়েছে। এখানে থাক, মন-টন খারাপ লাগলে বাড়ি চ'লে যেয়ো, সেখানে কিছুদিন থেকে আবার চ'লে আসবে।

দিদিমণি তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, ওরা আর বাড়ি যাবে না বলেছে।

জলচৌকির ওপর থেকে ঘটিটা তুলে নিয়ে আলগোছে প্রায় সের-দেড়েক দুধ ঢক্‌ঢক্ ক'রে উদরস্থ ক'রে তিনি বললেন, মা-বাপ রয়েছেন, মধ্যে মধ্যে বাড়ি যাবে বইকি। ছেলেমানুষ, মন খারাপ করবে না?

দিদিমণি আমার দিকে এসে বললে, কি, মন খারাপ হবে নাকি?

যেন সমস্যাটার সমাধান বাপের সামনে এখুনি হয়ে যাক।

আমি বললুম, না, মন খারাপ কেন হবে?

দিদিমণি বাপের দিকে চেয়ে বললে, ওই শোন, কিছু মন খারাপ হবে না। কেন মন খারাপ হবে, এও তো নিজের বাড়ি—কি বল ভাই?

বৃদ্ধ পিতা এ-কথার কোনও জবাব না দিয়ে খানিকটা প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন, কানের অসুখ কার ?

দিদিমণি পরিতোষকে দেখিয়ে দিতে তিনি তাকে আলোর কাছে নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে কান টেনে টেনে ভেতর পরীক্ষা ক'রে বললেন, ও কিছু না, আমি আসবার সময় ওষুধ নিয়ে আসব।

বাবুজী চ'লে গেলেন। দিদিমণি বললে, চল্, তোদের ঘরে যাই।

ঘরে এসে একখানা লেপ তিনজনে পায়ের ওপর চাপা দিয়ে বসলুম। দিদিমণি বলতে লাগল, তোরা এসেছিস, এবার একটু গল্প ক'রে বাঁচব। সুদন চ'লে গেছে সে আজ পনেরো-বিশ দিন হয়ে গেল, সেই থেকে বাবুজী ছাড়া আর বাংলায় কথা কইবার লোক পাই নে।

বাবুজীর কথা উঠল। দিদিমণি বললে, আমার বাবুজী সত্যযুগের লোক, ও-রকম লোক হয় না। কি মজলিসী লোকই ছিলেন, আমার মাতাজী মারা যাবার পর থেকে ওই এক রকম হয়ে গেছেন, আর কারুর সঙ্গেই মেলামেশা করেন না। নির্জনে বাস করবার জন্যে এখানে এই বাড়ি কিনেছেন। তা ওঁর বাড়ি কেনাই সার হয়েছে। সপ্তাহের ছ'দিন তো একরকম কাশীতেই কাটে, রবিবার দিনটা শুধু বাড়িতে থাকেন। বাবুজীর আস্কারা পেয়েই তো আমার বড়ভাইটা নষ্ট হয়ে গেল। মাতাজী ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। আমার মাতাজী দেবী ছিলেন। তিনি চ'লে যেতেই তো সংসারটা ছন্নছাড়া হয়ে গেল।

দিদিমণির গলা ধ'রে গেল। আর কিছু না ব'লে সে চুপ করলে।

জিজ্ঞাসা করলুম, এই শীতে এত ভোরে আপনি স্নান করেন কি ক'রে ?

দিদিমণি হেসে বললে, এখন কি রে! স্নান করেছি সেই কখন! আমি উঠি ঠিক চারটেয়। উঠে গরুর জন্যে যে চাকর আছে তাদের তুলে দিই গাইদের জাব দেবার জন্যে। তারপরে ঘণ্টাখানেক ধ'রে তেল মাখি। স্নান সেরে এসে বাবুজীকে তুলে দিই, তিনি স্নান করতে যান। ওদিকে শুতে শুতে প্রায় রাত্রি বারোটা বেজে যায়। রাত্তিরে এই তিন-চার ঘণ্টার বেশি ঘুমের আমার দরকার হয় না। শুধু দুপুরবেলা ঘণ্টা-দুয়েকের জন্যে শুই, তার মধ্যে এক ঘণ্টা পড়ি, আর এক ঘণ্টা ঘুমোই। দিনের বেলা বেশি ঘুমুলে—বাবা, মোটা হয়ে যাব, এমনিতেই তো হাতী হয়ে দাঁড়িয়েছি। এবার খাওয়া কমাতে হবে।

আমাদের কথাবার্তা হতে হতে চারিদিক ফরসা হয়ে গেল। বাড়িঘর ঝাঁট

দেওয়া ও চাকর-বাকরদের আওয়াজ আসতে লাগল চারিদিক থেকে। দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলে, চা খাবি?

চায়ের কথা শুনে আনন্দে মন নেচে উঠল। বললুম, চায়ের ব্যবস্থা আছে নাকি?

দিদিমণি উৎসাহিত হয়ে বললে, আরে, চায়ের আমার ভারি শখ। ছোট্‌কা আর আমি ছাড়া বাড়ির আর কেউ চা খায় না, তা আজকাল ছোট্‌কা চা ছেড়ে দিয়েছে ব'লে নিজের জন্যে আর তৈরি করি না। খাবি?

বললুম, আমাদের তো জন্মাবধিই চা খাওয়ার অভ্যেস, কিন্তু বাড়ি থেকে পালিয়ে অবধি অভ্যেস ছুটে গিয়েছে, কোথায় পাব চা বিদেশ-বিভুঁয়ে?

দিদিমণি মুখে একবার চক্‌চক্‌ আওয়াজ ক'রে বললে, বেচারা!

তার পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোরা ব'স্‌, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দিদিমণি চ'লে গেল। আমরা মুখ-টুখ ধুয়ে চায়ের প্রত্যাশায় ব'সে রইলুম, কিন্তু চা আর আসে না। প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করবার পর একজন চাকর এক থালা গরম জিলিপি আর দু-গেলাস গরম দুধ নিয়ে এসে হাজির হ'ল। চা আর বরাতে হ'ল না মনে ক'রে সেইগুলিরই সদ্ব্যবহার ক'রে বিড়ি ফুঁকতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না, একটু পরেই দু-বাটি চা এসে হাজির হ'ল। চা-পানান্তে বিশুদার আড্ডায় গিয়ে বসলুম। সেখানে গিয়ে দেখি, সেই ভোরেই দু-পাঁচজন লোক এসে হাজির হয়েছে। বিশুদা তার সেলাইয়ের তল্পি কোলে নিয়ে সেইরকম পা ছড়িয়ে ব'সে তাদের সঙ্গে গল্প করছে।

ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে এই যে বাংলাদেশ—অতি বিচিত্র দেশ এ, বিচিত্রতর এখানকার অধিবাসীদের হালচাল। ভারতের পুরাতন ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় যে, সেকালে এ-দেশে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত। বাংলাদেশের বাইরের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ব'লে থাকেন, এ-দেশ পাণ্ডববর্জিত, অর্থাৎ পাণ্ডবেরা নাকি এ-দেশে কখনও আসেন নি। অবশ্য পাণ্ডবদের মতন অসভ্যেরা যদি এ-দেশে না এসে থাকেন, তাতে আমাদের কোনও ক্ষতিই হয় নি। যে-দেশে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর মুখ দেখলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত, সেখানে ভাদ্দর-বউকে নিয়ে পাড়া জানিয়ে ঘরে খিল লাগানোর প্রতিক্রিয়া যে কি হ'ত, তা ভাবলে আর জ্ঞান থাকে না—

কারণ পাণ্ডবদের ধর্মবন্ধু, মতান্তরে ধর্মপিতা, কৃষ্ণচন্দ্রের লীলাখেলাকে ধর্মসাধনের অঙ্গ ক'রে অধ্যাত্মজগতের পাকা সড়ক দিয়ে যেভাবে আমরা তেড়ে উন্নতির মার্গে আরোহণ ক'রে চলেছিলুম, অত্যাচারী ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট বাধা না দিলে বৃন্দাবনের স্থান নির্ণয় করতে হয়তো আজ ঐতিহাসিকেরা হিমসিম খেয়ে যেতেন। তাই বলছিলুম পাণ্ডবর্জিত যদি হয়ে থাকি, তাতে আমাদের কোনও দুঃখই নেই। দুঃখ এই যে, এ-দেশ ঈশ্বরবর্জিত।

ভারতের পূর্বাপ্রান্তে পূর্ব-সমুদ্রের কোলে এই যে বাংলদেশ—এ-দেশের অর্ধেক জল ও তার অর্ধেক জঙ্গল। এরই মধ্যে এখানে ওখানে যেটুকু ডাঙা-জমি আছে, সেইটুকুই আমাদের চাষ ও বাসভূমি। প্রকৃতির লীলানিকেতন এই দেশ—পৃথিবীর আর কোনও দেশে ষড়ঋতুর আবির্ভাব হয় না; কিন্তু তথাপি অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও মহামারী—একটা-না-একটার উৎপাতে বঙ্গবাসী আবহমানকাল থেকেই পুলকিত হয়ে আসছে। এ ছাড়া সর্পভীতি ও অন্য জানোয়ারের ভয় তো আছেই। সবার ওপরে বিদেশীরাজ-স্নেহাতিশয্যের প্ররোচনায়-পালিত প্রতিবেশী কর্তৃক স্ত্রীকন্যাপহরণের অত্যাচার —সে তো প্রায় গা-সওয়া হয়ে গেছে।

এই দেশ—যেখানকার ব্রাহ্মণেরা পর্যন্ত মৎস্যমাংসভুক্, সেই দেশকে সারা আর্যাবর্ত ঘৃণা করলেও কোনদিনই তারা একে অবহেলা করতে পারে নি। তার কারণ আর্যাবর্তবাসীর ঔদার্য নয়, তার কারণ বাঙালীর পৌরুষ ও শক্তিমত্তা।

এই ঈশ্বরবর্জিত দেশ থেকে যুগে যুগে আচার্যেরা গিয়েছেন আর্যাবর্তের দিকে দিকে শিক্ষাদানের জন্য। দর্শন-বিজ্ঞান, কাব্য-ন্যায়ের নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভায় এ-দেশ চির-প্রদীপ্ত।

ইংলণ্ডীয় ক্রীশ্চানেরা এখানে আসবার অনেক আগে থেকে এখানকার অধিবাসীরা আর্যাবর্তের স্থানে স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে কার্যব্যপদেশে। তারা যেখানেই গিয়েছে, সেই দেশকেই আপনার ক'রে নিয়েছে। শিক্ষায়, সেবায় ও সমাজসংস্কারে তারা নিজেদের ব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছে সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে—যুগে যুগে তারা সেখানকার অধিবাসীদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

কিন্তু পরবাসী হ'লেও মাতৃভূমির সঙ্গে নাড়ীর যোগ তাদের কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নি। মাতৃভূমির কোনও লোক, তা সে ভ্রমণব্যপদেশেই হোক বা দুর্দশায় প'ড়েই হোক, তাদের আশ্রয়প্রার্থী হ'লে, সে ব্যক্তি যে শ্রেণীর লোকই হোক না

কেন, যথাসাধ্য তার সাহায্য করেছে, নিজের পরিবারের মধ্যে তাকে আপনার ক'রে নিয়েছে। বাইরে এদের হালচাল যাই হোক না কেন, বাঙালীর বৈশিষ্ট্য, বাংলা ভাষা, বাঙালীর পোশাক ও বাঙালীর খাদ্য তারা ত্যাগ করে নি।

এইরকম এক বাঙালী পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদের বর্তমান আশ্রয়দাতা, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব এই দুই প্রদেশের সীমান্তে কোন এক শহরে। লাহোরের মেডিক্যাল ইস্কুল থেকে পাস ক'রে কিছুকাল সৈন্যদলে কাজ ক'রে সিভিল চাকরিতে বদলি হয়ে সম্মানের সঙ্গে চাকরি শেষ ক'রে তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন। বিবাহ করেছিলেন বাংলাদেশেরই এক পল্লীগ্রামের মেয়েকে। দশ বছরের মেয়ে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে চ'লে এসেছিল এই দূর বিদেশে। তারপর বোধ হয় বার দুই-তিন বাপের বাড়ি আসবার সুবিধা হয়েছিল, তারপরেই স্বামীর ঘর নিজের ঘর হয়ে গেল। অদ্ভুত বাঙালীর মেয়ে, জগতে তাদের তুলনা নেই।

ওপরে যাদের কথা উল্লেখ করলুম, তারা ছাড়াও আর-এক শ্রেণীর বাঙালী আর্যাবর্তের স্থানে স্থানে ছড়িয়ে আছে, মাতৃভূমির সঙ্গে যোগসূত্র তাদের ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এরা বাংলাভাষা, বাঙালীর বেশ ও খাদ্য ভুলে গিয়েছে; কিন্তু বাঙালীর সঙ্গে নাড়ীর টান এখনও ছিন্ন হয় নি। তাই বাঙালী কারুকে দেখতে পেলে অতি বিনীতভাবে নমস্কার ক'রে সঙ্কোচের সঙ্গে বলে, ম্যয় বাংগালী হুঁ। এঁরা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ। নাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, অমুক ভটাচারী কিংবা অমুক ঘাংগোলি। এঁদের পূর্বপুরুষেরা বিদেশে গিয়েছিলেন কোনও মন্দিরের পৌরোহিত্য, কোনও রাজকার্য কিংবা সেনানীর চাকরি নিয়ে, ব্যবসা-সূত্রেও কেউ কেউ গিয়েছিলেন। পুরুতের কাজ নিয়ে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের বংশধরেরা এখনও পৌরোহিত্যই করছেন। যাঁরা অন্য কাজে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়েছেন জমিদার, কেউ কেউ বা রাজসরকার থেকে জায়গীর পেয়ে হয়েছেন সর্দার। এদের ছেলেদের বিয়ে হয় অতি মুশকিলে। পরিবারের মধ্যে চারটি ছেলে থাকলে দুটির বিয়ে হয়, আর দুটিকে অবিবাহিতই থাকতে হয়। প্রত্যেক ছেলের বিয়ের সময়েই এঁরা প্রথমেই খাস বাঙালীর ঘরের মেয়ে খোঁজেন। তারপরে খোঁজেন যুক্তপ্রদেশের আধা-বাঙালীর ঘরে। সেখানেও না পেলে শেষে নিজেদের মধ্যেই, কিন্তু সগোত্রে নয়, বিয়ে দেয়।

এইরকম ঘরের একটি ছেলের সঙ্গে একবার আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে-বেচারা বিয়ে করেছিল কাশীতে। স্ত্রীকে সে ভালবাসত বললে ঠিক বলা হয় না,

তাকে সে দেবীর মতন পূজো করত। দু-পাঁচ বছর অন্তর স্ত্রী বাপের বাড়ি যেত, সেখান থেকে সে বাংলায় চিঠি লিখত স্বামীকে। আমার বন্ধু সেই চিঠি বগলে নিয়ে দশ মাইল দূরে এক আধা-বাঙালীর কাছে যেত চিঠি পড়াবার জন্যে, আর তাকে দিয়েই সেই চিঠির জবাব লিখিয়ে ডাকঘরে ফেলে দিয়ে বাড়ি আসত। এদের বাড়িতে বার-কয়েক নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছি। প্রথমবারে মেয়েরা কেউ সামনে বেরোয় নি। তারপরে ছেলেমানুষ দেখে মা-খুড়ীর দল বেরুলেন, ইয়া-ইয়া পেশোয়াজের মতন ঘেরওয়ালা সব 'লাহেঙ্গা' পরা, কেউ-বা যোধপুরের মেয়ে, কেউ-বা বিকানীরের। নতুন বউয়ের দেখাদেখি অল্পবয়সীরা শাড়ি পড়তে আরম্ভ করেছে, তাই নিয়ে সংসারে অশান্তির সীমা নেই।

এইরকম একটি পরিবার, যাদের পূর্বপুরুষ রাজকার্য-ব্যপদেশে কোনও এককালে রাজপুতনার পাহাড়-ঘেরা কোলে এক রাজ্যে গিয়েছিল বসবাস করতে। নিজেদের শৌর্য ও কর্মকুশলতায় তারা সেখানকার প্রথম শ্রেণীর সর্দারের পদে উন্নীত হয়েছিল। রাজ্য ছোট হ'লেও তাদের জমিদারি ছিল বিপুল। পাহাড়ের ওপরে প্রাসাদ, বাড়িতে চার-পাঁচ-শো লোক, এই পরিবারের বড় ছেলের সঙ্গে দিদিমণির বিয়ে হয়েছিল। সেখানকার মহারাজা নিজে উদ্যোগী হয়ে এই বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন। দিদিমণির মা-বাবা মনে করলেন, তাঁদের মেয়ের যেমন রাজরাণীর মতন রূপ ও হালচাল, তেমনই ঘরে ভগবান তার বরও জুটিয়ে দিলেন। কিন্তু ভবিতব্য ছিল অন্য, কারণ শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রথমবার ফিরে এসেই দিদিমণি প্রকাশ করলে যে, তার স্বামী আধ-পাগলা। তবে অত্যাচার কিছু করে না, শুধু সারারাত তার পা-দুটো জড়িয়ে ধ'রে শুয়ে থাকে।

কিন্তু এরকমও বেশিদিন চলল না। বিয়ে ক'রে ভালো ভালো মাথাওয়ালা লোকেরই মেজাজ বিগড়ে যায়, আধ-পাগলা তো দূরের কথা!

একদিন এই আধ-পাগলা ফুর্তির চোটে মারলে লাফ পাহাড়ের ওপর থেকে গভীর খাদে, দিদিমণি মাথার সিঁদুর মুছে ফিরে এল বাপের বাড়ি।

তারপরে চলল লড়াই বিষয়-আশয় নিয়ে। শেষকালে মহারাজা মাঝখানে প'ড়ে প্রায় লাখখানেক টাকা দিয়ে তাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিলেন। দিদিমণির নামে টাকাটা তার বাবা আগ্রার বাঙাল-ব্যাঙ্কে জমা ক'রে দিলেন। গয়না ইত্যাদি স্ত্রীধন সব বাড়ির সিন্দুকে উঠল। চেক কাটবার জন্যে সে ইংরেজী

শিখতে লাগল, আমরা দেখেছি তার হাতের লেখা মুক্তোর মতন। সেই থেকে সে বাপের বাড়িতেই আছে।

মা মারা যাওয়ার পর বাপের বাড়ির সারা সংসারের ভার স্বেচ্ছায় তুলে নিলে সে নিজের মাথার ওপর। সেই ভোর চারটের সময় উঠে গরুর চাকরদের তুলে দেওয়া। তারপরে স্নান সেরে দুধ গরম ক'রে বাপকে খাইয়ে তাঁকে কাশী পাঠিয়ে দেওয়া। প্রায় পনেরোটি ঝি-চাকরকে খাইয়ে বেলা একটার সময় আহারাদি শেষ ক'রে সে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। বছর-পাঁচেক আগে বিছানার চাদরের মতো লম্বা-চওড়া একখানা 'হিতবাদী' ও একখানা 'বসুমতী' সাপ্তাহিক তার বাবা কাশী থেকে কিনে এনেছিলেন, তারই একখানা নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে। প্রতিদিন এই কাগজের সম্পাদকীয় থেকে আরম্ভ ক'রে বিজ্ঞাপন পর্যন্ত প'ড়ে ঘণ্টাখানেকের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ে। কাগজ-দুখানায় যত বই, ওষুধ ও দৈব-মাদুলির বিজ্ঞাপন আছে, দিদিমণি তা সব ভি.পি.-তে নিয়ে এসে ঘরে জমা ক'রে রেখেছে। ঘুম থেকে উঠে আবার সংসারের কাজে লেগে যাওয়া, ঘড়ি ধ'রে রুগ্ন ভাইয়ের ওষুধ ও পথ্য পাঠানো —এসব ছাড়া কাশীর দাওয়াখানার হিসাব তো আছেই। গরুদের শিঙে ও ক্ষুরে একদিন যদি চাকরেরা তেল মাখাতে ভুলে যায় তো হুলুস্থুল বাধে বাড়িতে। সমস্ত সংসার ঘড়ির কাঁটার মতন চলেছে, একটু এদিক-ওদিক হবার জো নেই।

দিদিমণির বাবা, বয়স তাঁর প্রায় পঁচাত্তর। জীবনব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার দিন তাঁর ঘনিয়ে এসেছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সব ছেড়ে-ছুড়ে যে-ক'টা দিন বাঁচেন, নির্জনবাস করবার জন্যে এখানে বাড়ি কিনেছিলেন ; কিন্তু কিছুদিন চুপচাপ ব'সে থাকবার পর আবার কর্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। একদিন তাঁর সংসার ছিল বৃহৎ। নিজের অনেক ছেলেপিলে ছিল, তা ছাড়া বাইরের কত ছেলে, কত আত্মীয়স্বজন তাঁর বাড়িতে মানুষ হ'ত। জম্‌জমে সংসার, সবার ওপরে ছিল লক্ষ্মীরূপা স্ত্রী, কিন্তু মৃত্যু এসে একে একে প্রায় সকলকেই নিয়ে গেছে। একদিন তাঁর একলার আয়ে সংসারের খরচ কুলোত না, আজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থানুকূল্যে ভাগ্যবিধাতা তাঁর ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে দিচ্ছেন ; কিন্তু লোক নেই, কে ভোগ করবে, তাই মাসে মাসে উদ্‌বৃত্ত অর্থ ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা হচ্ছে। একটা মেয়ে, সেও বিধবা। দুটো ছেলের একটা কবে যায় তার ঠিক নেই, আর-একটা হতচ্ছাড়া। কিন্তু কোনও কিছুতেই

তাঁর আয়োজনও সেই, বিসর্জনও নেই। তাঁর দিন যে ঘনিয়ে এসেছে সে-কথা তিনি জানেন, কিন্তু মৃত্যুর পর মেয়ের যে কি হবে সে-বিষয়ে কোনও চিন্তাই তাঁর নেই।

দিদিমণির ছোট ভাই, তার কথা আগেই বলেছি।

আমাদের দিনগুলি কাটতে লাগল পরম আনন্দে। পরিতোষের সঙ্গে বিশুদার ভারি ভাব জ'মে গেল, সে প্রায় সারাদিনই তার সঙ্গে কাটায়।

দিদিমণি আমাকে দিয়ে তার নিজের টাকার হিসাব, সংসার-খরচের হিসাবপত্র লেখাতে আরম্ভ করলে। সকালবেলাটা আমার এই করতেই কেটে যায়। বাবুজী প্রতিরাত্রেই দাওয়াখানার একটা হিসাব নিয়ে আসতেন আর সকালবেলায় প্রতিদিন সেই হিসাব একটা পাকা খাতায় আমাকে টুকে রাখতে হ'ত। দিদিমণি বলতে লাগল, তুই আসায় যে আমার কি স্থবিধে হয়েছে, তা কি বলব!

কিছুদিন যেতে-না-যেতেই পরিতোষ বিশুদার, আর আমি দিদিমণির লোক হয়ে গেলুম। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে দিদিমণি যখন গড়ায়, তখন তার কাছে ব'সে মাথার পাকা চুল খুঁজতে হয়। কোনদিনই পাকা চুল পাওয়া যায় না; সে বলে, অনেক আছে, তুই দেখতে পাস না। শেষকালে চুল চিরে চিরে, তার মধ্যে আঙুল চালিয়ে মাথায় স্থড়স্থড়ি দিতে হয়। সে ঘুমিয়ে পড়লেই একখানা বই নিয়ে শুয়ে পড়ি। কোন কোন দিন দিদিমণি গল্প করে—তাদের সংসারের, তার শ্বশুরবাড়ির গল্প। তার বড় ভয়, ছোট্‌কা ম'রে গেলে, বাবুজী চ'লে গেলে তার কি হবে?

আমি বলি, আমরা রয়েছি, তোমার ভাবনা কি দিদি?

দিদিমণি উঠে ব'সে থুতনিতে হাত দিয়ে সজলকণ্ঠে বলে, সত্যি বলছিস?

সত্যি বলছি।

দিদিমণি আমার চোখের দিকে চেয়ে-চেয়ে কি দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

একদিন আমি তাকে বললুম, বাবুজী ও বিশুদা যদি সত্যিই চ'লে যায়, তা হ'লে আমরা দেশভ্রমণে বেরিয়ে যাব। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লে আবার কিছুদিনের জন্যে এখানে ফিরে আসব, আবার বেরিয়ে পড়ব।

আমার প্রস্তাবটা তার খুবই ভালো লাগল। সেই থেকে প্রায় প্রতিদিনই দেশভ্রমণের কথা শুরু হ'ল। দুপুরবেলা তার পাশে ব'সে কখনও চ'লে যাই

পৃথিবীর প্রান্তে সেই মেরুজ্যোতির দেশে, কখনও-বা ঘুরে বেড়াই হিমালয়ের শিখরে শিখরে, কখনও-বা সুইট্‌জারল্যাণ্ডের হ্রদে স্টীমবোটে চড়ি, কখনও-বা কন্যাকুমারীর মন্দিরে ব'সে থাকি। সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, সেদিন আর বই পড়া হয় না।

এক অস্থির ছাড়া বাড়ির কথা মনেই হয় না, একা দিদিমণি আমার মা বোন দিদি সবার স্থান অধিকার ক'রে বসল।

মধ্যে মধ্যে মনে হয়, দেশভ্রমণের সময় মাকেও নিয়ে আসব। একদিন দিদিমণির কাছে সে-কথা বলামাত্র আনন্দে লাফিয়ে উঠে সে বললে, এখন কোনরকমে তাঁকে নিয়ে আসতে পারিস না?

বললুম, মাকে আনতে গেলে আমায় তারা ধ'রে ফেলবে, আর আসতেই দেবে না।

নিরুৎসাহ হয়ে সে বললে, আচ্ছা, এখন তা হ'লে থাক্।

এবার এদের বড়ভাইয়ের কথা বলি। এ-বাড়িতে ঢুকে অবধি শুনে আসছিলুম যে, সে-লোকটা মাতাল, লম্পট, জুয়াড়ী, বাড়ির সুখদুঃখের সঙ্গে তার কোনও সহানুভূতিই নেই। শুধু বাপের ভালোমানুষির সুযোগে সে দু-হাতে সংসারের টাকা শুষছে আর ওড়াচ্ছে। এইসব শুনে তার প্রতি একটা বিরুদ্ধ ভাব মনের মধ্যে জমা হয়েই ছিল। দুই বন্ধুতে তার সম্বন্ধে অনেক আলোচনাও হ'ত এবং এ-কথাও আমরা বলাবলি করেছি যে, আমাদের মতন ভাইয়ের পাল্লায় পড়লে দু-দিনে চাঁদকে ঠাণ্ডা ক'রে দিতুম।

দিদিমণিদের বাড়িতে আসার বোধ হয় সাত-আট দিন বাদে একদিন রাত্রি প্রায় সাড়ে-দশটার সময় সেই চাঁদের উদয় হ'ল আমাদের ঘরে।

দিদিমণি আমাদের বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছিল, রাত্রে আলো একেবারে নিবিয়ে শুয়ো না। এখানে চোর, ডাকাত, বিচ্ছু, করায়েৎ ইত্যাদির উৎপাত আছে।

আমাদের বাতিটা খুব নামিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়তুম। দরজাটা ভেজানোই থাকত, কারণ বাইরের ছাতে সারারাত্রি পাহারা থাকত।

সে-রাত্রে ঘুমিয়ে পড়বার পর হঠাৎ কার ভারী গলার আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল। চটকা ভেঙে যেতেই উঠে ব'সে পরিতোষকে ঠেলে তুলে দিলুম। দেখলুম, সামনেই একটা লোক দাঁড়িয়ে, মিস্-কালো, লম্বা-চওড়া চেহারা, মুখময় বসন্তের দাগ, তাতে একজোড়া ঝাঁটার মতন গোঁফ, ঘর ধানেশ্বরীর গন্ধে

একেবারে ভরপুর, চোখ-দুটো লাল টকটকে—বোধ হয় ধানেশ্বরীর ওপরে গাঁজাও চড়েছে। পশ্চিমী ধাঁচে কোমরে ধুতি বাঁধা। সে এক বীভৎস দৃশ্য! বদ্যিনাথ তার কাছে কন্দর্প বললেও অত্যুক্তি হয় না।

উঠে বসতেই লোকটা ভারী গলায় ধমকের স্বরে বললে, লাটসাহেবের পোতারা, বাতি জ্বেলেই শুয়ে পড়েছ! বাবার ঘরের তেল পেয়েছ, না?

আমরা আর কি বলব! প্রথম সম্ভাষণেই এমন পুলকিত হলুম যে, আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হ'ল না। ইতিমধ্যে বড়েসাহেব গা থেকে শালখানা খুলে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তার পরে লম্বা কোটটা খুলে কাঠের সিন্দুকটা টিপ ক'রে ছুঁড়লেন বটে, কিন্তু সেখানা সিন্দুকের দশ হাত দূরে গিয়ে পড়ল, আর তিনি টাল খেয়ে নাচের ভঙ্গীতে দু-পাক ঘুরে গেলেন—কাছেই দেওয়াল থাকায় সে-যাত্রা সামলে গেলেন বটে, কিন্তু আমরা আর থাকতে না পেরে হেসে উঠলুম।

আমাদের হাসি শুনে বড়েসাহেব উর্দু লেখার ভঙ্গীতে হেঁটে এসে আমাদের বিছানায় ব'সেই চিৎকার ক'রে বললেন, কি, মশ্‌করা হচ্ছে আমার সঙ্গে! জান, তোমাদের মতন পাঁচ-সাতটা লোক খুন ক'রে এই বাড়ির উঠোনে পুঁতে রেখেছি!

কি সর্বনাশ! অন্তরাত্মা চিৎকার করতে লাগল, জয় বাবা বিশ্বনাথ! ডাইনীর কবল থেকে উদ্ধার ক'রে শেষকালে ডাকাতের খপ্পরে এনে ফেললে কেন বাবা? অতি দুর্দিনেও যে আড়াই টাকা খরচ ক'রে তোমার পুজো দিয়েছি!

কি করব, কি বলব, তাই ভাবতে লাগলুম। একবার মনে হ'ল, ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যাই দিদিমণির কাছে। ইতিমধ্যে পরিতোষটা ব'লে ফেললে, দিদিমণি রাত্রে বাতি নিবোতে বারণ ক'রে দিয়েছেন, তাই আলো জ্বলছে।

চুপ রহো।—ব'লে লোকটা এমন চিৎকার ক'রে উঠল যে, ছাতের পাহারাদার কিছু হয়েছে মনে ক'রে একবার ঘরে উঁকি দিয়ে চ'লে গেল।

বোধ হয় মিনিট-খানেক চুপ ক'রে থেকে লোকটা বললে, বাবুজীর কাছে তোমাদের সব খবর শুনেছি। বাড়ি থেকে ভেগে আসা হয়েছে, না? আমাকে বাবুজী পাও নি, ঠাণ্ডা ক'রে দোব।

[illegible] বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে, যা হবার হবে,

ঝগড়া-মারামারির দিকে আর কখনও যাব না। কিন্তু সে-কথা আমার মনে থাকলেও পরিতোষ সাফ ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ সে ব'লে ফেললে, কি করবেন আপনি? মারবেন? কেন মারবেন? কি করেছি আমরা আপনার? বাড়িতে না রাখতে চান, ব'লে দিন, আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি।

পরিতোষের কথা শুনে লোকটা এমন তিড়বিড়িয়ে উঠল যে, মনে হ'ল, তার গায়ে যেন নাইট্রিক অ্যাসিড ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ষাঁড়ের মতন একটা ভয়াবহ গর্জন ক'রে সে বললে, কি! আবার চোপরা করা হচ্ছে মুখের ওপর! মারব বিছুয়া।—ব'লে সাঁ ক'রে কোমর থেকে সাপের মতন অ্যাঁকাব্যাঁকা একখানা চক্‌চকে ছোরা বের ক'রে ধরলে একেবারে পরিতোষের নাকের ওপর। তারপরে কটমট ক'রে চেয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলতে লাগল, আজ তোমাদের শেষদিন।

"আজ তোমাদের শেষদিন"—এই ভবিষ্যদ্বাণী ইতিপূর্বে বাবার মুখেও বহুবার শুনেছি। শেষদিনের শেষমুহূর্ত অবধি পৌঁছবার সুযোগ না হ'লে পিতৃপুণ্যের জোরে সে-পথের অনেকখানিই আমার জানা ছিল। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাক্যকে নিশ্চিত সাফল্যে পরিণত করবার এমন পরিপাটী ব্যবস্থা তাঁর হাতে ছিল না, তাই এতখানি ভয় ইতিপূর্বে আর কোনদিনই পাই নি। পরিতোষের তো কথাই নেই, এত বয়স অবধি বাপের হাতে একটা চড় পর্যন্ত কখনও সে খায় নি।

বড়কর্তা বিছুয়া ঘুরিয়ে পরিতোষকে শাসাতে আরম্ভ ক'রে দিলে, সেই ফাঁকে আমি ছুটলুম দরজার দিকে দিদিমণিকে খবর দিতে। আমাকে ছুটতে দেখে বড়কর্তা চেঁচিয়ে উঠল, এইও, কোথায় যাচ্ছ?

বললুম, দিদিমণির কাছে যাচ্ছি, একটু কাজ আছে।

আচ্ছা, চ'লে এস এদিকে। কিচ্ছু বলব না, এস এদিকে।

দিদিমণির নাম করতেই দেখলুম, লোকটা একেবারে নরম হয়ে গেল। আমি ফিরে এসে তার কাছ থেকে একটু দূরে ব'সে পড়লুম। পরিতোষও ইতিমধ্যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ব্যবধানে গিয়ে একটা মোটা গিদ্দে কোলে নিয়ে উঁচু হয়ে বসল। আমি বসতেই লোকটা বললে, আজ আর কিছু বললুম না। ফের যদি আমার সঙ্গে কোনদিন মশ্‌করা করতে দেখি তো জান্‌সে মেরে দেব।

তারপরে ছোরাটাকে তিনবার চুকচুক ক'রে চুমু খেয়ে কোমরে গুঁজতে

গিয়ে আবার সেটাকে বার ক'রে এনে বললে, খুন পিলাব ব'লে একে বার করলুম, কিন্তু এখন যদি একে কিছু না দিয়ে খাপে পুরি তো অধর্ম হবে। এই কথা ব'লে সে একবার পরিতোষের ও একবার আমার মুখের দিকে বিমর্ষভাবে তাকাতে থাকল, অর্থাৎ তোমাদের দুজনের মধ্যে যেই হোক একটু রক্ত একে দাও।

আমার মাথার ওপরেই দেওয়ালে সেই আরশিটা ঝুলছিল। টপ ক'রে উঠে মুখ দেখবার ভান ক'রে আয়নাটা দেওয়াল থেকে খুলে নিলুম, উদ্দেশ্য, যদি লোকটা পরিতোষের ওপর কোন অত্যাচার করতে উদ্যত হয় তো এক আয়নার ঘায়ে তাকে গোলোকধামের অন্তত মাঝপথ অবধি পৌঁছে দেব।

কিন্তু আমাদের আর কোন কথা না ব'লে সে নিজের উরুতের কাপড়টা তুলে ছোরার মুখ দিয়ে খ্যাঁচ ক'রে খানিকটা কেটে ফেললে, সেই ক্ষতমুখ দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। সেই রক্তে আমাদের বিছানার খানিকটা লাল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ রক্ত বেরুবার পর সে বললে, ছেঁড়া ন্যাকড়া-ট্যাকড়া আছে?

বললুম, ন্যাকড়া তো নেই।

বড়কর্তা আর কোনও কথা না ব'লে ছোরাটা কোমরে গুঁজে উঠে পড়ল। তারপর টলতে টলতে গিয়ে নিজের বিছানার চাদরের খানিকটা পড়পড় ক'রে ছিঁড়ে ফেললে। আমরা মনে করলুম, হয়তো এবার উরুতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হবে। কিন্তু তা না ক'রে আবার সেইরকম টলতে টলতে আমাদের কাছে এসে বললে, শিলাই আছে?

দেশলাইটা দিতেই সেই চাদর-ছেঁড়া ন্যাকড়ায় আগুন লাগিয়ে দিলে। তারপরে সেই জ্বলন্ত ন্যাকড়া ক্ষতস্থানে চেপে ধ'রে মুখ থেকে হাক্ হাক্ ক'রে খানিকটা থুতু বের ক'রে তার ওপরে চাপাতে লাগল। কিছুক্ষণ এইরকম করবার পর বললে, যাক, থেমে গিয়েছে রক্ত-পড়া।

দেশলাইটা মেঝে থেকে তুলে বড়েসাহেব আমাদের কাছে এসে বললে, তোমাদের তক্দির ভালো, আজ ভারি বেঁচে গেলে।

এবার আমি বেশ মিষ্টি ক'রে বললুম, আপনি আমাদের বড়ভাই, আপনি যদি মেরে ফেলেন তো আমরা কি করতে পারি বলুন, ম'রে যেতে হবে।

আমার কথা শুনে বড়কর্তার মেজাজটা বেশ নরম হয়ে গেল। সে বললে, আচ্ছা, আমায় বড়ভাইয়ের মতন মানিস তো?

নিশ্চয়।

তো, যা জিজ্ঞাসা করব ঠিক-ঠিক জবাব দিবি ?

নিশ্চয়।

মিথ্যে বললে, আমায় চেনো না, জিন্দা মাটিতে গেড়ে দেব। ও তোমার বাবুজী, কি মনোরমা, কি তোদের বাপ এলেও বাঁচাতে পারবে না।

এ-কথার আর কি উত্তর দেব! গভীরভাবে গবেষণায় মন দেওয়া গেল, বাবুজী বা মনোরমা কি করবেন জানি না; কিন্তু সত্যিই যদি আমার বাবা এ-সময়ে এখানে উপস্থিত হন, তা হ'লে এই জিন্দা গেড়ে দেবার শুভকার্যে তিনি এ-ব্যক্তিকে সাহায্য করবেন, কি বাধা দেবেন, তাই নিয়ে মনের মধ্যে তোলপাড় চলতে লাগল।

আমার চিন্তাধারাকে চমকে দিয়ে বড়কর্তা খিঁচিয়ে উঠল, কি, সাচ্-সাচ্ বলবি তো ?

এবার পরিতোষ বললে, নিশ্চয়ই বলব, আপনি জিজ্ঞাসাই করুন না।

বড়েসাহেব এবার চক্ষু বুজে কি ভাবতে আরম্ভ করলে তা সে-ই জানে। আমার মনে হতে লাগল যে, লোকটা বোধ হয় বিশ্বনাথের বন্ধু। কাশীতে হয়তো আমাদের নামে টি-টি প'ড়ে গিয়েছে, সে-সব কথা জানতে পেরে এ ব্যক্তি রাজকুমারী সম্বন্ধেই কোন প্রশ্ন ক'রে বসবে। কিন্তু আমার সব আন্দাজ ব্যর্থ ক'রে দিয়ে চোখ বুজেই সে প্রশ্ন করলে, রোজ কতখানি ক'রে কোকেন খাওয়া হয় ?

বলেন কি মশায়! কোকেন-টোকেন আমরা খাই না।

বাড়ি থেকে ভেগেছ বাবা, আর কোকেন খাও না! ন্যাকা বোঝাচ্ছ আমাকে ?

এ-কথার আর কি জবাব দেব! বাড়ি থেকে ভাগতে হ'লে যে আগে থাকতে কোকেন খাওয়ার অভ্যেস করতেই হবে, এমন কোন শাস্ত্রের সঙ্গে ইতিপূর্বে আমাদের পরিচয় হয় নি।

চুপ ক'রে আছি, এমন সময় বড়দা বললে, আচ্ছা দেখি, জিভ বের কর তো।

আমরা একে একে জিভ বের ক'রে দেখালুম, কিন্তু সে-ব্যক্তি তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে উঠে গিয়ে কুলুঙ্গিগুলো হাতড়ে হাতড়ে কি খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর আমাদের কাছে ফিরে এসে লোকটা বললে, কি বাবা, ঠিক সরিয়েছ তো ?

কি ?

মোমবাতি। আমার বড় একটা মোমবাতি ছিল, সেটা পাচ্ছি নে।

আমি বললুম, আপনার মোমবাতি কোথায় গেছে আমরা তা জানি না। আমরা এসে অবধি ও-কুলুঙ্গিতে হাত পর্যন্ত দিই নি।

পরিতোষের দিকে চেয়ে দেখলুম, রাগে তার চোখ-দুটো রাঙা হয়ে উঠেছে। একটা কিছু হাঙ্গামা বাধাবার জন্যে যেন সে উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

আবহাওয়াটা ঠাণ্ডা করবার চেষ্টায় আমি বেশ মিষ্টি ক'রে বললুম, এত রাত্রে মোমবাতি কি হবে বড়দা ? বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসব ?

বড়কর্তা বললে, তোরা কতখানি ক'রে কোকেন খাস তা এক্ষুনি ধ'রে ফেলতে পারতুম মোমবাতিটা পেলে।

কি ক'রে ?

মোমবাতির টোসা জিভে ফেললেই বুঝতে পারা যাবে। যদি কোকেন খাওয়ার অভ্যেস থাকে তো মোমবাতির টোসা পড়লে জিভে লাগবে না, আর না হ'লে জিভ পুড়ে যাবে।

কি সর্বনাশ ! মনে মনে বিশ্বনাথকে প্রণাম জানিয়ে বললুম, ভাগ্যে লোকটা মোমবাতি পায় নি !

হঠাৎ পরিতোষ চেঁচিয়ে উঠল, আপনি রোজ কতখানি ক'রে কোকেন খান ?

বড় কর্তা বোধ হয় কল্পনাও করতে পারে নি যে, আমাদের তরফ থেকে এমন কোন প্রশ্নের সম্ভাবনা হতে পারে। প্রশ্নটা কানে যেতেই প্রথমে সে চমকে উঠল। তারপর পরিতোষের দিকে কটমট ক'রে চাইতে লাগল। গোড়ার দিকে লোকটার হালচাল ও বিছুয়ার রূপ দেখে মনের মধ্যে যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল, এতক্ষণ কথাবার্তার ফলে সে-ভয় অনেকটা কেটে গিয়েছিল। হঠাৎ পরিতোষের গলায় অতি-পরিচিত স্বর শুনে আমার মনও সাহসে ভ'রে উঠল। আমি তড়াক ক'রে উঠে গিয়ে আয়নাটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে দু-হাত দিয়ে ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলুম। পরিতোষ আমার দিকে একবার দেখে নিয়ে বোধ হয় নিশ্চিন্ত হয়ে আবার সেই স্বরেই বড়কর্তাকে বললে, যাও, বাপের সুপুত্র হয়ে ভদ্রলোকের মতন বিছানায় শুয়ে পড়গে। রাত-দুপুরে বাড়িতে এসে মাতলামি করতে লজ্জা করে না ? এক্ষুনি না শুয়ে পড়লে বাবুজীকে গিয়ে খবর দেব।

কি আশ্চর্য! লোকটা কয়েক সেকেণ্ড সেইরকম কটমট দৃষ্টিতে পরিতোষের দিকে চেয়ে থেকে বললে, আচ্ছা দেখে নেব!

তারপর কোমরে সেই ছোরা-গোঁজা অবস্থাতেই নিজের বিছানায় গিয়ে দড়াম ক'রে শুয়ে পড়ল।

কাপুরুষদের হালচাল সর্বত্রই একরকম।

বড়েভাই শুয়ে পড়তেই আয়নাটা দেওয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে দিয়ে আমি পরিতোষের পাশে এসে বসলুম। দেখলুম, লোকটা বার পাঁচ-সাত পাশ-বালিশ জড়িয়ে এপাশ-ওপাশ ক'রেই একবার চিত হয়ে স্থির হয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়ল দেখে আমরা আমাদের বিছানার চাদরটা টেনে-টুনে ঠিক ক'রে পেতে শুয়ে পড়বার আগে দুজনে দুটো বিড়ি ধরিয়ে টানতে আরম্ভ করলুম।

বিড়ি টানছি আর ফিসফিস ক'রে কথা বলছি। পরিতোষ বলতে লাগল, এই মালকে নিয়ে রাত কাটানোর চেয়ে আবার সরাইয়ে ফিরে যাই চল্। বাবা, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো।

আমি বললুম, কাল দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা ক'রে যা করবার করা যাবে।

পরিতোষ বললে, আমি বিশুদাকে বলব।

আমাদের কথাবার্তা চলছে, এমন সময় বড়কর্তা ঘুমের ঘোরেই চিৎকার ক'রে উঠলো, মারুঙ্গা শালেকো বিছুয়া—একদম জান্‌সে মার দুঙ্গা।

চম্‌কে উঠে একটু দূরে স'রে গেলুম। তারপর ছুরি মারব, কাটারি মারব, জ্যান্ত পুঁতে ফেলব প্রভৃতি ভয়ানক ব্যঞ্জনাপূর্ণ হুঙ্কার চলল প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক। আমরা তো কাঠ হয়ে দেওয়াল ঘেঁষে ব'সে রইলুম।

চিৎকার থেমে গেলে কোনও আওয়াজ না ক'রে সন্তর্পণে লেপ চাপা দিয়ে শুয়ে পড়া গেল। কিন্তু আধ ঘণ্টা যেতে-না-যেতে বড়কর্তার নাকডাকা শুরু হ'ল। বাপ রে! সে কি আওয়াজ! বিছুয়া মারুঙ্গা, জিন্দা গাড় দুঙ্গা প্রভৃতি গর্জন তার কাছে কিছুই নয় বললেই চলে। তাও যদি একটানা নাকডাকা হয় তো সে কোনরকমে সহ্য করা চলে। এ যেন থেকে-থেকে মনে হতে লাগল, কে যেন তার গলাটা টিপে দম বন্ধ ক'রে মারছে। এ শ্রেণীর বিপদে এর আগে কখনও পড়ি নি। ঠায় জেগে ব'সে থাকতে থাকতে স্রেফ ক্লান্তিতে শেষরাত্রের দিকে একসময় কখন ঘুমিয়ে পড়লুম।

ভোর হতে-না-হতে অন্য দিনের মতন দিদিমণি ঘরের মধ্যে এসে চেঁচামেচি জুড়ে দিলে, কি রে? এখনও ঘুমুচ্ছিস, ওঠ্ ওঠ্।

সারারাত জেগে মাথা তখনও অসম্ভব ভারী বোধ হচ্ছিল, তবুও দিদিমণির আওয়াজ পেয়ে উঠে বসলুম। দিদিমণি আমাদের বিছানার কাছে এসে বললে, কি রে, এখনও শুয়ে? শরীর ভালো তো?

তারপরে আমাদের লেপের একধারটা তুলে বিছানায় বসতে গিয়েই বললে, এ কিসের দাগ রে! এত রক্ত এল কোথা থেকে?

বড়কর্তা কোন্ ভোরে উঠে চ'লে গিয়েছিল, তা আমরা জানতেও পারি নি।

আমরা প্রথমটা কোনও কথাই বলতে পারলুম না। দিদিমণি আবার বললে, এ তো রক্তের দাগ দেখছি!

পরিতোষ চুপ ক'রে রইল। আমি গতরাত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত আস্তে আস্তে তাকে খুলে বললুম। সে-ইতিহাস শুনতে শুনতে দিদিমণির মুখখানা লাল হয়ে উঠল। বোধ হয় মিনিট-পাঁচেক চুপ ক'রে থেকে সে বললে, ললিত ও সুদনের পেছনেও ও ওইরকম ক'রে লাগত।

আমরা আর কোন কথা না ব'লে চুপ ক'রে রইলুম। দিদিমণি আমাদের বিছানায় না ব'সে একটু দূরে মেঝের ওপরেই ব'সে পড়ল।

সব চুপচাপ। বাইরের ছাতে কুয়াশা ও সূর্যকিরণের জাল-বোনা চলেছে, সেই দিকে চেয়ে আছি—চোখ দেখছে এক, মন ভাবছে আর। এমন সময় চমক ভাঙিয়ে দিয়ে দিদিমণি অতি করুণস্বরে বললে, আমাকে একবার খবর দিতে পারলি নে?

বললুম, ঘর থেকে বেরুতেই পারলুম না।

দিদিমণি ম্লানমুখে আরও কিছুক্ষণ ব'সে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তার পর চিৎকার ক'রে ডাকতে আরম্ভ করলে, শঙ্কর, ভরত, আহিয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

দেখতে দেখতে বাড়িসুদ্ধ ঝি, চাকর, ঠাকুর, পাহারাদার, এমনকি গরুর চাকরেরাও পর্যন্ত এসে দাঁড়াল। দিদিমণি পাগলের মতো হিন্দী-উর্দুতে কি-সব বলতে লাগল তাদের। তার পরে ছুটতে ছুটতে বিশুদার ঘরে গিয়ে চেঁচাতে আরম্ভ ক'রে দিলে—তার কিছু বুঝলুম, কিন্তু অনেক কথাই বুঝতে পারলুম না। একটা কথা বার বার শুনতে পেলুম, আজ বাবুজী আসুন।

চাকরবাকর সব সন্ত্রস্ত হয়ে চারিদিকে দৌড়ঝাঁপ করতে লাগল, আর আমরা দুটিতে সেই রক্তাক্ত বিছানায় ব'সে ব'সে দুধ আর জিলিপির অপেক্ষা করতে লাগলুম।

ওদিকে রোদ উঠে গেল। ব'সে ব'সে দেখছি, চাকরেরা ছাতের ওপর দিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে, কোথায় বা দুধ আর কোথায় বা গরম জিলিপি! অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে কিছুই এল না দেখে বিশুদার ছাতে গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল।

আমাদের দেখে বিশুদা বললে, শুনলুম কাল রাতে আমার বড়ভাইটা এসে খুব হাঙ্গামা মাচিয়েছিল। দিদিমণি তো ক্ষেপে আগুন হয়ে গিয়েছে, সকালবেলা এসে আমাকে খুব গালিগালাজ ক'রে গেল।

বিশুদার আড্ডায় লোক-সমাগম হতে আরম্ভ হ'ল। সেই বিড়ির শ্রাদ্ধ আর 'ছোটেসাহেব' 'ছোটেসাহেব'।

সেদিন লক্ষ্য করলুম, বিশুদার অনেক বন্ধুর সঙ্গেই পরিতোষের বেশ ভাব জমেছে। এই ক'দিনের মধ্যে সে-ও হিন্দী উর্দু বলতে আরম্ভ করেছে। তার উর্দু বলবার ভঙ্গী শুনে আমার হিংসে হতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে আমাদের দুজনের জন্যে দু-কাপ চা নিয়ে আহিয়া এসে হাজির হ'ল। চা-পান হওয়ামাত্র আহিয়া বললে, তোমায় ভেতরে ডাকছে।

আহিয়া চ'লে গেল। বিশুদা আমাকে বললে, দিদিমণিকে তোমাদের আলাদা ঘর ক'রে দিতে বলবে। নইলে আমার বড়ভাইটা সুবিধের লোক নয়। নেশার ঝোঁকে হয়তো সত্যি-সত্যিই কোন্‌দিন বিছুয়া মেরে দেবে! নেশাখোরকে বিশ্বাস নেই।

জিজ্ঞাসা করলুম, বড়দা কি নেশা করেন?

বিশুদা সেলাই থামিয়ে মুখ তুলে বললে, জিজ্ঞাসা কর যে, কি নেশা করেন না! ভোরবেলা থেকে ঠাররা (দিশী মদ) তো লেগেই আছে। তার ওপরে গাঁজা, আফিম, চরস ও কোকেন রোজ চাই। তা ছাড়া বাবুজীর দাওয়াখানায় আরও কত রকমের নেশার জিনিস আছে, তার সব নাম আমার জানা নেই। ও একটা ভয়ানক লোক, সাপের বিষ পেলে চেটে লিতে পারে—

আমাদের কথাবার্তা চলছে, এমন সময় আহিয়া আবার এসে বললে, তোমাদের দুজনকেই ভেতরে ডাকছে।

বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখলুম, দিদিমণির ঘরের সঙ্গে একেবারে লাগা একখানা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর থেকে মালপত্র বের ক'রে সেটা ধোয়া-পোঁছা হয়েছে। ভরত, শঙ্কর ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। দিদিমণি গাছকোমর বেঁধে একধারে দাঁড়িয়ে হুকুম চালাচ্ছে।

ইতিমধ্যে দুখানা খাট পেতে তার ওপরে বিছানা পাতা হয়েছে। একটা

নতুন 'ডিট্‌মার'-এর দেওয়ালগিরি ও একখানা বড় চৌকোণা আয়না দেওয়ালে টাঙানো হয়েছে। একধারে একটা বেঁটে সুদৃশ্য দেরাজ। দিদিমণি দেরাজটা দেখিয়ে বললে, এর মধ্যে তোমরা কাপড়-চোপড় রাখবে। তারপর বললে, কেমন, ঘর পছন্দ হয়েছে ?

বললুম, চমৎকার ঘর !

দিদিমণি ভরত ও শঙ্করকে বললে, মেঝেতে একটা নতুন দরি পেতে দাও।

তারপরে আমার হাত ধ'রে পরিতোষকে বললে, আয় আমার ঘরে।

নিজের ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়ে দিদিমণি একটা বড় আলমারি খুললে। দেখলুম, আলমারির মধ্যে থাকে থাকে বোধ হয় পঞ্চাশটা হাত-বাক্স সাজানো রয়েছে। দিদিমণি বললে, দেখ্। এগুলোর মধ্যে সব গয়না আছে। আমাদের বাবার ঠাকুরমা থেকে আমার পর্যন্ত এই চার পুরুষের গয়না। দু-তিন মাস অন্তর এই বাক্সগুলো খুলে আমি দেখি, সব ঠিক আছে, না, খোয়া গেছে। আজ দুপুরবেলা আর ঘুমোনো হবে না—এগুলো সব দেখতে হবে। এই কথা বলবার জন্যে ডেকেছি তোদের। দুপুরবেলা না ঘুমিয়ে সোজা চ'লে আসবি এই ঘরে, কারুকে কিছু বলিস না যেন।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে দিদিমণির ঘরে গিয়ে ঢুকলুম আর প্রায় গুটিপঞ্চাশেক বাক্সের গয়না মিলিয়ে হিসাব ক'রে যখন তোলা হ'ল, তখন বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। সে বোধ হয় তখনকার দিনের হিসাবে প্রায় লক্ষটাকা দামের গয়না। প্রত্যেকটি হার, বাজু, জশম, রতনচূড় ও কানবালার বিচিত্র ইতিহাস ! এক-একটি গয়না এক-একটি ছোট গল্প। আমি অতি অলস তাই সে-সব কাহিনীর রূপ দিতে পারলুম না, না হ'লে সে গয়নার বাক্সগুলোর ওপরেই একটা বড় সাহিত্য রচিত হতে পারত। অতীত দিনের কত হাসি ও অশ্রু যে সেগুলোর সঙ্গে জড়িত, সেদিন হাল্‌কা হাসির সঙ্গে যে রূপকথা শুনেছিলুম, তার কিছু মনে পড়ছে কিছু পড়ছে না। পরিতোষও বেঁচে নেই যে, তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জন করতে পারি। একটা কাহিনীর কথা আজও মনের মধ্যে জলজল করছে, সেই কথাই উল্লেখ করছি।

একটা ছোট হাত-বাক্স থেকে একটা হার বের ক'রে দিদিমণি দাঁড়িয়ে উঠে হারছড়া নিজের গলায় ঝুলিয়ে দিলে। দেখলুম হারগাছা প্রায় তার পা অবধি লুটিয়ে পড়ল। দিদিমণি ব'সে গলা থেকে হারটা খুলে আমাকে বললে, এটা কতদিনের পুরনো বলতে পারিস ?

গয়না সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত অজ্ঞ ছিলুম, আজও সেই অজ্ঞতা কেটেছে এমন কথা বলতে পারি নে। আমার মা'র কানের ডিম থেকে ডগা অবধি প্রতি কানে পাঁচটা ক'রে ফুটো ছিল, কিন্তু একটা ফুটোতেও কখনও দুল, মাকড়ি কিংবা টাপ কোনদিন দেখি নি, তার কারণ তাঁর জোটে নি। দু-হাতে চারগাছা ক'রে চুড়ি আর এক হাতে একটা একপয়সা দামের লোহা, এই ছিল তাঁর অলঙ্কার। আমরা লায়েক হয়ে মা'র লোহা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলুম। দু-তিনগাছা হার তৈরি করিয়েছিলেন, কিন্তু তা পরত মেয়েরা। আমার অন্য মা (পিসীমা) ছিলেন বিধবা, তাই গয়নার বালাই তাঁর অঙ্গে ছিল না। আমার বড়দির স্বামী সে-যুগে ন'-শো টাকা মাইনে পেতেন, যার দাম আজকের দিনে অন্তত পাঁচ হাজার টাকা। দিদির অঙ্গেও চারগাছা ক'রে চুড়ি, দুগাছা অমৃতি-পাকের বালা, গলায় একটা চিক্‌চিকে সরু হার, কানে দুটো টাপ, আর বাঁধানো লোহা—আজকের দিনে সোনার দাম পাঁচ গুণ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও অতি গরিব ঘরেও যা তুচ্ছ ব'লে বিবেচিত হয়, তা ছাড়া আর কোনও গয়না তাঁর অঙ্গে দেখি নি। আমাকে গয়না সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করা বৃথা। সেই হারগাছার রঙ মলিন হয়ে গেলেও বুঝতে পারলুম, সেটা সোনার বটে, কারণ সোনা ছাড়া যে ভদ্রলোকের মেয়ের গয়না হয় না সে-জ্ঞান ছিল টন্‌টনে।

হারগাছা আমার হাতে দিয়ে দিদিমণি বললে, ওজনটা দেখ্।

আমার মনে হ'ল, সেটা প্রায় আধ সের ভারী হবে। কিন্তু দিদিমণি বললে, আধ সেরের চেয়েও বেশি। এটার ওজন পঞ্চাশ ভরিরও কিছু বেশি হবে।

দিদিমণি বলতে লাগল, এই হারগাছা আমার ছোট্‌ঠাকুমা'র অর্থাৎ বাবুজীর ছোটকাকীর। বাবুজীর ঠাকুরদাদা নিমকির দেওয়ানি, কমিসারিয়টে চাকরি ও নানারকম ব্যবসা ক'রে অনেক টাকা রোজগার ক'রে পশ্চিমে বড় জমিদারি করেছিলেন। অবশ্যি তাঁর বাবাই প্রথমে পশ্চিমে আসেন, ইংরেজ তখনও এ-দেশের রাজা হয় নি।

বাবুজীর ঠাকুরদা চারটে নাবালক ছেলে রেখে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেই মারা যান। আমাদের বড়মা'র বয়স বোধ হয় তখন ত্রিশ হবে। সেই থেকে তিনি নিজের হাতে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে জমিদারি চালাতে লাগলেন। ছেলেরা বড় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে একে একে তাদের বিয়ে দিয়ে বউ আনলেন। কিন্তু ছোট ছেলের বিয়ে আর দিতে পারেন না। সবার ছোট

হওয়ার ফলে আদর পেয়েছিলেন তিনি বেশি। তাই দাদাদের ও মায়ের আদরে তাঁর দেহ যেমন বাড়ল, বিদ্যে-বুদ্ধি সেই অনুপাতে কিছুই হ'ল না। অনেক ঘটক-ঘটকী লোকজন লাগানোর পর বাংলাদেশের এক ব্রাহ্মণের ঘরে ছোট্‌ঠাকুরদার বিয়ের ঠিক হ'ল। কুলীন তাঁরা, মেয়ের বয়স প্রায় পনেরো, অতি গরিব, তাই পশ্চিমের বড়লোকের মুখ্যু ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হয়েছিলেন তাঁরা।

আমার বড়মা সব ছেলেদেরই পাঠিয়ে দিলেন সেখানে, ছোটভাইয়ের বিয়ে দিয়ে একেবারে বউ নিয়ে যেন চ'লে আসে।

তখনকার দিনে নৌকো ও গাড়ি চ'ড়ে যাতায়াত করতে হ'ত। সেখানে পৌঁছতে প্রায় দু-মাস সময় লাগত।

ছোট্‌ঠাকুমা'র বাপেরা উচ্চ পণ্ডিতের বংশ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গতি ছিল অল্প। তার ওপরে ভদ্রলোক চার-পাঁচটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে এমনিতেই কাত হয়ে পড়েছিলেন। ওদিকে বড়লোকের বাড়িতে মেয়ের সম্বন্ধ হয়েছে। সে-বাড়ির গিন্নীর কড়া মেজাজ ও খাণ্ডারবানিত্বের কিছু কিছু সংবাদও তাঁরা শুনতে না পেয়েছিলেন তা নয়। এদিকে কোনও সঙ্গতি নেই, তার ওপরে এর পরেও আর-একটি মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, যদিও সে তখনও নেহাত শিশু। ভাবনা-চিন্তায় ভদ্রলোক একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেলেন।

তাঁরা ছিলেন শাক্ত। পুরুষানুক্রমে বাড়িতে সাড়ে-তিন হাত উঁচু অষ্টধাতুর এক কালীমূর্তি পূজিতা হতেন। আর কোন উপায় না দেখে তিনি গৃহবিগ্রহের পায়ের ওপর প'ড়ে বললেন, মা গো! বংশপরম্পরা ধ'রে আমরা তোর সেবা ক'রে আসছি, কখনও তোর কাছে কোনও ভিক্ষে চাই নি। এবার আমায় উদ্ধার কর্, নইলে তোর পায়ের তলায় প'ড়ে না-খেয়ে মরব।

সেই রাত্রে মা তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, দেখ্, আমার গলায় যে লম্বা হারগাছা আছে, সেইটে ভাঙিয়ে মনোজবার গয়না গড়িয়ে দে। আমার ছোট্‌ঠাকুমা'র নাম ছিল মনোজবা।

বিয়ের দিন ভদ্রলোক আমার বড়ঠাকুরদা অর্থাৎ আমার বাবার বাবার হাতে এই হারছড়া দিয়ে বললেন, আমার আর সঙ্গতি নেই; আপনারা বড়লোক, যদি ইচ্ছে হয় তো ভাদ্রবউকে এইটি ভেঙে গয়না গড়িয়ে দেবেন, নয়তো নিজেদের গৃহবিগ্রহের গলায় ঝুলিয়ে দেবেন।

আমার ঠাকুরদা ছিলেন ভালো লোক আর ছোট্‌ঠাকুমা ছিলেন অপূর্ব

সুন্দরী। মেয়ে দেখে তাঁরা আর কোনও আপত্তি না ক'রে ছোটভাইয়ের বিয়ে দিয়ে বউ ও তার সঙ্গে এই হারগাছা নিয়ে বাড়ি চ'লে এলেন।

আগেই বলেছি, বড়মা'র ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ ও বচন ছিল অতি কঠিন। বউরা শাশুড়ীর ভয়ে একেবারে তটস্থ থাকতেন। ছোট্‌ঠাক্‌মা বাড়িতে পা দিতে-না-দিতে তাঁর বাপের বাড়ির দারিদ্র্য উল্লেখ ক'রে তিনি খোঁটা দিতে শুরু করলেন। অথচ আমরা মায়ের কাছে শুনেছি যে, আমাদের বড়মা'র বাপেরা এত গরিব ছিল যে, তাঁকে টাকা দিয়ে কিনে আনতে হয়েছিল, সেই ছোটলোকের ঘরের মেয়ে নিয়ে আসার ফলে আমাদের এতবড় বংশ লোপ হয়ে গেল।

যা হোক, ছোট্‌ঠাক্‌মা ছিলেন খাস বাংলাদেশের মেয়ে। মাস-কয়েকের ভেতরেই তিনি বাড়ির বউদের মধ্যে এমন একটা স্বাধীনতার আবহাওয়া এনে ফেললেন যে, তারা শাশুড়ীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটু-আধটু প্রতিবাদ করতে শুরু ক'রে দিলে।

আমাদের ছোট্‌ঠাকুরদা ছিলেন অতিশয় ভীরুপ্রকৃতির লোক। তিনি না পারতেন মা'র বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে, না পেরে উঠতেন স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে।

শেষকালে কোনও উপায় না দেখে সে-বেচারী প্রাণের দায়ে আত্মরক্ষার জন্যে এক সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে গেরুয়া বসন প'রে বাড়ির এক কোণে নিরালা একখানা ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এজন্যে বড়মা ছোট্‌ঠাক্‌মা'র ওপর আরও চ'টে গেল। দিনরাত ঝগড়াঝাঁটি, বাড়ি একেবারে অশান্তির আগার হয়ে উঠল। সারাদিন ধ'রে বাড়ির গিন্নী ছোটবউয়ের নামে ছেলেদের কাছে নালিশ করেন ; ওদিকে সারারাত ধ'রে বউয়েরা নিজেদের স্বামীর কাছে বলতে থাকে, ছোট যা করে ঠিকই করে। অন্য বউ হ'লে তোমাদের মাকে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিত। বিষয় তোমাদের, তোমার মায়ের নয়।

মাঝে থেকে স্বামীদের জীবন হয়ে উঠল অতিষ্ঠ।

ছোট্‌ঠাকুরদার সঙ্গে কারুর সম্পর্ক নেই। তিনি দিনরাত নিজের ঘরে জপতপ করেন, কিন্তু ছোট্‌ঠাক্‌মা'র কাছে তাঁর ওসব বুজরুগি চলত না। তিনি স্বামীকে বলতেন, ওসব ভণ্ডামো তোমার মায়ের সঙ্গে চালিও, সন্ন্যেসী হবার ইচ্ছে ছিল তো বিয়ে করেছিলে কেন ?

ছোট্‌ঠাক্‌মা রোজ রাত্রি দশটার সময় জোর ক'রে ছোট্‌ঠাকুরদার ঘরে ঢুকে

কোনদিন মাঝরাত্রে আর কোনদিন-বা সারারাত্রি ধ'রে তাঁর স্বর্গে যাবার পথ পরিষ্কার ক'রে তবে বেরুতেন।

এইরকম দশ-পনেরো বছর চলবার পর একবার ছোট্‌ঠাকুমা'র বাপের বাড়ি থেকে দুখানা চিঠি এল—একখানা তাঁর নামে আর একখানা বড়মা'র নামে। তাঁরা লিখেছেন, ছোট বোনের বিয়ে, যদি আসতে পার তো সুখী হব। তুমি বড় ঘরের বউ হয়েছে, এর চেয়ে বেশি অনুরোধ করা আমাদের শোভা পায় না।

ছোট্‌ঠাকুমা বললেন, বাপের বাড়ি যাব।

বড়মা বললেন, বাপের বাড়ি থেকে চিঠি এলেই কি সেখানে যেতে হবে নাকি? অত আবদার চলবে না।

ছোট্‌ঠাকুমা কোন কথা না ব'লে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

বড়মা বললেন, মরুক্‌গে, আমি ছেলের আবার বিয়ে দেব।

ছোট্‌ঠাকুমা সেই যে গিয়ে বিছানায় শুলেন, সাত দিন না-খাওয়া না-কিছু।

আমার ছোট্‌ঠাকুরদা উদাসীন। স্ত্রী খেলে কি না-খেলে সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। প্রতিদিন নিজের খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে গিয়ে যথারীতি দরজা দিতে লাগলেন, একবার স্ত্রীর ঘরে উঁকি মেরেও দেখেন না, লোকটা ম'রে গেল কিনা!

আমার নিজের ঠাকুরদার নাম ছিল সদাশিব, চরিত্রেও ছিলেন তিনি সদাশিব। বাড়ির ছোটবউ না খেয়ে শুকিয়ে মরছে, বাড়িসুদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ মিলে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন লোক সকলেই উদাসীন, শুধু মেজো-ঠাকুরদার দুই ছেলে দিনরাত ছোটকাকীর মাথার দু পাশে ব'সে হাওয়া করছে আর কাঁদছে। আর কেউ সেদিকে উঁকি মেরেও দেখে না। বাড়ির গিন্নী তো গৃহদেবতার কাছে দু-বেলা মানত করছেন, নারায়ণ, এই যেন ওর শেষ শোওয়া হয়।

এইরকম চলেছে; এমন সময় একদিন রাত-দুপুরে আমাদের বড়ঠাকুরদা অর্থাৎ আমার নিজের ঠাকুরদা স্ত্রীর মুখে সব শুনে তখুনি স্ত্রীর সঙ্গে ছুটলেন ছোটবউয়ের ঘরের দিকে। ঘরে ঢুকে ভাদ্দর-বউকে নিজের হাতে বিছানায় বসিয়ে আদর করতে করতে বললেন, মা-লক্ষ্মী! তুমি আমার কুলবধূ। এরকম ক'রে না খেয়ে মরলে যে আমার অকল্যাণ হবে, মা। কি চাই তোমার, আমাকে বল।

ছোট্‌ঠাকুমা'র অবস্থা তখন খারাপ। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আমার ছোট বোনের বিয়ে, আমি বাপের বাড়ি যাব।

ঠাকুরদা বললেন, এই কথা তা আমাকে এতদিন জানাও নি কেন মা? আমি তোমায় নিজে নিয়ে যাব সেখানে; তুমি খাওয়া-দাওয়া কর।

সেই রাতে একটু একটু ক'রে গরম দুধ খাইয়ে ছোট্‌ঠাকুমাকে চাঙ্গা ক'রে তিনি নিজে তাঁকে কোলে ক'রে তুলে নিয়ে এসে নিজের ঘরের বিছানায় শুইয়ে কয়েক দিন শুশ্রূষা ক'রে তাঁকে সুস্থ ক'রে তুললেন।

এদিকে বাড়িময় ঢিঢি-ছিছি প'ড়ে গেল। ভাশুর হয়ে ভাদ্দর-বউয়ের অঙ্গ স্পর্শ করার জন্যে মেয়ে-মহলে শুরু হ'ল তুমুল আন্দোলন, এই আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন বাড়ির গিন্নী—আমাদের বড়মা।

বড়মা ছোট ছেলের কাছে গিয়ে-গিয়ে তাঁর স্ত্রী ও নিজের বড় ছেলের নামে মিলিয়ে বানিয়ে-বানিয়ে যা-তা কুৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু ছোটকর্তা নির্বিকার, মুখে ভালোমন্দ কোনও কথা নেই, নির্দিষ্ট সময়ে স্নান ও আহার সেরে তিনি প্রতিদিন যথাসময়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা দিতে লাগলেন।

দিন-কয়েকের মধ্যে ছোট্‌ঠাকুমা বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন। নৌকো ঠিক হয়ে গেল। সন্ধ্যাকালে যাত্রার শুভমুহূর্ত।

যাত্রার দিন সকালবেলা স্নান ক'রে ছোট্‌ঠাকুমা গিয়ে ঢুকলেন ছোট্‌ঠাকুরদার ঘরে। সেই যে দরজা বন্ধ হ'ল, আর সারাদিন খুলল না, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছোট্‌ঠাকুমা সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমার নিজের ঠাকুরমা, ঠাকুরদা আর ছোট্‌ঠাকুমা সন্ধ্যা উতরে যাবার পরই বেরিয়ে পড়লেন নৌকোয় সুদূর বাংলাদেশের এক গ্রামের উদ্দেশে, প্রকৃতি অনুকূল হ'লেও যেখানে পৌঁছতে সেকালে অন্তত চল্লিশ দিন লাগত।

যা হোক, ছোট্‌ঠাকুমা তো বাপের বাড়ি পৌঁছলেন, তখনও তাঁর বোনের বিয়ের আট-দশ দিন দেরি আছে। ছোট বোনের বিয়ে, তাই সব বোনেরাই বাপের বাড়িতে এসে জুটেছিল। গরিবের ঘরে আনন্দ-উৎসবের আর অন্ত নেই। কথায় বলে, নদীতে নদীতে মিলন হয়, কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবার পর বোনে বোনে আর মিলন হয় না। তাই এতদিন পর সব বোন একত্র হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণের ঘরে আনন্দের প্রবাহ ছুটল।

এই সময়, বিয়ের বোধ হয় দিন-দুই আগে তাঁদের বাড়িতে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘ'টে গেল। আগেই বলেছি, ছোট্‌ঠাকুমাদের বাড়িতে পূর্বপুরুষের এক কালীঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদিন সকালে তাঁর জেঠামশাই পুজো করতে গিয়ে দেখতে পেলেন, ঠাকুরানীর গলায় সেই সোনার হারগাছা ঝুলছে,

অনেকদিন আগে ছোট্‌ঠাক্‌মা'র বিয়ের জন্যে যেটিকে তাঁর গলা থেকে খুলে নেওয়া হয়েছিল।

সংবাদ পেয়ে দেশসুদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ ছুটে এল তাঁদের বাড়িতে। সবাই সে-কাণ্ড দেখে অবাক, তারস্বরে সবাই চিৎকার করতে লাগল, জয় মা কালী! এমন জাগ্রত দেবী কালীঘাটেও নেই।

সেদিন গভীর রাত্রে ছোট্‌ঠাক্‌মা'র বাবা তাঁকে ঘুম থেকে তুলে আড়ালে ডেকে নিয়ে বসলেন, মনোজবা, এ-কাজ তুই কেন করলি মা? তোর শাশুড়ী জানতে পারলে তো আমাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে, আর তোমাকেও আস্ত রাখবে না।

ছোট্‌ঠাক্‌মা ন্যাকা সেজে বললেন, কি করেছি বাবা?

সেই হারগাছা এনে তুই মায়ের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিস?

ছোট্‌ঠাক্‌মা বললেন, কে বলেছে এ-কথা! সে-হার তো আমার শাশুড়ীর সিন্দুকে বন্ধ আছে। এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও আমি জানি নে।

আতপচাল আর কাঁচকলা-সেদ্ধ-খেকো বামুনের আর কত বুদ্ধি হবে! ছোট্‌ঠাক্‌মা যা বললেন, তিনি তাই বিশ্বাস করলেন।

এসব গল্প ছোট্‌ঠাক্‌মা আমার বড়ঠাক্‌মা অর্থাৎ আমার নিজের ঠাক্‌মা'র কাছে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন তাঁর বড়বউকে অর্থাৎ আমার মাকে, মা'র মুখে আমরা শুনেছি।

যা হোক, বোনের বিয়ে-টিয়ে হয়ে যাবার পর ছোট্‌ঠাক্‌মা তো শ্বশুরবাড়ি ফিরে এলেন। শাশুড়ীর বিনা হুকুমে বাপের বাড়ি যাওয়ার অপরাধে এখানে নানা ভাবে তাঁর ওপর নির্যাতন শুরু হ'ল। শুধু তিনি নন, তাঁর বড় জা অর্থাৎ আমার নিজের ঠাকুরমাকেও উঠতে-বসতে খোঁটা খেতে হতে লাগল। বড়মা এবার একটা নতুন চাল চাললেন। তিনি মেজো ছেলে ও মেজো বউকে বড় ছেলে ও বড় বউয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে আরম্ভ ক'রে দিলেন।

ওদিকে অসম্ভাবিতরূপে হার ফিরে আসার ব্যাপারকে উপলক্ষ্য ক'রে ছোট্‌ঠাক্‌মা'র বাপের বাড়ির অবস্থার হু-হু ক'রে উন্নতি হতে লাগল। দেখতে দেখতে চারিদিকে এই ঘটনার কথা পল্লবিত হয়ে রটতে লাগল। দূর-দূরান্তর থেকে লোক এসে এ-হেন জাগ্রত কালীর পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে মুঠো-মুঠো টাকা দিয়ে পুজো দিতে লাগল। যে দেবী সর্ববসনবিবর্জিতা হয়ে নিজের শিবকে পদদলিত করেছেন, নরকপাল যাঁর গলায়, যিনি কপালকুণ্ডলা, সামান্য

দিয়ে-দেওয়া সোনার হারের প্রতি তাঁর কখনও কোন লোভই থাকতে পারে না— এ-কথালোকে বুঝতে পারলে না।

মাস-ছয়েক এইভাবে কেটে যাওয়ার পর একদিন এদিকে আসল কালী জাগ্রতা হলেন। মেজ্‌ঠাকমা ছিলেন বড়মা'র গুপ্তচর। তিনি একদিন কার কাছে সন্ধান পেয়ে শাশুড়ীকে গিয়ে লাগিয়ে দিলেন, ছোটবউ বাপের বাড়িতে সেই হারগাছা ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে।

আর যায় কোথা! বাড়িতে একেবারে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। বড়মা ছোট্‌ঠাক্‌মা'র মা-বাপ তুলে যাচ্ছেতাই ক'রে গালাগালি আরম্ভ করলে। সেই সঙ্গে আমার নিজের ঠাক্‌মাকেও গালাগাল দিতে লাগল। ছোট্‌ঠাক্‌মা'র দলে রইল বড়্‌ঠাক্‌মা অর্থাৎ আমার নিজের পিতামহী আর ওদিকে বড়মা আর মেজ্‌ঠাক্‌মা।

বড়মা ছোট্‌ঠাক্‌মাকে বলতে লাগল, তোকে জুতিয়ে বাড়ি থেকে বের ক'রে দেব।

ছোট্‌ঠাক্‌মা বললে, কার বাপের সাধ্যি আমাকে জুতিয়ে বার করে একবার দেখি! আমি আমার স্বামীর ভাত খাই। কোনও ছোটলোকের মেয়ের ভাত খাই না।

ঝগড়ার সময় বড়মা'র কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মেজ্‌ঠাকুরদা। ছোট্‌ঠাক্‌মা'র মুখে এই কথা শুনে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, আমার মাকে অপমান করলে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব, ওসব ভাদ্দরবউ-টউ মানব না।

একটু দূরেই ছিলেন সেজ্‌ঠাকুরদা, তিনি বললেন, মেজদা, ওসব মেয়েমানুষের ঝগড়ায় থেকো না, কি দরকার!

মেজ্‌ঠাকুরদা চেঁচিয়ে উঠলেন, চুপ কর্‌ শুয়োরের বাচ্চা।

সেজো কর্তা বললেন, তোর বাপ শুয়োরের বাচ্চা।

দুই ভাইয়ে খুনোখুনি হয় আর কি! মেজ্‌ঠাক্‌মা মাঝে প'ড়ে তখনকার মতন হাঙ্গামাটা আর হতে দিলেন না।

এদিকে মেজ্‌ঠাক্‌মা'র দুটো ছেলে ছিল ছোট্‌ঠাক্‌মা'র ন্যাওটো। তিনি এ-বাড়িতে যখন বউ হয়ে এসেছিলেন, তখন তাদের একটার বয়স ছিল পাঁচ আর একটার দুই, সেই থেকে ছোট্‌ঠাক্‌মাই তাদের মানুষ ক'রে তুলেছিলেন, ছোটমাকেই তারা মা ব'লে জানত। এই ব্যাপারের সময় তাদের একজনের আঠারো-উনিশ বছর বয়স, সে কলেজে পড়ে; আর একজনের একটা পাস

দেবার সময় হয়েছে। ছোটমায়ের এই লাঞ্ছনা দেখে তারা দুই ভাইয়ে নিজের বাপ ও ঠাকুরমা'র সঙ্গে লাগিয়ে দিলে বচসা। আমার বাবা ও নিজের কাকাদের তখন বেশ বয়স হয়েছে। বাবার বিয়ে পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে, মা তখন কনে-বউ।

মেজ্‌ঠাকুরদা নিজের ছেলেদের ওইরকম ঔদ্ধত্য দেখে তেড়ে এসে তাদের আক্রমণ করলেন। ছোট্‌ঠাকুমা তাদের বাঁচাতে গিয়ে ভাশুরের হাতে দু-চারটে চড়-চাপড়ও খেলেন। বড়মা তারস্বরে চিৎকার ক'রে আমাদের ঠাকুমা ও ছোট্‌ঠাকুমার চোদ্দপুরুষ তুলে গালাগালি দিতে আরম্ভ করলেন।

আমার নিজের কাকারা এতক্ষণ নিরপেক্ষই ছিলেন। কিন্তু বড়মা যখন তাঁদের মাকেও যাচ্ছেতাই ক'রে গালিগালাজ করতে আরম্ভ করলেন, তখন তাঁরাও ক্ষেপে গিয়ে তাঁদের ঠাকুরমাকে বললেন, খবরদার বুড়ী! আমাদের মাকে গালাগালি করলে জুতো মেরে বাড়ি থেকে বের ক'রে দেব।

সে এক বীভৎস কাণ্ড!

যাক, তখনকার মতন হাঙ্গামা থেমে গেল বটে, কিন্তু তাঁরা স্থির করলেন, আর এক-অন্নে থাকবেন না, বিষয় যে-যার আলাদা ক'রে নেবেন।

আদালতে দরখাস্ত পেশ করা হ'ল, বিষয় চার সমান ভাগে বিভক্ত ক'রে দেবার জন্যে। সেই সঙ্গে ছোট্‌ঠাকুমাও দরখাস্ত পেশ করলেন যে, তাঁর স্বামী পাগল, স্বামীর বিষয় তিনি তদারক করবেন।

বড় ও সেজো ভাই সাক্ষ্য দিলেন, ছোটবউ যা বলছেন তা সত্য এবং তাঁদের মতে এ-ব্যবস্থা ভালোই হবে। ছোটকর্তা কিন্তু নির্বিকার।

মেজ্‌ঠাকুরদা মায়ের প্ররোচনায় ছোট্‌ঠাকুমা'র দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপত্তি ক'রে এক দরখাস্ত পেশ করলেন। মামলা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল।

এইরকম ব্যাপার চলেছে, এমন সময় আমার বাবা চাকরি পেয়ে মাকে নিয়ে চ'লে গেলেন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশে।

দেখতে দেখতে মামলা খুবই প্যাঁচালো হয়ে উঠল। হাঁড়ি সব আলাদা হয়ে গেল। বাড়িতে পুষ্যির দল ছিল অগুন্‌তি, তারা কেউ এর দলে, কেউ ওর দলে ভিড়ে পড়ল। নগদ টাকা, সব বউয়ের গয়নাগাঁটি তখনও বাড়ির গিন্নীর কবলে। মেজ্‌ঠাকুরদার উকিলরা এসে গিন্নীর সঙ্গেই পরামর্শ করে। মেজো-কর্তার দুই ছেলে তাদের নিজেদের বাপ-ঠাকুমা ছেড়ে তাদের বড়মা, সেজোমা ও ছোটমা'র—অর্থাৎ আমার ঠাকুমা, সেজঠাকুমা ও ছোট্‌ঠাকুমা'র দলে, সেখানেই তাদের খাওয়াদাওয়া শোওয়া।

এইরকম জমজমাট ব্যাপার চলেছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন দুপুরবেলায় কোথা থেকে ছোট্ঠাকুমা'র বাবা এসে হাজির হলেন। কি ব্যাপার! কথায়-বার্তায় জানতে পারা গেল, এই হারগাছার জন্যে তাঁর বেয়ান যাচ্ছেতাই ক'রে গালাগালি দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন, তাই তিনি সেটা নিজে নিয়ে এসেছেন ফিরিয়ে দেবার জন্যে।

বড়মাকে হারগাছা ফিরিয়ে দিয়ে তিনি এ-বাড়িতে জলগ্রহণ না ক'রে ধুলো-পায়েই বিদায় নিলেন। যাবার আগে ছোট্ঠাকুমা'র সঙ্গে তাঁর কি কথা হ'ল, এ-বাড়ির কেউ জানে না।

এদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে শহরের অন্য এক বাঙালী ব্রাহ্মণের বাড়িতে দিন-দুই থেকে তিনি ফিরে গেলেন নিজের দেশে, যাবার আগে মেয়ের সঙ্গে একবার দেখাও করলেন না।

এই ব্যাপারের বোধ হয় দিন-তিনেক বাদে একদিন সকালবেলা উঠে দেখা গেল, ছোট্ঠাকুমা বাড়িতে নেই। তিনি দুখানা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন —একখানা তাঁর বড় জা অর্থাৎ আমার পিতামহীকে আর একখানা তাঁর স্বামীকে।

স্বামীকে লিখেছিলেন, আমাকে এমন অপমান করবার যদি ইচ্ছা ছিল তো আমাকে বিয়ে করেছিলে কেন? তোমার মতন অপদার্থকে আমি স্বামী ব'লে স্বীকার করি না, আমি তোমাকে ত্যাগ করলুম।

আমার ঠাকুমাকে লিখেছিলেন, তোমাদের সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে। এ-বাড়ির মধ্যে তোমাদের স্নেহ-ভালবাসাই আমার মনে সঞ্চিত হয়ে রইল। আমার দুই ছেলে নরেন আর সুরেন—অর্থাৎ আমার মেজ্ঠাকুরদার দুই ছেলে—তাদের তোমরা দেখো, এই আমার শেষ অনুরোধ। আমাকে ভালবাসে ব'লে তাদের অশেষ দুর্গতি হ'ল। তোমরা দুজনে আমার প্রণাম গ্রহণ কর। আমার বউমা—অর্থাৎ আমার মা—তাকে আমি আশীর্বাদ ক'রে যাচ্ছি, সে সুখী হবে। আমার আশীর্বাদ নিষ্ফল হবে না। আমার খোঁজ ক'রো না। কারণ তোমাদের মতন ছোটলোকের ঘরে আমি আর পদার্পণ করব না।

দিদিমণি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, আমার ছোট্ঠাকুমা'র যখন বিয়ে হয়, তখন তাঁর পনেরো বছর বয়েস ছিল, আর যখন তিনি চ'লে গেলেন তখন তাঁর বয়েস ছত্রিশ। এই একুশ বছর একাধারে স্বামীর অবহেলা ও শাশুড়ীর গঞ্জনা সহ্য করতে করতে শেষকালে অসহ্য হওয়ায় অভিমানে তিনি গৃহত্যাগ

ক'রে চ'লে গেলেন। তিনি সুন্দরী ছিলেন বটে, কিন্তু ছত্রিশ বছর বয়সে সে-সৌন্দর্যের ওপর ভরসা ক'রে কুলত্যাগ করা চলে না। একুশ বছর ধ'রে প্রতিদিনের সঞ্চিত অভিমানের সেই দীর্ঘশ্বাস, সতীলক্ষ্মীর সেই নিদারুণ অভিসম্পাতে দেখতে দেখতে এই বিরাট পরিবার পাত হয়ে গেল।

ছোট্‌ঠাকুমা'র সেই চিঠি প'ড়ে আমার ঠাকুরমা একেবারে বিছানা নিলেন। ঠাকুরদা তাঁকে আশ্বাস দিতে লাগলেন, তুমি কেন অমন করছ? তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই, মেয়েমানুষ সে, যাবে কোথায়? আমি তাকে ঠিক ধ'রে আনব।

আমার দুই কাকা—মেজ্‌ঠাকুরদার দুই ছেলে—তারা ছিল ছোটমা-অন্ত-প্রাণ। তারা প্রতিজ্ঞা করলে, ছোটমাকে যদি কোনদিন পাই তো ঘরে ফিরব, না হ'লে এই শেষযাত্রা—ব'লে তারা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে তাদের বড়মা, অর্থাৎ আমার ঠাকুরমা'র কাছ থেকে টাকাকড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল, আজও তারা বাড়ি ফেরে নি।

আমার বড়মা বললেন, যে মাগী নিজের ভাশুরের সঙ্গে নষ্ট হতে পারে, সে যে কুলত্যাগ করবে তার আর বড় কথা কি!

তার পরে পনেরো বছরের মধ্যে এই সংসার দেখতে দেখতে শূন্য হয়ে গেল। বাড়িতে প্লেগ আসবার আগে বাড়িময় যেমন এখানে-ওখানে মরা ইঁদুর প'ড়ে থাকতে দেখা যায়, ঠিক তেমনিই ভাবে এঘরে-ওঘরে লোক মরতে লাগল।

আমার ঠাকুমা ছোট্‌ঠাকুমা'র সেই চিঠিখানাতে প্রতি রাত্রে একটা ক'রে সিঁদুরের টিপ দিয়ে নমস্কার ক'রে তবে শুতে যেতেন। তিনি মারা যাবার সময় চিঠিখানা আমার মাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। মা-ও তাঁর শাশুড়ীর মতন রোজ সন্ধ্যের সময় সেটাতে সিঁদুরের টিপ দিয়ে পূজো করতেন। আমরা সে-চিঠি দেখেছি, কিন্তু সিঁদুরের ছাপে ছাপে তার অক্ষরগুলো এমনই ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল যে, তার কিছুই পড়তে পারা যেত না।

মা যখন মারা যান, তখন আমি শ্বশুরবাড়িতে। মাথার সিঁদুর খুইয়ে বাড়িতে এসে অবধি আর সেখানা দেখতে পাচ্ছি না।

এই অবধি ব'লে দিদিমণি চুপ করলে।

তখন ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছিল। খোলা জানলাগুলো দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বাইরের সামান্য আলো। দিদিমণি একটা জানলার ভেতর দিয়ে

দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দিলে সুদূর অতীতে—তাদের সংসারের ঘ'টে-যাওয়া ঘটনাগুলির দিকে, আর আমার মন ডুব দিলে সেই অপূর্ব কারুণ্য-রসসাগরের অতল তলে। মনের মধ্যে ছায়াবাজির মতন দিদিমণি-বর্ণিত মুখগুলো একে একে ভেসে উঠতে লাগল। সন্থ-শ্রুত অতীত দিনের কাহিনীগুলি ধীরে ধীরে আমার মানসপটে এসে জমা হতে আরম্ভ করলে। মনে হতে লাগল, তারা যেন সকলেই আমার চেনা, আমি যেন এই পরিবারেরই একজন। গৃহবিগ্রহের তুমুল আলোড়নে আমি যেন একবার এ-পক্ষে একবার ও-পক্ষে আন্দোলিত হচ্ছি। বাড়ির বয়স্কেরা আমাকে তিরস্কার করছেন, তুই ছেলেমানুষ, এ-সবের মধ্যে তুই আসিস নি ; যা, নিজের লেখাপড়া কর্‌গে যা। কিন্তু বয়সে বালক হ'লেও বিধাতার অভিশাপে আমি যে স্থবির, এ-কথা কাকে বোঝাই, কি ক'রে বোঝাই ! আমার মনে হতে লাগল, আমি যেন সেই অভিশপ্ত প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে অতৃপ্ত আত্মার মতন এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে ওখানে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছি, কিন্তু আমার মনের কথা কেউ বোঝে না। সেই ঘটনাস্রোতের ওপরে থেকে-থেকে জলজ্বল ক'রে তাঁরই মুখচ্ছবি ফুটে উঠতে লাগল, যাঁকে কেন্দ্র ক'রে এই অপূর্ব কাব্য রচিত হয়েছে। আমি যেন তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে বললুম, ছোটমা, এদের মাপ কর, সংসারটাকে রক্ষা কর।

আমি স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলুম তাঁর চুম্বন আমার মস্তক, ললাট ও চক্ষুতে। সেই উপেক্ষিতা আহিতাগ্নিকার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর আমার কানে এসে বাজতে লাগল—তোদের সর্বনাশ হবে, তোদের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না।

তাঁর অভিমানসঞ্জাত উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস আমার চোখে মুখে এসে লাগতে লাগল।

সেই নির্মম নিস্তব্ধতার মধ্যে বিশুদার ঘরের আড্ডা থেকে কখনও-বা একটু হাসির টুকরো, কখনও অসংলগ্ন একখণ্ড উচ্চ রব ছিট্‌কে এসে আমাদের তন্মনস্কতায় ধাক্কা দিয়ে-দিয়ে জানিয়ে দিতে লাগল, সে কাহিনী ভেসে গিয়েছে, নিত্য নতুন ঘটনার আবর্ত সৃষ্টি ক'রে কালস্রোত ছুটে চলেছে।

সেইভাবে ব'সে থাকতে থাকতে আমার মাথার মধ্যে সিদ্ধির নেশার মতন চিন্তার তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। আমি স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলুম, আজ যে ঘটনা অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে, একদিন নিশ্চিতরূপে তা ভবিষ্যতের গর্ভে বিরাজ করছিল। এই যে আমি আজ এই সন্ধ্যায় অজানা দেশের এক অপরিচিতা নারীর মুখে তাদের গৃহবিগ্রহের ইতিহাস শুনে মুহ্যমানের

মতন স্থির হ'য়ে ব'সে আছি, এ ঘটনাও একদা ভবিষ্যতের গর্ভে নিশ্চিত ছিল। বর্তমান শুধু ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে ঘটনাবলীকে টেনে এনে অতীতের গর্ভে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে।

সময়ের এই নতুন রূপ মনের মধ্যে নানা ভাবে প্রতিফলিত হতে লাগল। চিন্তার সেই তালগোলের মধ্যেও থেকে-থেকে বুকের মধ্যে কে যেন চিৎকার ক'রে উঠতে লাগল, কিছু নাই, কিছু নাই, সব ঝুটা হ্যায়।

চিন্তা-সাগরের কোন্ অতলে তলিয়ে গিয়েছিলুম তার ঠিক নেই; হঠাৎ শঙ্কর চাকর ঘরের বাতি জ্বেলে দিতেই চটকা ভেঙে গেল।

দিদিমণির দিকে চেয়ে দেখলুম, সেই হারগাছা হাতে নিয়ে অস্বাভাবিক এক দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চেয়ে আছে, পরিতোষ ঘাড় নীচু ক'রে মেঝেতে যেন কি দেখছে। আমার চোখে চোখ পড়তে অদ্ভুত একরকম হাসি হেসে দিদিমণি আবার আরম্ভ করলে—

আমার ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা দু-তিন দিনের তফাতে মারা গিয়েছিলেন। বাবা কর্মস্থান থেকে ছুটি নিয়ে এসে শ্রাদ্ধ-শান্তি সেরে আবার ফিরে গেলেন। যাবার সময় আমার দুই কাকাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, আর এক কাকা বাড়িতে রইলেন আমাদের হয়ে মামলা তদারক করতে, তখনও মামলার কোনও কিনারাই হয় নি।

ভাগ্যে আমরা দূরে চ'লে গিয়েছিলুম! কিন্তু তাতেও কি রক্ষে আছে! আমার দুই কাকা পটপট ক'রে মারা গেলেন। সব ঠাকুরদাদের গুষ্টি সাফ হয়ে যাবার পরও কিন্তু ভূষণ্ডি কাকের মতন বড়মা তখনও বেঁচে রইলেন। তা না হ'লে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কি ক'রে?

এদিকে মামলায় মামলায় বিষয় ফাঁক হয়ে গেল। শেষকালে আমার যে কাকা মামলা তদারকের জন্যে বাড়িতে ছিলেন, তিনি তাঁর ঠাকুরমাকে নিয়ে এক ভাড়াটে বাড়িতে গিয়ে উঠলেন, তাঁদের ভরণপোষণের জন্যে বাবা টাকা পাঠাতে থাকলেন। তখন বড়মা'র বয়স এক-শো চার বছর। তখনও বুড়ী বেশ শক্ত সমর্থ, উঠে হেঁটে বেড়ায়, নিজের রান্না নিজে করে, রাত্রে একটা বড় গয়নার বাক্স পাশ-বালিশের মতন জড়িয়ে শুয়ে থাকে। এই যে-সব গয়না দেখছিস, এ আমাদের ছোটকাকা কিছু কিছু ক'রে আমাদের বাড়িতে চালান ক'রে দিয়েছিল।

কিন্তু বুড়ীর কপালে আরও দুঃখ ছিল, কারণ বড়মা মারা যাবার

দিন-পনেরো আগে হঠাৎ ছোটকাকা মারা গেলেন। বাড়িতে একটা মাত্র চাকর ছিল, সে-ই বড়মা'র জল তোলা, বাজার করা, রান্নার যোগান দেওয়া ইত্যাদি করত। একদিন রাত্রে সে-লোকটা বড়মাকে খুন ক'রে গয়নার বাক্স নিয়ে চম্পট দিলে। বাড়িতে দ্বিতীয় লোক নেই, মড়া প'চে ঢোল হয়ে গন্ধ বেরুতে পাড়ার লোক পুলিসে খবর দিলে। তারা এসে মুর্দাফরাশ দিয়ে লাশ টেনে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে বাবাকে খবর দিলে।

আমার মা বলতেন, ছোটমা তাঁকে বড় ভালবাসতেন, ছোটমা'র অভি-সম্পাতের বিষ তাঁকে লাগবে না। কিন্তু তাও তো হ'ল না ভাই। একে একে আমার ভাইয়েরা পটপট ক'রে ম'রে গেল। বড়দা বিয়ে করলে না, ছোট্‌কাও তো চলল, মেয়ের দিক দিয়েও যে বংশের চিহ্ন থাকবে, তাও তো হ'ল না।

এই অবধি ব'লে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে দিদিমণি বললে, এই কুবেরের ধন আমি আগলে ব'সে আছি ; জানি না, বরাতে কি আছে !

তারপরে একটা গয়নার বাক্স খুলে দু-তিন মুঠো আংটি তুলে নিয়ে বেছে বেছে একটা হীরের আংটি বের ক'রে পরিতোষের ডান হাতের অনামিকায় পরিয়ে দিয়ে দিদিমণি আমাকে বললে, স্থবির, এর মধ্যে থেকে তোর যেটা পছন্দ হয় নিয়ে পর্।

আমার মন তখন অত্যন্ত ভারী হয়ে আছে, আংটির কথা শুনেই আমার নিজের বগলোস-আংটি ও সেইসঙ্গে লতুর কথা মনে পড়ল। আমি বললুম, এখন থাক দিদিমণি, আর একদিন দিনের বেলায় দেখে-শুনে বেছে নেব।

এখানে আশ্রয় পেয়ে আমাদের দিনগুলি কাশীর চেয়ে অনেক ভালো কাটতে লাগল। কাশীতে ছিল একটানা জীবন—খাওয়া-দাওয়া, গঙ্গাস্নান ও রাজ-কুমারীর অঙ্গসেবা। খালি মিষ্টি কথা ও মিষ্টি কাজ—একঘেয়ে একটানা জীবন। রাজকুমারীর ঐন্দ্রজালিক ব্যবহারের মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল নিশ্চয়, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বৈচিত্র্য যতই চমকপ্রদ হোক না কেন, প্রতিদিনের অভ্যাসে তার মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়।

দিদিমণিদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে মনে হতে লাগল, যেন আমরা একটা পরিবারের মধ্যে বাস করছি। বাড়িতে লোক মাত্র তিনজন—বাবুজী, বিশুদা ও দিদিমণি ; কিন্তু সেই ভোর পাঁচটা থেকে রাত্রি এগারোটা অবধি সেখানে গোলমাল হাঙ্গামা-হুজ্জুতের অন্ত নেই। এর মধ্যে বড়কর্তা যেদিন দয়া ক'রে বাড়ি ফেরেন, সেদিন তো বৈচিত্র্যের আর সীমা থাকে না।

ঘর আলাদা হয়ে যাওয়ায় বড়কর্তা আমাদের ওপরে হাড়ে চ'টে গেলেন। সেই ব্যাপারের পর যতবার সে বাড়িতে আসত, প্রতিবারই অন্তত ঘণ্টাখানেক ধ'রে আমাদের ঘরে এসে হাঙ্গামা লাগাত। পরিতোষ রাগ করলেও প্রতিবারেই আমি তাকে খোশামোদ ক'রে ক'রে তার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতুম। একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়বার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে প্রতিবারই সে বলত, তুমি শালা আচ্ছা লোক আছ, লেকিন উও শালেকো ম্যয় জিন্দা গাড় দুঙ্গা—

জন্মজন্মান্তরের শত্রুতা না থাকলে এমন ব্যাপার সম্ভব হয় না। নব্যতন্ত্রের দার্শনিক আমার এই ইঙ্গিতে হয়তো মৃদু হাসবেন, তার উত্তরে আমিও মৃদু হাসলুম মাত্র।

মাঘ মাস শেষ হয়ে ফাল্গুন প'ড়ে গেল, কিন্তু তখনও সেখানে বেশ কটকটে শীত। এমনই একদিন বেলা প্রায় বারোটার সময় রাস্তার ধারের ছাতে ব'সে ফতুয়া সেলাই করতে করতে হাত-পা কাঁপতে কাঁপতে বিশুদা অজ্ঞান হয়ে পড়ল। পরিতোষ ছুটতে ছুটতে এসে বাড়ির ভেতর খবর দিলে। আমি আর দিদিমণি তখন সংসারের হিসাব লিখছিলুম। সংবাদ পেয়ে সবাই ছুটলুম বার-বাড়িতে। একমুহূর্তে বাড়িময় হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। পরিতোষ বললে, আমি বাবুজীকে কাশী থেকে ডেকে নিয়ে আসি।

তখুনি টাকাকড়ি নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, এমন সময় পরিতোষ বাবুজীকে কাশী থেকে নিয়ে এল। ঘণ্টা-দুই আগে বিশুদার জ্ঞান হয়েছিল, কিন্তু জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জ্বর উঠল বোধ হয় এক-শো পাঁচ ডিগ্রী। জ্বরের ঘোরে সে একরকম আচ্ছন্ন হয়ে প'ড়ে রইল। বাবুজী পরিতোষের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে একরাশ মিক্শ্চার ও পেটেণ্ট ওষুধ নিয়ে এসেছিলেন। তিনি এসেই বিশুদাকে এক দাগ ওষুধ খাইয়ে দিয়ে কাপড়-চোপড় ছাড়তে চ'লে গেলেন।

পরিতোষ বেচারী সারাদিন কিছুই খায় নি। দিদিমণি তাকে টেনে নিয়ে চ'লে গেল খাওয়াতে, আমি আর আহিয়া রুগীর কাছে ব'সে রইলুম।

দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘোর হয়ে এল। সেদিন বিশুদার ঘরে বাইরের লোকজন কেউ নেই। বান্ধুবান্ধবেরা বাইরে থেকেই তার খোঁজ নিয়ে ক্ষুণ্ণ মনে যে যার ফিরে যেতে লাগল।

ভরত এসে একটা দেওয়ালগিরি জ্বালিয়ে দিয়ে চ'লে গেল।

বিশুদা বুকের ওপর হাত-দুটো জোড় ক'রে শুয়ে, মুখে প্রকাশ না করলেও

তার যে খুবই কষ্ট হচ্ছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সাপের ফোঁসফোঁসানির মতন তার নিশ্বাসের একঘেয়ে আওয়াজ ঘরের মধ্যে গুমরে গুমরে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলল। আহিয়া তার শিয়রে ব'সে কপালে বোধ হয় পুরানো-ঘি ঘষছে, আর আমি একপাশে ব'সে নির্নিমেষ নয়নে তার মুখের দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় বিশুদা চোখ খুলে যেন কাকে খুঁজতে লাগল।

আমি বললুম, বিশুদা, আমি স্থবির। দিদিমণিকে ডাকব ?

অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে চেয়ে সে বললে, স্থবির! একবার মাকে ডেকে দে তো! ওপরের ঠাকুরঘরে মা আছে, বল্ গিয়ে, বিশুদা ডাকছে।

তক্ষুনি ছুটে গিয়ে বাবুজীকে ডেকে নিয়ে এলুম। তিনি এসে আবার কিছুক্ষণ পরীক্ষা ক'রে কোনও কথা না ব'লে চ'লে গেলেন।

রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশুদার অসুখ খুবই বাড়াবাড়ি হতে লাগল। আমি, পরিতোষ, দিদিমণি তার কাছে ব'সে কেউ-বা বাতাস, কেউ-বা মাথায় জলপটি দিতে লাগলুম। এর মধ্যে বাবুজী আর-একবার এসে তাকে দেখে গেলেন।

অনেক রাত্রে বিশুদা স্থির হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে দিদিমণি আমাদের জন্যে বালিশ ও লেপ নিয়ে এসে বললে, তোরা আজ এইখানেই শুয়ে পড়্।

পরিতোষটা ছিল অত্যন্ত ঘুমকাতর। এই কয়েক দিনের মধ্যেই বিশুদার সঙ্গে তার একটা আন্তরিক যোগ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ব'লেই সে এতক্ষণ ঘুমোয় নি। দিদিমণি বলামাত্র সে শুয়ে পড়ল, যেমন শোয়া অমনই ঘুম।

দিদিমণি আমাকে বললে, স্থবির, তুইও শুয়ে পড্। আমি এখুনি আসছি। —ব'লে সে বেরিয়ে গেল।

আহিয়া তখনও বিশুদার মাথার কাছে ব'সে পাঁচ মিনিট অন্তর ন্যাকড়া ভিজিয়ে জলপটি দিয়ে চলেছিল। খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে আমি বললুম, আহিয়া, এবার তুমিও শুয়ে পড়।

আহিয়া করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে কি যেন বললে, কিন্তু তার গলা দিয়ে কোন শব্দই বেরুল না।

আমার চোখে ঘুম নেই, ব'সে ব'সে ভাবছি, দিদিমণি এলে শোয়া যাবে। চারিদিক নিস্তব্ধ; বিশুদার নিশ্বাসের সেই সাঁ-সাঁ আওয়াজ ক'মে গিয়েছে। অতীত দিনের অনেক ঘটনার কথা হাল্কাভাবে মনের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ দিদিমণির অপেক্ষা ক'রে ক'রে একটা বিড়ি ধরিয়ে ছাতে বেরিয়ে গেলুম।

কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি, বাইরে ঘন অন্ধকার। শুধু বিশুদার ঘরের খোলা-দরজা দিয়ে একটু আলোর টুকরো ছাতে এসে পড়েছে—বিরাট কালো ফ্রেমে বাঁধানো ছোট একখানা ঘষা আয়নার মতন। মেঘবিহীন আকাশে তারা ঝকঝক করছে, হাওয়া না থাকলেও কনকনে ঠাণ্ডা। আমি মাথা অবধি র‍্যাপারটা মুড়ি দিয়ে একজায়গায় উবু হয়ে ব'সে পড়লুম।

ব'সে ব'সে ভাবছি আকাশ-পাতাল, হঠাৎ মনে হ'ল, ছাতের আলসের ওপর একখানা হাত ছড়িয়ে তার ওপর মাথা রেখে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। যে দাঁড়িয়ে আছে, তার কাপড় পরবার ভঙ্গী দেখে মনে হ'ল, যেন সে নারী। কিন্তু সে রোগা কি মোটা, কালো কি ফরসা, তা সেই অন্ধকারে কিছুই ধরবার জো নেই। সে-দৃশ্য দেখে ভয়ে আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। মনের মধ্যে সাহস সঞ্চয় ক'রে ডাক দিলুম, দিদি, দিদিমণি!

কিন্তু ও-পক্ষ থেকে কোনও জবাব এল না। অথচ সে-মূর্তি ঠিক সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

এবার বুকের মধ্যে ভয়ানক টিপটিপ করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। একটু দূরেই, দিদিমণির ঘরের কাছেই পাহারাদার ব'সে আছে ; কিন্তু তাকে ডাকবার ক্ষমতাও রহিত হয়ে গেল। জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার ঠিক বর্ণনা করা যায় না। বাবার মারের ভয়, ক্লাস-প্রমোশন না পাওয়ার ভয়, ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি অনেকরকম ভয়ের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ-ভয়ের তুলনায় সেসব কিছুই নয়। কয়েক হাত দূরেই ঘরের দরজা খোলা রয়েছে, কিন্তু উঠে যে সেখানে চ'লে যাব সে-শক্তি নেই। পক্ষাঘাত-গ্রস্তের মতন আমি অনড় হয়ে ব'সে রইলুম। এক মুহূর্ত একটা যুগের মতন মনে হতে লাগল। চোখের সামনে দেখলুম, সে মূর্তি দ্রুত চ'লে গেল বিশুদার সকালবেলাকার আড্ডার ছাতের দিকে। আর দেরি না ক'রে আমি ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে লেপের তলায় ঢুকে হাঁপাতে লাগলুম।

ওইরকম ধড়মড় ক'রে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখে আহিয়া একটু সন্দেহ-দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থেকে বিশুদার শিয়র থেকে উঠে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে?

ততক্ষণে আমার মনে সাহস ফিরে এসেছে। লেপখানাকে বাগাতে বাগাতে বললুম, কিছু না, বড্ড শীত লাগছে।

আহিয়া আমার কাছ থেকে উঠে গিয়ে বিশুদার শিয়রে বসতে-না-বসতে

দিদিমণি এসে উপস্থিত হ'ল, পেছনে ভরত চাকরের কাঁধে বালিশ ও লেপ। আমার পাশেই বালিশ ও লেপ রেখে ভরত বেরিয়ে গেল। একবার বিশুদার কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ দেখে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে সে আমার পাশে এসে বসল।

আমার ঘুম ছুটে গিয়েছিল, এবার উঠে বসলুম। আমাকে বসতে দেখে দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলে, কি রে, এখনও ঘুমোস নি?

কিছুতেই ঘুম আসছে না দিদি।

আচ্ছা, তুই শুয়ে পড়, আমি তোর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, এখুনি ঘুমিয়ে পড়বি।

এবার আমি জিজ্ঞাসা করলুম, দিদিমণি, একটু আগে কি তুমি ছাতের কোণে দাঁড়িয়ে ছিলে?

কই! না তো। আমি তো এতক্ষণ বাবুজীর কাছে ব'সে ছিলুম।

ঠিক ভয় না হ'লেও সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল।

দিদিমণি একবার আহিয়ার দিকে চেয়ে নিয়ে ফিসফিস ক'রে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, কেন রে, কিছু দেখেছিস নাকি?

বললুম, হ্যাঁ।

দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলে, মেয়েমানুষ?

বললুম, হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ পাথরের মতন স্থির হয়ে ব'সে থেকে সে বললে, ছোট্‌কা তা হ'লে আর বাঁচবে না। কেউ মারা যাবার আগেই ও দেখা দেয়।

ভয়ে দু-হাত দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরলুম।

দিদিমণি আমার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, ভয় কি! তোর কিছু ভয় নেই, বরঞ্চ তোর ভালোই হবে, দেখে নিস।

দিদিমণি পাশে শুয়ে আমার লেপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। এবার তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, ও কে দিদিমণি?

দিদিমণি আমার কানে ফিসফিস ক'রে বললে, ছোট্‌ঠাকুরমা।

* * *

বোধ হয় দু-তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলুম। ধাক্কা খেয়ে ধড়মড় ক'রে উঠে দেখি, দিদিমণি আমার পাশে ব'সে, এরই মধ্যে তার স্নান হয়ে গিয়েছে, শুধু বসনাঞ্চল

গায়ে জড়ানো। আমি উঠতেই আমার হাত ধ'রে বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে দুখানা দশটাকার নোট দিয়ে বললে, এ টাকাটা তোর কাছে আলাদা ক'রে রেখে দে। বিশুর জন্যে বাবা বিশ্বনাথের কাছে মানত করেছি।

নোট-দুটোকে মুড়ে ট্যাঁকে গুঁজে আবার এসে লেপের তলায় লম্বা হয়ে পড়া গেল।

সেদিন সকালেও বিশুদার অবস্থা সেইরকমই রইল। বাবুজী সেদিন আর বেরুলেন না। পরিতোষ বিশুদার সেবা করতে লাগল মায়ের মতন। সকাল থেকে তাকে 'বেড্প্যান' দেওয়া, মাথায় জলপটি লাগানো, ঠায় ব'সে থেকে সে রোগীর পরিচর্যা করতে থাকল। শেষকালে দিদিমণি একসময়ে এসে তার হাত ধ'রে তুলে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে আমাদের ঘরে শুইয়ে দিলে।

আমরা মনে করেছিলুম, এ-যাত্রা বিশুদার আর রক্ষে নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাবুজীর দাওয়াইয়ের গুণেই হোক অথবা তার জীবনীশক্তির জোরেই হোক, দিন-তিনেকের মধ্যেই তার জ্বর একেবারে নেমে গেল। সাত-আট দিন পরে আবার সে সকালবেলায় লাঠি আঁকড়ে নেংচে-নেংচে গিয়ে ছাতের আড্ডায় বসতে আরম্ভ ক'রে দিল। অবিশ্যি সন্ধ্যেবেলা নিয়মিত জ্বর-আসা বন্ধ হ'ল না বটে, তবে টুপি-সেলাই ফতুয়া-সেলাই সেই আগের মতনই চলতে লাগল।

তারপর একদিন, ফাল্গুনের মাঝামাঝি হ'লেও তখনও বেশ শীত, তবুও মধুমাসের আগমনী-সঙ্গীতে প্রকৃতির অঙ্গে শিহরন আরম্ভ হয়েছে মাত্র, দিদিমণি আমায় ডেকে বললে, স্থবির, আমরা কাল সকাল আটটার গাড়িতে কাশী যাব বাবার পুজো দিতে, মনে আছে তো? তুই, আমি আর পরিতোষ—এই তিনজনে যাব। সারাদিন কাশীতে থেকে রাত্রি সাড়ে-আটটার গাড়িতে ফিরব। বাবুজী আসবার ঘণ্টাখানেক আগেই বাড়ি পৌঁছে যাব। আজ রাত্রে আমি বাবুজীকে ব'লে রাখব'খন।

সন্ধ্যেবেলা বিশুদার ঘরে ব'সে কাশী যাবার পরামর্শ হতে লাগল। এ-কথা সে-কথার পর হঠাৎ বিশুদা দিদিমণিকে বললে, তুই আর শর্মাজী কাশী যা, রায়সাহেব এখানে থাক্, সারাটা দিন একলা থাকব, কি বল পরিতোষ?

ঠিক হ'ল, আমি আর দিদিমণি কাশী যাব, পরিতোষ বাড়ি থাকবে। সে-রাত্রে পরিতোষ বললে, একবার তোর রাজকুমারীর কাছে গিয়ে জয়ার খোঁজটা নিয়ে আসিস।

আমি বললুম, জয়াগিন্নী বলেছিল যে, তাদের ফিরতে ছ'মাস লাগবে, তার

দু-মাসও এখনও কাটে নি। তার ওপরে ওই ব্যবহারের পর আর কি সেখানে যাওয়া ঠিক হবে?

পরিতোষ কিছুক্ষণ চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে রইল। তারপরে বললে, ঠিক বলেছিস। ও-মাগীর বাড়িতে আর যাস নে। মাস-ছয়েক কেটে গেলে জয়াকে চিঠি লিখব; সে এখানে চলে আসবে।

আবার কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে থেকে সে বললে, জয়ার কথা আমি দিদিমণিকে ব'লে ফেলেছি।

বেশ করেছ।

পরিতোষের কথাটা শুনে মনে একটা তীক্ষ্ণ আঘাত পেলুম। সে যে দিদিমণিকে জয়ার কথা ব'লে ফেলেছে, ঠিক সেজন্যে নয়। কিন্তু দিদিমণি এ-কথা ঘুণাক্ষরেও কোনদিন আমার কাছে প্রকাশ করে নি, সেইজন্যে তার ওপর আমার দারুণ অভিমান হতে লাগল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর জিজ্ঞাসা করলুম, আর কিছু বলেছিস নাকি? রাজকুমারীর কথা বলিস নি তো?

পরিতোষ বললে, সব বলেছি।

রেগে-মেগে ব'লে ফেললুম, দূর শালা! এসব বলতে গেলি কেন?

পরিতোষ হাসতে লাগল।

পরদিন সকালবেলা একটা টিনের হাত-বাক্সের মধ্যে দিদিমণি ও আমার কাপড়, গামছা, তেলের শিশি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে, দুখানা টিকিট কিনে একটা খালি সেকেণ্ড-ক্লাসের কামরায় গিয়ে উঠলুম। আমি স্টেশনের দিকে আর দিদিমণি অন্য দিকের বেঞ্চিটা দখল ক'রে ব'সে পড়লুম। একটু পরেই গাড়ি ছেড়ে দিলে।

এখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হয়ে গিয়েছে। মুখর মহানগরী কলিকাতার কোলাহল স্তব্ধ। এমনই এক রাত্রে জাতক লেখা শুরু করেছিলুম। ভাবছিলুম, এই সামান্য কয়বৎসরে জগতের কত পরিবর্তনই না হয়ে গেল! আজই সকালে সাবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, এক বর্বর জাতি আর-এক বর্বর জাতির দেশে অ্যাটমিক বোমা ফেলে একমুহূর্তের মধ্যে একটা শহর একেবারে ধ্বংস ক'রে ফেলেছে। এতখানি নৃশংসতা মূঢ়তা ও কাপুরুষতার নিদর্শন প্রাকৃতিক বিপ্লবের ইতিহাসেও দুর্লভ। এই কথাটাই মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছিল, এমন সময় স্মৃতি-সাগরের গর্ভ থেকে সেই দিনের সকালবেলাটি অপূর্ব এক রূপ ধ'রে

আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল—তার স্বরূপ বাণীমূর্তি গঠন করা আমার সাধ্যাতীত।

রেলগাড়ি ছুটে চলেছে, স্তব্ধ ধরণীর বুকে অর্থহীন প্রলাপের নিরবচ্ছিন্ন ঝঙ্কার তুলে। জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে আমি ব'সে আছি। কাশীর কথা, কাশীর অভিজ্ঞতার কথা ভাবছি, ভাবছি নিজের ভবিষ্যতের কথা। এমন সময় দিদিমণি ডাক দিলে, ওখানে কেন, এখানে আয়, একটু গল্প করি।

এদিক থেকে উঠে গিয়ে দিদিমণির বেঞ্চিতে গিয়ে বসলুম। সে আমার দিকে একটু স'রে এসে বললে, দেখ্, কাশীতে গিয়ে কিন্তু এক্কায় চড়তে হবে, আমার এক্কা চড়তে ভারি ভালো লাগে। সেই করে ছেলেবেলায় বেরিলিতে থাকতে এক্কায় চড়তুম, আর চড়া হয় নি।

বললুম, এক্কায় উঠবে কি ক'রে! প'ড়ে যাবে না? বাঙালীর মেয়েকে তো কখনও এক্কায় চড়তে দেখি নি।

দিদিমণি হাসতে হাসতে বললে, পড়ব কেন রে! দেখ্ না তুই, কেমন চড়ি! শুধু চোখ রাখবি, বাবুজী বা আমার বড়ভাই না দেখতে পায়। তা হ'লে ভারি লজ্জায় পড়তে হবে।

তারপরে সে গড়গড় ক'রে বলতে আরম্ভ করলে, দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে স্নান সেরে আগে ছোট্‌কার পূজো দিতে হবে। তারপরে খাবার-দাবার কিনে নৌকো ভাড়া করব, নৌকোতে ব'সে খেয়ে নিয়ে রামনগরে যাব। সেখানে রাজবাড়িতে গিয়ে সব দেখে-শুনে কিছুক্ষণ গঙ্গায় ঘুরে বেরিয়ে যাব চৌকে। সেখানে ভাং খেয়ে যাব বড়-গৈবিতে, সেখান থেকে স্টেশনে ফিরে চ'লে আসব বাড়িতে, বুঝলি?

আমি বললুম, দিদি, ভাং আমার সহ্য হয় না, বড্ড বুক ধড়ফড় করে।

আমার কথা শুনে অভয় হাসি হেসে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে দিদিমণি বললে, দূর পাগ্‌লা, কিচ্ছু হবে না, আমি আছি।

রেলগাড়ি ছুটে চলেছে শব্দের তুফান তুলে, তার চেয়ে দ্রুত চলেছে আমার জীবনের ঘটনাস্রোত, মনের মধ্যে তারই আন্দোলন চলেছে। একটার পর একটা স্টেশন আসছে যাচ্ছে। প্যাসেঞ্জার গাড়ি, প্রতি স্টেশনেই থামে। আমরা দু-জনে পাশাপাশি ব'সে বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দিয়েছি। দূরে পাহাড়, গাছ, গ্রাম সবই বিপরীত দিকে ছুটেছে, মাঝে মাঝে চোখে কয়লার কুচি প'ড়ে যতিভঙ্গ হচ্ছে।

এইরকমে সময় কাটছে, হঠাৎ দিদিমণি জানলা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে বললে, আচ্ছা স্থবির, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

কর।

না থাক্, তুই হয়তো রাগ করবি।

বললুম, না, রাগ করব না, সত্যি বলছি, রাগ করব না, বল তুমি।

দিদিমণি কিন্তু কোন কথা না ব'লে আবার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দিলে। চুপ ক'রে ব'সে ভাবতে লাগলুম, কি কথা বলতে গিয়ে এমন ক'রে সে চেপে গেল। মনের মধ্যে ভারি একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। কৌতূহল জাগিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকা, এ হচ্ছে নারীর স্বাভাবিক ধর্ম, এ-বিষয়ে দিদিমণি ও দিদিমাতে কোনও তফাত নেই।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটবার পর অর্থাৎ আমার কৌতূহল যখন চরমে উঠেছে, জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা মনে কর্, আমরা দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান সেরে উঠেছি, এমন সময় দেখা গেল, তোর রাজকুমারী সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে যদি বলে, স্থবির, আমার সঙ্গে চ'লে আয়। তা হ'লে ? তা হ'লে তুই চ'লে যাবি তো ?

আমি বললুম, পরিতোষের কাছে তুমি কি শুনেছ তা জানি না, কিন্তু আমার মন বলছে, তুমি আমায় বিশ্বাস কর না। বিশ্বাস কর, রাজকুমারী যদি আজ এসে লক্ষ-লক্ষ টাকার প্রলোভন দেখিয়ে আমাকে বলে—তুই আমার কাছে ফিরে আয়, তো আমি তার সঙ্গে কথা না ব'লে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাব। আমাকে বিনা কারণে সে যা অপমান করেছে, তার শোধ তা হ'লে আজই হয়ে যাবে।

আমার কথা শুনে দিদিমণি যেন আশ্বস্ত হয়ে আবার প্রশ্ন করলে, তা হ'লে তুই তাকে ভালবাসিস না ?

আমি তাকে ঘৃণা করি।

আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, লতুকে কি এখনও ভালবাসিস ?

এ-কথার কি জবাব দেব! আমার জীবনের প্রথম প্রেম সে। আজও জীবনশেষে যার কথা মনে হ'লে মনে হয়, আমার জীবন ব্যর্থই হয়েছে। সেদিন, তখনও সেই ক্ষত বুকের মধ্যে দগদগ করছে, হঠাৎ সেখানে খোঁচা লাগতেই কে যেন আমার টুঁটি টিপে দম বন্ধ ক'রে দিতে লাগল। দিদিমণি

একটা হাত দিয়ে আমার হাত ধ'রে ছিল, সেই হাতে আমার অশ্রুজল ঝরঝর ক'রে পড়তে লাগল।

কাঁদতে দেখে সে আমাকে একরকম জড়িয়ে ধ'রে বলতে লাগল, আমায় মাপ কর্। লক্ষ্মী ভাই আমার, কাঁদিস নি। আমি জানি, আমি জানি—

দিদিমণি কাঁদতে কাঁদতে নিজের বসনাঞ্চল দিয়ে আমার অশ্রু মুছিয়ে দিতে লাগল। একবার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, সহানুভূতিতে তার মুখখানা থমথম করছে, দু-চোখে করুণার প্রস্রবণ ব'য়ে চলেছে।

দিদিমণি বলতে লাগল, দেখ্ ভাই, ভালবাসা সকলের ভাগ্যে সহ্য হয় না। আমার কথাই একবার ভেবে দেখ্! আমার সেই আধ-পাগলা স্বামী, মাত্র কয়েক দিনের জানাশোনা তার সঙ্গে—তবুও ভগবান যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখতেন—

এই অবধি ব'লে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলে।

দুটো-তিনটে স্টেশন এইভাবেই চ'লে গেল।

দিদিমণি মুখ তুলে বলতে আরম্ভ করলে, আমার অবস্থা তো দেখছিস? ছোট্‌কা তো চলল। বাবুজী আর ক'দিনই বা আছেন! বড়ভাইটা তো জানোয়ারের অধম, সে তার বিষয়-আশয় আলাদা ক'রে নিয়েছে। বাবুজী গেলেই তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকে যাবে। তার পর আমার কি হবে? কোন্ বিদেশে কোথায় কি ভাবে মরব, মুখে একটু জল দেবার লোকও থাকবে না কাছে। স্থবির, স্থবির ভাই, আমাকে ছেড়ে যাস নে, আমি বড় অসহায়!

দিদিমণি আমার হাত ধ'রে নিঃশব্দে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

আমি বললুম, দিদিমণি, আমি যতদিন আছি, তোমার কোনও ভয় নেই। তোমাকে ছেড়ে আমি কখনও কোথাও যাব না, তুমি বিশ্বাস কর।

আজ জীবনশেষে হিসাব ক'রে দেখছি, সারাজীবন ধ'রে যত প্রতিজ্ঞা করেছি, সরল মনেই করেছি। প্রতিজ্ঞাপূরণের ভার যার ওপর ছিল, সে-ই করেছে বিশ্বাসঘাতকতা। আমি নির্দোষ।

আমার কথা শুনে দিদিমণি স্থির নেত্রে আমার দিকে চাইলে। কাঁদতে-কাঁদতে তার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল, তবুও দেখে বুঝতে পারলুম, সে-চোখে কি আশ্বস্তি! কিছুক্ষণ আমাকে একরকম জড়িয়ে ধ'রে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে ব'সে শেষকালে আমার উরুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

জীবন-প্রভাতের সেই মধুময় স্বপ্ন আজ এক বিচিত্র রূপ ধ'রে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, কোন্ ভাষায় আমি তাকে রূপ দান করব!

কাশীর ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট স্টেশনে যখন গাড়ি পৌঁছল, তখনও আমরা নিজের চিন্তায় বিভোর। লোকজনের ওঠানামা ও ফেরিওয়ালাদের চিৎকারে চটকা ভেঙ্গে গেল। আমরা নেমে স্টেশনের বাইরে এসে ভালো দেখে একখানা এক্কা ভাড়া করলুম দশাশ্বমেধ ঘাট অবধি। ভাড়া ঠিক হ'ল তিন আনা। তখনকার দিনে সিকরোল থেকে দশাশ্বমেধ ঘাট অবধি এক্কার ভাড়া ছিল ছ'পয়সা, বড়-জোর দু-আনা।

দিদিমণি বললে, যাক্‌গে, এইটেই ঠিক কর্, এক্কাটা ভালো আছে।

দিদিমণি এক-লাফে এক্কায় চ'ড়ে চাদরে মাথা ঢেকে বসল, আমি একদিকে পা ঝুলিয়ে বসলুম।

এক্কাওয়ালাটা ছিল অল্পবয়সী। দিদিমণিকে দেখে বোধ হয় তার 'ফিলিংস' চাগল, এক্কা চালাতে চালাতে সে-ব্যক্তি তারস্বরে চিৎকার ক'রে পিরীতের গজল গাইতে শুরু ক'রে দিলে। লোকটা বোধ হয় মনে করেছিল, তার গানের ব্যঞ্জনা আমরা বুঝতে পারব না। অবশ্য সে-গানের বাচ্যার্থ বোঝবার মতন ভাষাজ্ঞান আমার তখনও আয়ত্ত হয় নি; কিন্তু দিদিমণি যে তার সমস্ত কথাই বুঝতে পারছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। একবার তার দিকে চেয়ে দেখি যে, তার মুখখানা রাগে রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে। গায়ক বোধ হয় তার রাগকে অনুরাগ মনে ক'রে এক-একটা পঙ্‌ক্তি ইনিয়ে-বিনিয়ে গেয়েই বারে বারে পেছন ফিরে দেখতে লাগল, সেই সুন্দরী সোয়ারীর ওপর তার কণ্ঠস্বর কিরকম প্রভাব বিস্তার করছে!

যা হোক, এমনই ক'রে পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে তো দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে পৌঁছনো গেল।

গাড়ি থেকে নেমে হাত-বাক্সটি নামিয়ে নিয়ে রাস্তার একধারে দাঁড়ালুম, দিদিমণি তার গেঁজে থেকে একটা ছোট রুপোর দু-আনি আর চারটে পয়সা আমার হাতে দিলে—'আনি' জিনিসটির তখনও জন্ম হয় নি।

আমি একটু এগিয়ে গিয়ে এক্কাওয়ালাকে পয়সাগুলো দিয়ে দিদিমণির কাছে এসে দাঁড়ালুম। এক্কাওয়ালা সেগুলো গুনে দেখেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে আমার পিছু পিছু একরকম ছুটে এসে বললে, এ বাবু, এ কি দিচ্ছ! পাঁচ-আনা ভাড়া ঠিক ক'রে এখন তিন-আনা দিচ্ছ কেন?

আমি বললুম, তোমার সঙ্গে তো তিন-আনা ভাড়া ঠিক হয়েছিল !

কিন্তু একাওয়ালা এমন ষাঁড়ের মতন চেঁচাতে লাগল যে, লোক দাঁড়াতে আরম্ভ ক'রে দিলে। শেষকালে দিদিমণি আমাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে সামনে এসে বললে, কি বলছিস তুই ?

লোকটা দিদিমণিকে কি-একটা কথা বলামাত্র ঠাস ক'রে একটি চড় পড়ল তার গালে, দেখতে-না-দেখতে আর-একটি চড়—

মেয়েমানুষ, বিশেষত বাঙালীর মেয়ে, জোয়ান পুরুষমানুষের গালে এমন বেপরোয়া চড় লাগাতে পারে, এ আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

দেখতে দেখতে চারিদিক লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। একটু দূরেই একজন কন্‌স্টেব্‌ল দাঁড়িয়ে ছিল, হাঙ্গামা দেখে সে ছুটে আসতেই দিদিমণি তাকে উর্দুতে কি বললে। তার কথা শুনেই সে একাওয়ালার কাঁধে মারলে একটি জোর ঘিস্‌সা, লোকটা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে নিজের গাড়িতে চ'ড়েই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে গেল।

দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান সেরে কাপড় ছেড়ে আমরা চললুম দিদিমণিদের পাণ্ডার বাড়িতে। পাশেই, মানমন্দিরের ঘাটের কাছেই ছিল তাদের পাণ্ডাবাড়ি। দিদিমণি সেখানে যেতেই বাড়িতে হৈ-হৈ উৎসব লেগে গেল। পাণ্ডাবাড়ির মেয়েমহলেও দেখলুম তার খুবই প্রতিপত্তি। বৃদ্ধ পাণ্ডা-মহারাজ চিৎকার করতে লাগল, আজ আমার বরাত ভালো, আজ মনোরমা-মায়ি এসেছে—

যা হোক, আদর-আপ্যায়নের পর পূজো দিতে চললুম। পাণ্ডাজী গর্ভগৃহ থেকে একেবারে ভিড় সরিয়ে দিয়ে দিদিমণির পূজো দেওয়ালে। পূজো সাঙ্গ হয়ে যাবার পর পাণ্ডা-মহারাজ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ তখনও সেখানে উপস্থিত রয়েছে—দিদিমণি আমার একখানা হাত ধ'রে টেনে এনে বললে, ঠাকুরের মাথায় হাত দে।

তার কণ্ঠস্বর শুনে আমি দস্তুরমতন ভড়কে গেলুম।

দিদিমণি কঠিন স্বরে বললে, দে, হাত দে ঠাকুরের মাথায়।

আমি সারাজীবন ধ'রে বহুবার লক্ষ্য করেছি, অতি আপনার জনও মাঝে মাঝে এমন দুর্বোধ্য, রহস্যময় ও কঠিন হয়ে ওঠে, যার হদিস পাওয়া মুশকিল। অনন্যোপায় হয়ে ভয়ে ভয়ে শিবলিঙ্গের ডগায় দক্ষিণ-হস্তের মধ্যমাকে চেপে ধরলুম।

দিদিমণি বললে, সৌগন খা (ভাষাজ্ঞান কিছু অগ্রসর হবার পর জেনেছি, এর মানে—শপথ কর্), আমাকে ছেড়ে কখনও যাবি নে।

বললুম, তোমাকে ছেড়ে কখনও যাব না। পাণ্ডা-মহারাজ হাসতে হাসতে বললে, ছেলেটাকে পুষ্যি নিলি বুঝি মনো-মায়ি ? বড় সুলক্ষণ ছেলে আছে।

আজ সেইসব কথা মনে হয়ে বুকের মধ্যে একটা অট্টহাসি গুমরে উঠছে, আর মনে পড়ছে বিশ্বকবির বাণী—সব ঝুঠা হ্যায়।

দিদিমণি পাণ্ডাজীর কথায় কোন উত্তর না দিয়ে আমার হাত ধ'রে গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এল।

আমরা ঠিক করেছিলুম, বাজার থেকে খাবার কিনে বজরায় ব'সে খাওয়া হবে, কিন্তু পাণ্ডা-মহারাজ কিছুতেই ছাড়লে না! সে একরকম জোর ক'রে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভূরিভোজন (অবশ্য নিরামিষ) করিয়ে ছেড়ে দিলে। বেলা তখন প্রায় বারোটা।

পাণ্ডার বাড়ি থেকে বেরিয়ে মানমন্দিরের ঘাট থেকে আমরা একখানা বজরা ঠিক করলুম। প্রথমে আমাদের রামনগরে নিয়ে যাবে, সেখানে আমরা ঘণ্টা-দুয়েক থাকব। তারপর বেলা চারটে অবধি অসিঘাট থেকে রাজঘাট অবধি ঘুরিয়ে এনে আবার মানমন্দির-ঘাটে নামিয়ে দেবে। যতদূর মনে পড়ছে, ভাড়া ঠিক হয়েছিল বারো আনা।

এর আগে কাশীতে এতদিন কাটিয়েছি, ঘাটে দাঁড়িয়ে ওপারে রামনগরের সাদা প্রাসাদ কতদিন দেখেছি, কিন্তু সেখানে যাবার সৌভাগ্য কোনদিনই হয় নি।

রামনগরের রাজা, তিনি তখনও মাত্র 'কাশী-নরেশ'ই ছিলেন। তিনি তখনও মহাঅমান্য (মহামান্য) ইংরেজ রাজের অধীনস্থ সামন্ত রাজা হন নি। কিন্তু একদিন যে তাঁরা প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন, তা প্রাসাদের কাছাকাছি এলেই বুঝতে পারা যায়।

প্রকাণ্ড দরজা, যেমন উঁচু তেমনই চওড়া। দরজার দু'দিকে গাদা-বন্দুকধারী শান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে, অনেকটা পুরনো দিনের তাসের রাজার মতন চেহারা তাদের। কিন্তু প্রাসাদের দরজা অবারিত, রাজ্যের লোক ঢুকছে বেরুচ্ছে, কেউ কারুকে বারণ করছে না। সিংহ-দরজা পেরিয়েই প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ, সেখানে দুটো-তিনটে মহাকায় বাঁধা রয়েছে। প্রাঙ্গণ পেরিয়ে উঁচু-নীচু সরু-মোটা গলিপথ দিয়ে প্রায় গঙ্গার ধারে শিবের মন্দিরে এসে পৌঁছলুম। দিদিমণি গলবস্ত্র হয়ে এক-একটি দেবতাকে প্রণাম করলে। একটা মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে মস্তবড় একখানা তৈলচিত্র টাঙানো রয়েছে দেখলুম। ছবিখানা দেখেই আমার

কৌতূহল জাগল। মন্দিরের মধ্যে ঢুকে সেটা ভালো ক'রে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলুম। ধূপধুনোর ধোঁয়ায় ছবিখানা প্রায় অদৃশ্যই হয়ে গিয়েছে। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে বুঝতে পারা যায়, সেটা একজন সন্ন্যাসীর ছবি।

দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করলুম, এটা কার ছবি ?

দিদিমণি বললে, ব্যাসদেবের।—ব'লেই সে গলবস্ত্র হয়ে ছবির উদ্দেশে একটা গড় করলে।

দিদিমণির কথা শুনে আমার হাসি পেল। বললুম, দূর, ব্যাসদেবের ছবি, না, আরও কিছু!

কাছেই মন্দিরের পুরোহিত-গোছের এক ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে ছিল, সে দিব্যি বাংলায় বললে, হাঁ হাঁ বাবু, মা যা বলছেন, তা ঠিকই আছে, উনি ব্যাসদেবই আছেন।

আমি বললুম, ব্যাসদেবের ছবি কোথায় পেলে! কোন্ সালে, কত হাজার-হাজার বছর আগে ব্যাসদেব জন্মেছিলেন, তার জান কিছু? ব্যাসদেবের ছবি বললেই আমি অমনই মেনে নেব!

ব্রাহ্মণ আমার কথায় রাগ না ক'রে হেসে বেশ মিষ্টি-মিষ্টি ক'রে বললে, আপনি বালক হ'লেও বাংগালী তো! বাংগালীরা তো ফিরিঙ্গীদের চেলা আছে। তারা তো ধর্মকর্ম কিছুই মানে না। শুধু মায়েরা আছে ব'লেই তো আপনাদের ধর্মকর্ম এখনও বজায় আছে। ব্যাসদেব কবে জন্মেছিলেন, আর আর সব বৃত্তান্ত এই মাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তিনি আপনাকে সব বুঝাইয়ে দেবেন।

কথাগুলো এক-নিশ্বাসে ব'লে ফেলেই লোকটা অত্যন্ত উচ্চহাস্যে পারাবত-কুল চঞ্চল ক'রে এমন একটা মুখভঙ্গী ক'রে আমার দিকে চাইলে, যার জবাব দেবার মতন শক্তি আমার অঙ্গে ছিল না। কাজেই হার মেনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আমি ক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিভ হয়ে পড়েছি দেখে দিদিমণি আমার হাত ধ'রে বললে, চল্, গঙ্গার মন্দিরে যাই।

গঙ্গার কোলেই ছোট একখানি মন্দির। তারই মধ্যে গঙ্গামূর্তি—মকর-বাহিনী গঙ্গা।

মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে দিদিমণি বললে, দেখ্ দিকিন, কেমন সুন্দর মূর্তি!

সত্যিকথা বলতে কি, ছেলেবেলা থেকে সেদিন অবধি মূর্তিকে আমি স্রেফ 'মূর্তি' ব'লেই দেখে এসেছি। যে সমাজে ও পরিবারে আমার জন্ম হয়েছিল,

রূপের মধ্যে অরূপের সঙ্কেত যে থাকতে পারে তেমন শিক্ষা তাঁদের ছিল না—এমন কথা তাঁদের শত্রুও বলতে পারবে না ; কিন্তু যে সংস্কৃত মন (cultured mind) রূপের মধ্যে অরূপের সন্ধান পায় সে-মন তাঁদের ছিল না। এই কারণে বাল্যকাল থেকে দেব-দেবীর মূর্তিকে মূর্তি ব'লেই দেখতে শিখেছি, সে সুন্দর কি অসুন্দর—এ-বিচার মনের মধ্যে কখনও উদয়ই হয় নি। দেব-দেবী দেব-দেবীই মাত্র। দেব-দেবীত্ব ছাড়া অন্য কোনও গুণ তাদের প্রতি আরোপিত হতে পারে, এমন কথা আমাদের সংস্কারের বাইরে ছিল। শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্যবোধের বিচারে কোনও দেব-দেবীর মূর্তিকে দেখবার মতন সাহসই আমাদের ছিল না। কিন্তু দিদিমণি সামান্য একটু ইঙ্গিত করা-মাত্র যেন আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। কিছুক্ষণ সেই মূর্তির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হ'ল, আহা, কি সুন্দর!

এ-কথা যেন কেউ মনে না করেন যে, রামনগরের এই মকরবাহিনী গঙ্গামূর্তিকে আমি ভারতের শ্রেষ্ঠ মূর্তিগুলির সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলছি। আমি ভারতের তথাকথিত প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ মূর্তিই স্বচক্ষে দেখেছি। এইসঙ্গে এ-কথাও স্বীকার করছি যে, তাদের প্রত্যেকটিকে প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে ফেলতে আমার বাধা লাগে, দৃষ্টান্তস্বরূপ দক্ষিণ-দেশের সুন্দরস্বামীর মূর্তি। এই মূর্তিটি সম্বন্ধে কত কথাই শুনেছি ও পড়েছি, আচার্য অবনীন্দ্রনাথের অপূর্ব ভাষায় তার সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা শোনবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে ; কিন্তু আজও মনের দ্বিধা ঘোচে নি। কিন্তু দক্ষিণ-দেশের নটরাজ, দিলদারনগরের যক্ষিণী অথবা মহাবলিপুরমের মহিষমর্দিনী কোনও বক্তৃতার অপেক্ষা রাখে না। সে-মূর্তি দেখলেই শিল্পসৌন্দর্য প্রকাশ করবার বাচালতা স্তব্ধ হয়ে গিয়ে মন শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ে, তার পেছনে কি ইতিহাস লুকিয়ে আছে তা না জেনেও। রামনগরের এই গঙ্গামূর্তি এদের সমকক্ষ না হ'লেও সে এই জাতেরই মূর্তি, যা দেখলেই মনে হয়, আহা!

যাক, অনধিকার-চর্চা আর করব না। গঙ্গামায়িকে গড় ক'রে আমরা বজরায় এসে বসলুম। বজরা মাঝগঙ্গায় পড়তে দিদিমণি আমার উরুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। আমার ধুতিখানা ছিঁড়ে গেছে দেখে দিদিমণি ব'লে উঠল, ছি-ছি, আমার তো মনেই ছিল না-যে, তোদের ধুতি-জামা নেই। কাল সকালবেলা তুই আর পরিতোষ কাশীতে এসে দুজনে ছ'-জোড়া ধুতি আর চারটে ক'রে শার্ট কিনে নিয়ে যাবি। দুটো তুলোর ফতুয়াও কিনে নিস। দশাশ্বমেধ ঘাটে

ওই যে বাঙালীদের বড় দোকান আছে কাপড়-জামার, ওখানে দুজনে দুটো গরম কোটের অর্ডার দিয়ে দিবি।

আমি বললুম, আর তো শীত চ'লে গেল ব'লে। এখন আর গরম কোট দিয়ে কি হবে?

দিদিমণি বললে, সেই ভালো। আসছে বছরে তো আবার তোরা বেড়ে যাবি।

দিদিমণি দুঃখ করতে লাগল, পাণ্ডাজীকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দিলুম, বাড়ি গিয়ে পাঠিয়ে দিলেও চলত। তোদের জামা-কাপড় নেই, কথাটা মনেই ছিল না।

শেষকালে যথারীতি আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে দিদিমণি উপসংহার করলে, সব দোষ তোর, তুই কেন আগে আমায় বললি নে? এত কাজের মধ্যে আমার কি সব কথা মনে থাকে!

বজরা ভেসে চলল উত্তরবাহিনীর বুকের ওপর দিয়ে তরতর ক'রে, আর আমরা ভবিষ্যৎ স্বপ্নের জাল বুনতে লাগলুম—কোথায় কাশ্মীরের অমরনাথ, হিমালয়ের বুকে মানস-সরোবর, কেদার ও বদরীনাথ। কোথায় ভারতের এক কোণে দ্বারকায় রণছোড়জীর মন্দির, আবু পাহাড় আর রাজস্থানে পুষ্কর, কোথায় জুনাগড় আর কোথায় পুরুষোত্তম! আমি, পরিতোষ, দিদিমণি আর জয়া এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থ ছুটে বেড়াতে লাগলুম।

বেলা প্রায় চারটের সময় বজরাওয়ালা আমাদের মানমন্দিরের ঘাটে নামিয়ে দিলে। সেখান থেকে হেঁটে গোধুলিয়া অবধি গিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া ক'রে প্রথমে আমরা চৌকে গেলুম। দেখলুম, কাশীর সমস্ত রাস্তাঘাট দোকান-পত্তর দিদিমণির একেবারে নখদর্পণে।

চৌকের এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিদিমণি আমাকে দূর থেকে ভাঙের দোকানটা দেখিয়ে বললে, চার পয়সা দিয়ে আমার জন্যে দু-ভাঁড় শরবত কিনে নিয়ে আয় তো।

চার পয়সা দিয়ে দু-ভাঁড় ভাঙের শরবত কিনে নিয়ে এলুম। দিদিমণি চোঁ-চোঁ ক'রে ভাঁড়-দুটো নিঃশেষ ক'রে টপটপ ক'রে জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়ে বললে, আর দু-ভাঁড় কিনে নিয়ে আয়।

আবার দু-ভাঁড় শরবত কিনে নিয়ে এলুম। দিদিমণি আমাকে গাড়ির মধ্যে উঠে আসতে ব'লে গাড়োয়ানকে বললে, চল।

গাড়ি চলতে শুরু করল। দিদিমণি একটা ভাঁড় আমাকে দিয়ে বললে, নে, খেয়ে ফেল্, কিচ্ছু হবে না।

এক চুমুকে শেষ ক'রে দিয়ে ভাঁড় বাইরে ফেলে দেওয়া গেল।

গাড়ি চলতে লাগল বড়-গৈবির দিকে। কাশীতে এতদিন কাটিয়েছি, কিন্তু রাজকুমারী, জয়া অথবা বাঙাল-মা'র কাছে কোনদিনই গৈবির নাম বা তার মাহাত্ম্য শুনি নি। দিদিমণির মুখেই প্রথম শুনলুম বড়-গৈবি, ছোট-গৈবির কথা। শুনলুম বড়-গৈবি অর্থাৎ আমরা যেখানে যাচ্ছি, সে-স্থান নাকি সন্ন্যাসীদের মঠ। সেখানকার ইঁদারার জল নাকি খুবই উপকারী। ভরপেট খাওয়ার পর এক গ্লাস সেই জল খেলে আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার ক্ষিদেয় পেট চনচন করতে থাকবে।

নেশা করতে শেখার প্রথম অবস্থায় পেটে 'নৈশিয়' দ্রব্য পড়লেই বুদ্ধিটা প্রখর হয়ে ওঠে। সেই প্রাখর্যের প্রেরণায় আমার মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে লাগল, সন্ন্যাসীদের আশ্রমে এমন হজমী পানির অস্তিত্ব গৃহীজনের পক্ষে মঙ্গল-দায়ক কিনা। কারণ গৃহস্থজনের ট্যাঁক শোষণ ক'রেই তো সন্ন্যাসীদের মঠাশ্রম পোষিত হয়।

দিদিমণি ব'লে চলল, কাশীর বড় বড় লোকেরা প্রতিদিন গাড়ি পাঠিয়ে এখান থেকে ঘড়া-ঘড়া, জালা-জালা জল নিয়ে যায়।

গাড়ি চলেছে আর সেইসঙ্গে দিদিমণি অনর্গল ব'কে চলেছে। দেখতে-দেখতে তার চক্ষু-দুটি ভাঙের প্রভাবে ঈষৎ লাল হয়ে উঠল। এমনিতে সে একটু গম্ভীরাই ছিল; কিন্তু দেখলুম, সামান্য সামান্য কথায় সে খিলখিল ক'রে চেঁচিয়ে হাসতে আরম্ভ ক'রে দিলে, হাসি আর থামে না।

আমি তার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছি দেখে হঠাৎ হাসি থামিয়ে নিজের জায়গা থেকে উঠে আমার পাশে ব'সে বললে, তুই বোধ হয় মনে করছিস, আমার নেশা হয়েছে। কিন্তু সত্যি বলছি তোকে, আমার কিচ্ছু হয় নি। আরে দূর, দু-ভাঁড় ঐ বাজারের শরবত খেয়ে কি নেশা হয়! একদিন বাড়িতে দুধ দিয়ে বানাব'খন। আরও এক ভাঁড় খেলে হ'ত।

পরবর্তী জীবনে অনেক পাকা নেশাখোরের মুখে এই উক্তি শুনেছি, এবং জেনেছি যে, নেশা হওয়ার এমন স্পষ্ট প্রমাণ আর নেই।

দিদিমণির কথার উত্তরে বললুম, না, আমি অন্য কথা ভাবছি।

কি ভাবছিস?

না, কিছু ভাবছি না।

এই যে বললি, অন্য কথা ভাবছিস!

এমনই বললুম।

দূর, তোরও নেশা হয়েছে।—ব'লে আমার পিঠে একটা কিল মেরে সে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

গাড়ি চলেছে, তারই তালে তালে অশ্বিনীতনয়যুগলের গলার ঘণ্টা ঝমঝম ক'রে বাজছে। শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে আমরা মাঠের রাস্তায় পড়েছি। দু-ধারে জোয়ার, ভুট্টা কি আখের ক্ষেত জানি না, মাথা-সমান উঁচু-উঁচু গাছ যতদূর চোখ যায় বিস্তৃত। তারই মধ্য দিয়ে সরু সর্পিল পথ বেয়ে চলেছে আমাদের গাড়ি। রাস্তায় বোধ হয় একহাত পুরু ধুলোর বিছানা। তার ফলে ভাড়াটে গাড়ির চক্রমুখরতা অনেক পরিমাণে সংযত হওয়ায় চোখে একটু তন্দ্রার ঘোর এসে লাগতে লাগল।

গৈবিতে এসে গাড়ি দাঁড়াল। আমরা নেমে আশ্রমের ভেতরে ঢুকলুম। একটুখানি জায়গা গাছের বেড়া দিয়ে ঘিরে নেওয়া হয়েছে। সামান্য দু-একটা চালাঘর কি কোঠাঘর, তা আজ ঠিক মনে পড়ছে না। সুন্দর শান্ত নির্জন পরিবেশ, কোনও গোলমাল নেই।

দিদিমণি অগ্রসর হতে হতে আবার বললে, এটা একটা মঠ, সন্ন্যাসীরা থাকে এখানে।

দিদিমণির পেছনে পেছনে একটা ইঁদারার ধারে গিয়ে পৌঁছলুম। দেখলুম, ইঁদারার বাঁধানো পাড়ে বোধ হয় দশ-বারোটা ইয়া-ইয়া জোয়ান ল্যাঙট প'রে ব'সে আছে। সেখানকার জল যে কি ভয়ঙ্কর রকমের হজমী, এদের চেহারা দেখলে সে-সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

দিদিমণিকে দেখবামাত্র তারা সকলেই উল্লসিত হয়ে সমস্বরে অভ্যর্থনা করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী সন্ন্যাসী অথবা পালোয়ান তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল, আজ মনো-মায়ি এসেছে, আজ পেট ভ'রে মিঠাই খাব, আজ বরাত ভালো, ইত্যাদি।

লোকগুলোর চেহারা ও হালচাল দেখে জায়গাটাকে একটা কুস্তির আখড়া ব'লে মনে হতে লাগল।

দিদিমণি ইঁদারার পাড়ে বসতে বসতে বললে, বেশ তো, মিঠাই আনাও।

আমার কাছ থেকে হাত-বাক্সটা নিয়ে একটা দশটাকার নোট বের ক'রে

সেই লোকটার হাতে দিয়ে দিদিমণি বললে, আর একদিন এসে তোমাদের ভরপেট মিঠাই খাওয়াব, আজ এতেই চালিয়ে নাও।

পরে শুনেছিলুম, তাঁদের এক-একজনেই দশটাকার মেঠাই আড়ে মেরে দিতে পারেন।

যা হোক, লোকটা নোট হাতে পেয়ে সেই ন্যাঙট-পরা অবস্থাতেই শহরের দিকে ছুটল মিঠাইয়ের উদ্দেশে। নিকটবর্তী মেঠাইয়ের দোকান সেখান থেকে অন্তত চার মাইল দূর হবে।

আলাপচারী হতে লাগল, ও কেমন আছে, সে কেমন আছে ? অমুককে দেখতে পাচ্ছি না কেন ? সে এখন হরিদ্বারে আছে, অমুক নাসিকে গিয়েছে, ইত্যাদি।

একবার দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলে, বুটিটুটি ছানা হয়ে গিয়েছে বোধ হয় ?

এক বৃদ্ধ বললে, হ্যাঁ, খাবি তুই ?

দিদিমণি বললে, থাকলে একটু দিতে পার। না থাকলে নতুন ক'রে করবার দরকার নেই, চৌক থেকে আমি খেয়ে এসেছি।

লোকটা চেঁচিয়ে হুকুম করতেই বোধ হয় পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা ঝকঝকে কাঁসার গেলাস-ভর্তি ভাঙের শরবত এসে উপস্থিত হ'ল। দিদিমণি একটি চুমুকে গেলাস নিঃশেষ ক'রে বললে, জল খাওয়াও।

আমার জীবনে সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। যদিও পরে দেখেছি, বিশেষ দিনে ঘরে ঘরে মেয়েরা ভাং খেয়ে হুল্লোড় করছে। অবিশ্যি আধুনিক বাত্যায় পুরাকালের ভাং আর তেমন প্রশ্রয় পায় না। সেখানে এসে জুটেছেন বিলিতী মাল। সমস্ত ইন্দ্রিয় বজায় রেখে কর্মকর্তা যদি আরও কিছুদিন জীইয়ে রাখেন তো হয়তো অনেক কিছুই দেখতে হবে। তবে দুঃখ এই যে, শুধু এই নেশা করবার অপরাধেই মেয়েদের কাছে চিরজীবন অপরাধীই র'য়ে গেলুম।

একজন অল্পবয়সী সাধু ইঁদারা থেকে জল তুলে আমাদের খাওয়ালে। দিদিমণি বললে, পেট পুরে জল খা, এখানকার জল ভারি উপকারী।

জল পান করার পর আমার নেশাটা যেন আরও চ'ড়ে গেল। দিদিমণির কিন্তু কিছুই হ'ল না, সে সেই ন্যাঙট-পর কুস্তিগীর অথবা সাধুদের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করতে লাগল, আর আমি গুম হয়ে ব'সে তার রসাস্বাদন করতে লাগলুম।

কথাবার্তার মাঝখানে হঠাৎ সেই বৃদ্ধ একবার ব'লে উঠল, বাবাকে প্রণাম করবি নে ?

নিশ্চয়ই।—ব'লে দিদিমণি উঠে তার সঙ্গে চ'লে গেল মঠের একদিকে।

প্রায় দশ-পনেরো মিনিট বাদে দিদিমণি ফিরে আমার পাশে এসে বসল।

আবার কথাবার্তা গল্পগুজব শুরু হ'ল বটে; কিন্তু আমি লক্ষ্য করলুম, যেন তার কথাবার্তা অনেক পরিমাণে সংযত হয়ে পড়েছে। অত্যন্ত ধীর ও সংযত ভাবে সে তাদের কথার উত্তর দিতে লাগল। নিজের দিক থেকে তার আর কোনও প্রশ্নই নেই, দেবদর্শনে যেন তার অন্তরের সব সমস্যারই সমাধান হয়ে গিয়েছে।

বেলা প'ড়ে এল। দিদিমণি বললে, এবার উঠি। আর একদিন তাড়াতাড়ি এসে অনেকক্ষণ থাকব।

কথাবার্তা অবিশ্যি বিশুদ্ধ হিন্দী-উর্দুতেই চলছিল। এরই মধ্যে একজন যুবক বললে, মনো-মায়ি, কতদিন তোর ছেলেকে খাওয়াস নি মনে আছে?

দিদিমণি বললে, তুই তো আমার ছেলে ন'স, তুই হচ্ছিস আমার সতীনের ছেলে। তা না হ'লে, মা ম'লো কি বাঁচল তা আজ ছ'-মাসের মধ্যে একবার খোঁজ নিলি নে!

লোকটা বিমর্ষ হয়ে বললে, ছেলে কুপুত্র হ'লে মাতা কখনও কুমাতা হয় না। মাপ কর্ মনো-মায়ি, এবারে তোর ঘরে গিয়ে ছ'-মাস থাকব।

দিদিমণি বললে, ছোট্‌কার ভারি ব্যারাম, তার খোঁজ রাখিস? সে বোধ হয় বাঁচবে না, তার সঙ্গেও তো একবার দেখা করা উচিত।

সে ব্যক্তি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললে, কি করব মনো-মায়ি, মঠ ছেড়ে কোথাও যাবার উপায় এ-সময়ে একেবারেই নেই। পনেরো দিন বাদেই অমুক নাসিক থেকে ফিরে আসবে, সে এলেই তোর ওখানে চ'লে যাব।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল। আমরা উঠি-উঠি করছি, এমন সময় আমাদের গাড়োয়ান এসে বললে, সরু গলিতে গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে তার গাড়ির একখানা চাকা ভেঙে গিয়েছে।

কি সর্বনাশ! তা হ'লে উপায় কি হবে? এখান থেকে লোকালয় যে পাঁচ মাইল দূরে!

গাড়োয়ান প্রায় কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললে, আপনার যা খুশি করুন।

দিদিমণি তাকে ভাড়া চুকিয়ে দিলে। ঠিক হ'ল, সে ভাঙা গাড়িখানা এখানেই রেখে ঘোড়া-দুটো নিয়ে চ'লে যাবে। কাল এসে গাড়ি টেনে নিয়ে যাবে কিংবা এখানেই মেরামত ক'রে নেবে।

গাড়োয়ান তো ভাড়া নিয়ে চ'লে গেল। আমাদের আর ব'সে থাকা চলে না, বেরিয়ে পড়া গেল। মঠের সাধুরা কিছুদূর অবধি আমাদের এগিয়ে দিয়ে ফিরে গেল নিজেদের আস্তানায়।

সে-দিন কি তিথি ছিল জানি না। কিছুক্ষণ ঘুটঘুটে অন্ধকারের পর আকাশে একফালি চাঁদ দেখা দিলে।

দিদিমণি চলেছে আগে স্থির মন্থর পদক্ষেপে। তার মাথা থেকে পা অবধি একখানা সাদা শালে আবৃত। সে চলেছে আগে, আমি হাত-বাক্স নিয়ে চলেছি তার পিছু-পিছু। আমি লক্ষ্য করেছি, গৈবিতে সেই ঠাকুর-প্রণাম ক'রে আসবার পর থেকে সে অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হয়ে পড়েছে। আমার মনে হতে লাগল, তার সিদ্ধির নেশা বোধ হয় বেশ জমেছে। কারণ সিদ্ধি আমার দুশমন হ'লেও তার স্বভাব আমার অজ্ঞাত নয়। সে-সময় সিদ্ধির নেশা সম্বন্ধে আমাদের মহলে একটা ছড়া প্রচলিত ছিল। ছড়াটা আজ সম্পূর্ণ মনে নেই, তবে তার ভাবটা ছিল এই যে, সিদ্ধির নেশার প্রথম অবস্থায় লোকে টিয়ে-পাখির মতন মুখর হয় এবং দ্বিতীয় অবস্থায় প্যাঁচার মতন গম্ভীর হয়ে পড়ে।

দিদিমণির ওই গাম্ভীর্য দেখে সেই ছড়াটা মনে প'ড়ে আমার ভয়ানক হাসি পেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে দুষ্ট-সরস্বতী চেপে বসলেন মাথায়। একটা রসিকতা করতে যাচ্ছি, এমন সময় কোথা থেকে একটা দমকা বাতাস এসে দু-পাশের সেই ক্ষেতকে তোলপাড় করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। হঠাৎ সেই নীরব, নিথর, নুয়ে-পড়া গাছগুলো সহস্র হাতে হাততালি দিয়ে হৈ-হৈ ক'রে চিৎকার করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে দেহ-মনে একটা মধুর শিহরন জাগিয়ে আমার সমস্ত প্রগল্‌ভতাকে ভাসিয়ে নিয়ে চ'লে গেল, তার পরে সব স্থির।

দিদিমণি আগে চলেছে সেই ধীর মন্থর পদবিক্ষেপে। ডান হাতে টিনের বাক্স ঝুলিয়ে নিয়ে আমি চলেছি পশ্চাতে, কিন্তু অন্তরের দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে বদলে গিয়েছে। সেই স্তিমিত চন্দ্রালোকের আলো-আঁধারি আমার কাছে এক রহস্য ব'লে মনে হতে লাগল। আমার মনে হতে লাগল, ওই যে অবগুণ্ঠনবতী নারী চলেছে আমার সম্মুখে, সে রহস্যময়ী। দু-পাশে এই যে ক্ষেতের গাছগুলো, যারা হঠাৎ অধীর হয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে উল্লাসে চিৎকার ক'রে আবার ধরণীর দিকে নুয়ে পড়ল, তারাও রহস্যময়। এই যে চন্দ্রালোক, এও এক রহস্য। আমি কে? কোথায় ছিলুম আমি? আমার জীবনের যে ধ্রুবতারা, হঠাৎ অন্য এক ব্যক্তির জীবনের সর্বস্ব হয়ে সে চ'লে গেল, সেও এক রহস্য। আমার

মনে হতে লাগল, আমি যেন এই রহস্যের গভীরতম গভীরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছি, নিজের ইচ্ছায় নয়, কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। তার কাজ শুধু টেনে নিয়ে যাওয়া আর আমার কাজ শুধু বিস্মিত হওয়া। বিস্ময়-রসই জগতের একমাত্র রস। সমস্ত রসেরই অন্তরতম প্রদেশে আছে বিস্ময়। যে বিস্মিত হয় না, সে-ই অন্য রসে মজতে পারে।

বোধ হয় ঘণ্টাখানেকেরও ওপর পথ চ'লে আমরা লোকালয়ে এসে পৌঁছলুম। সেখান থেকে একটা ভাড়াটে গাড়ি ক'রে আমরা স্টেশনে এসে ট্রেন ধরলুম।

বাড়ি যখন ফিরলুম, তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। বাড়ির দেউড়ি পার হয়ে একটু অগ্রসর হওয়ামাত্র আহিয়ার সঙ্গে দেখা। আমাদের দেখামাত্র আহিয়া চিৎকার ক'রে এক অদ্ভুত ভাষায় কি বলতে আরম্ভ ক'রে দিলে। আহিয়ার কথা শুনে দিদিমণি আঁতকে উঠে সেই ভাষাতেই তাকে কি বললে। তুজনের একজনের কথাও কিছুমাত্র বোধগম্য হ'ল না বটে, তবে কণ্ঠস্বরের উচ্চতা ও সুরে বোধ হ'ল, বাড়িতে নিশ্চয় কিছু একটা হাঙ্গামা হয়েছে।

দিদিমণি আর বাক্যব্যয় না ক'রে শালখানা আহিয়ার গায়ে একরকম ছুঁড়ে দিয়ে ছুটল বাড়ির ভেতর দিকে। আমিও ছুটলুম তার পেছনে। আহিয়া শাল সামলাতে সামলাতে তার সাধ্যমত দ্রুতপদে আসতে লাগল আমাদের পশ্চাতে।

আমার মনে হতে লাগল, নিশ্চয় বিশুদার কিছু হয়েছে। দিদিমণিও বিশুদার ঘরের দিকেই ছুটতে লাগল। কিন্তু আমাদের ঘরের কাছাকাছি এসেই বড়কর্তার গর্জন শুনে বুঝতে পারলুম, হাঙ্গামাটা কি, ও হচ্ছে কোথায়! বুকের মধ্যে ধড়ফড় ক'রে উঠল, পরিতোষের কিছু হয় নি তো? হয়তো এতদিনের পরিকল্পিত 'জিন্দা গেড়ে' দেবার শুভকর্মটি আমাদের অনুপস্থিতিতে বড়কর্তা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন ক'রে ফেলেছেন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি, খাটের বিছানাপত্র তছনছ হয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। একধারে বড়কর্তা পরিতোষের বুকে ডান পায়ের হাঁটু দিয়ে তাকে দেওয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে, তার হাতে উদ্যত বিছুয়া আর মুখ থেকে ছুটছে অশ্লীল গালাগালি ও থুতুর অবিশ্রান্ত নির্ঝর। আমরা যে তিনটে লোক তুমদাম ক'রে ঘরের মধ্যে ঢুকলুম, সে-জ্ঞান পর্যন্ত তার নেই।

দিদিমণি সেই অদ্ভুত ভাষায় চিৎকার ক'রে উঠতেই বড়কর্তা চমকে পরিতোষের বুক থেকে পা নামিয়ে আমাদের দিকে ফিরে চাইলে।

তার পরে উঠল কথার ঝড়। তুই পক্ষে সেই ভাষায় তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে

গেল। আমি পরিতোষের কাছে যেতেই সে কাঁদতে শুরু করে দিলে। দেখলুম, তার কনুইয়ের কাছে ছোরার একটা খোঁচা লেগে দরদর ক'রে রক্ত ঝরছে।

ওদিকে দিদিমণি ও বড়কর্তার চিৎকার চলতে লাগল। তার সঙ্গে আহিয়াও রীতিমত যোগ দিলে। চারদিক থেকে ঝি-চাকর ও পাহারাদারদের দল ছুটে এসে জমা হতে লাগল দরজার সুমুখে।

সেই ঝগড়ায় মধ্যেই আমি পরিতোষকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছিল রে ?

পরিতোষ কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, কি আবার হবে ? ঘরে এসে গালাগালি দিতে আরম্ভ ক'রে দিলে। বললে, ছোট্‌কার সঙ্গে তোর অত ভাব কিসের ? ভালোমানুষ পেয়ে বেশ দু-পয়সা হাতাচ্ছিস তো ওর কাছ থেকে ?

আমার দোষের মধ্যে আমি বলেছিলুম, হ্যাঁ, পয়সা হাতিয়ে এবার এখানে একটা বাড়ি কিনব ঠিক করেছি।

আর যায় কোথায়! ছোরা বের ক'রে বললে, আজ তোর শেষদিন।

তোরা না এসে পড়লে ঠিক ছুরি বসিয়ে দিত।

পরিতোষ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, বাপ-মাকে দুঃখ দিয়ে চ'লে এসেছি, এসব তো হবেই।

কান্নার বেগ একটু সামলে পরিতোষ বলতে লাগল, রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে খাব, কিন্তু এখানে আর নয়। তুই এখানে থাক্।

পরিতোষের মুখে সেইসব মর্মান্তিক কথা শুনে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। মনে হ'ল, সত্যিই তো! তার তো জীবনে কোনও দুঃখই ছিল না। বাপ-মা ভাই-বোন নিয়ে আনন্দেই তার দিন কেটে যাচ্ছিল। এই অভাগ্যের জন্যই তো সে গৃহত্যাগ ক'রে অনিশ্চিত অদৃষ্টসাগরে জীবনতরী ভাসিয়ে দিয়েছে।

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, ঠিক বলেছিস। কালই আমরা এখান থেকে চ'লে যাব—দেখি, অদৃষ্টে আর কত দুঃখ লেখা আছে!

ওদিকে তখন বড়েসাহেব ও দিদিমণি সেই অদ্ভুত ভাষা ছেড়ে আভিধানিক হিন্দীতে ঝগড়া শুরু করেছে। মাঝে মাঝে 'সড়া অন্ধা'র মতন মাতৃভাষাতেও দু-চারটে বকুনি বেরিয়ে পড়ছে।

ঝগড়া করতে করতে হঠাৎ একবার ফিরে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দিদিমণি আমার দিকে তাকালে। বুঝতে পারলুম, ওই হাঙ্গামার মধ্যেও আমাদের কথাবার্তার অনেকখানিই তার শ্রুতিগোচর হয়েছে।

বড়কর্তা তখনও বকবক ক'রে ব'কে চলেছিল। আমাদের দিক থেকে মুখ

ফিরিয়ে নিয়ে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে দিদিমণি বড়সাহেবকে হুকুম করলে, বেরিয়ে যাও এ-বাড়ি থেকে।

কথাটা শুনে বড়কর্তা একমুহূর্তের জন্যে হকচকিয়ে গিয়ে বিশুদ্ধ বাংলাভাষায় বললে, এ কি তোর বাপের বাড়ি রে শালী যে, বেরিয়ে যেতে বলছিস ?

একটা জিনিস আমি ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ্য ক'রে আসছি যে, বাঙালী পুরুষ প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। অবিশ্যি এজন্যে তাদের আমি দোষ দিই না। কারণ, সম্পর্কের তাল বজায় রেখে নারীজাতিকে মোক্ষমরূপে আহত করবার মতন বাক্যবাণ আমাদের মাতৃভাষায় নেই। মা, মাসী, পিসী, বোন, স্ত্রী, কন্যা, ভাগ্নীদের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে এই অভাব বার বার অনুভব ক'রে কতবার যে ধর্মযুদ্ধে পরাভূত হয়েছি তার আর ইয়ত্তা নেই।

বড়কর্তার কথা শুনে দিদিমণি একেবারে স্থির কাঠের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে রইল। আহিয়া চেঁচিয়ে বড়কর্তাকে কি-সব বলতে লাগল, কিন্তু সে তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। হঠাৎ দৃপ্ত ভঙ্গীতে স্থির, শান্ত, অথচ দৃঢ়কণ্ঠে দিদিমণি বললে, আমার বাপের বাড়ি হ'লে এটা তোমারও বাপের বাড়ি হ'ত। কিন্তু এটা আমার নিজের বাড়ি—আমার পয়সায় আমার নামে এ-বাড়ি কেনা হয়েছে। এখুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, নইলে পাহারাদারকে দিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে তোমায় বের ক'রে দেব। খবরদার, আর এখানে কখনও আসবে না। শয়তান! ছোটলোক!

দিদিমণির কথা শুনে বড়কর্তা একেবারে দ'মে গেল। হাতে খোলা বিছুয়া, ঘাড় নীচু ক'রে ধীর পদক্ষেপে দরজার দিকে অগ্রসর হতে হতে হঠাৎ ফিরে বললে, যাদের জন্যে তুই আমাকে এতখানি অপমান করলি, তাদের একটাকে আজ শেষ ক'রে দিয়ে যাব।

কি সর্বনাশ! জয় বাবা বিশ্বনাথ!

বড়কর্তা ছোরা তুলে আমাদের দিকে তেড়ে আসতেই দিদিমণি দু-হাত তুলে বিকট চিৎকার ক'রে মাঝখানে এসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে বড়কর্তার বিছুয়া তার বাঁ-হাতের তর্জনীটা প্রায় দুখানা ক'রে দিলে।

ইত্যবসরে আমরা ছুটে ছাতে বেরিয়ে গিয়ে পাহারাদারদের হাত থেকে লম্বা লাঠিটা কেড়ে নিয়ে দাঁড়ালুম। উদ্দেশ্য, ঘর থেকে বেরুলেই এক-লাঠিতে বড়কর্তার মাথাটি দু-ফাঁক ক'রে দেব।

আহত হয়ে দিদিমণি চিৎকার ক'রে ঘুরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, আহিয়ার মড়াকান্নায় পাড়া উঠল কেঁপে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত থেকে লাঠিখানা খ'সে সশব্দে প'ড়ে গেল।

দরজার মুখে এতক্ষণ যত ঝি-চাকর দাঁড়িয়ে ছিল, তারা কলরব করতে-করতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। চেঁচামেচি শুনে বিশুদা তার লাঠির ওপরে ভর দিয়ে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে এসে উপস্থিত হ'ল। দেখলুম, বড়কর্তা ছোরাখানা খাপের মধ্যে পুরে সেটাকে কোমরের মধ্যে গুঁজে ভিড় ঠেলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে হনহন ক'রে চ'লে গেল।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি, রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে। বিশুদা দিদিমণির মাথার কাছে বিষণ্ণ মুখে ব'সে আছে; আহিয়া ছেঁড়া নেকড়া দিয়ে দিদিমণির আঙুলটা বাঁধবার চেষ্টা করছে; দেখলুম, আঙুলটা নড়নড় করছে।

সে-রাত্রে বাবুজী বাড়িতে ফিরে আহিয়া ও চাকর-বাকরদের মুখে সব শুনে, দিদিমণির ক্ষত সেলাই ক'রে হাতের কব্জি অবধি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে হাতখানা গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে তাকে শুয়ে পড়তে বললেন।

বাড়িতে অতবড় একটা কাণ্ড ঘ'টে গেল; কিন্তু সে-সম্বন্ধে তিনি কোনও মন্তব্য করলেন না, শুধু পরিতোষকে আদর ক'রে বললেন, তুমি আমায় ক্ষমা কর বাবা, এসব আমারই দোষ।

সে-রাত্রে আমাদের ঘরেই ঢালা বিছানা ক'রে দিদিমণি, বিশুদা, আহিয়া ও আমরা সব শুয়ে পড়লুম, শুধু বাবুজী নিজের ঘরে চ'লে গেলেন।

শেষরাত্রে একবার ওঠবার দরকার হয়েছিল। উঠে দেখলুম, ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে, দিদিমণি তখনও জেগে রয়েছে, অদ্ভুত একরকম উদাসদৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাইতে লাগল।

ছাত থেকে ঘুরে এসে তার পাশে এসে ব'সে মাথায় হাত দিয়ে মনে হ'ল, খুব জ্বর হয়েছে।

বললুম, ঘুমোও নি?

ঘুম আসছে না।

জ্বরে কি খুবই কষ্ট হচ্ছে?

ও কিছু না, কালই সেরে যাবে। ছোট্‌কার গায়ে রেজাইটা ভালো ক'রে চাপা দিয়ে তুই শুয়ে পড়্।

বিশুদার গায়ে লেপটা ভালো ক'রে চাপা দিয়ে আবার দিদিমণির শিয়রে

এসে বসলুম। দিদিমণি একটা হাত উঁচু ক'রে আমার ঘাড় ধ'রে মুখটা তার মুখের কাছে টেনে নিয়ে এসে কানে কানে বললে, আমার ওপরে খুব রাগ হয়েছে তোদের, না?

কিছু না।—ব'লে তার কপালে ও চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে তাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলুম, তার পর ক্লান্ত হয়ে নিজেই কখন তার মাথার কাছে শুয়ে পড়লুম মনে নেই।

ভোর হতে-না-হতে ঘুম ভেঙে গেল।

বোধ হয় দিন-পনেরোর মধ্যেই দিদিমণি চাঙ্গা হয়ে উঠল। শুধু বাঁ-হাতের তর্জনীটা একটু বেঁকে রইল মাত্র। আবার পুরনো দিনের মতন সেই শেষরাত্রে উঠে স্নান ও সারাদিন ধ'রে সংসারের কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল।

সেই ব্যাপারের পর থেকে বড়কর্তা বাড়িতে আসা একেবারে ছেড়ে দিলে। নিশ্চিন্ত আরামে ভবিষ্যৎ-ভাবনা-মুক্ত দিন কাটতে লাগল। ডাক্তারখানার সঙ্গে দিদিমণির সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কারণ সে-ব্যাপারের পর ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে, সেখানকার সমস্ত হিসাবপত্র বড়কর্তাই দেখবে, লাভ-লোকসান সে-ই ভোগ করবে ; কিন্তু অর্থের প্রয়োজন হ'লে বাড়ি থেকে আর কিছুই দেওয়া হবে না। বাবুজী যে-সব মাসোহারা পান ও দৈনিক রুগী দেখে ভিজিটের দরুন যা পান ও তাঁর পেন্‌শনের সব টাকা বাড়িতেই আসবে।

বাবুজী রোজ রাত্রে বাড়ি ফিরে সেদিনকার ভিজিটের টাকা-ক'টি দিদিমণির হাতে দিয়ে দেন, তারই একটা হিসাব প্রতিদিন আমাকে রাখতে হয়। প্রতি-দিনের বাজার, গরুর খরচ, চাকর-বাকরদের খরচ সব পরিতোষের হাতে। রোজ সকালবেলা সে হিসেব দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায়, সন্ধ্যে হ'লে আমরা তিনজনে ব'সে সারাদিনের হিসেব চুকিয়ে বিশুদার ঘরে গিয়ে গল্প ক'রে রাত্রি দশটার সময় খেয়ে-দেয়ে নিজেদের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ি। আগ্রার বাঙাল ব্যাঙ্কে দিদিমণির নগদ টাকা গচ্ছিত আছে, ছ'-মাস অন্তর তার সুদ আনতে যেতে হয় সেখানে বাবুজীকে। ছ'-মাসের সুদ প্রায় চারহাজার টাকা। ঠিক হয়েছে, এবার থেকে আর বাবুজী যাবেন না, দিদিমণিকে নিয়ে আমি আর পরিতোষ যাব। দিদিমণির শ্বশুরবাড়ির দেশে তার একটা বড় গ্রাম আছে

জমিদারি, যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন বাড়ির বড়বউ হিসাবে তার উপস্বত্ব সে ভোগ করবে। সেখানকার আমদানি বছরে প্রায় তিনহাজার টাকা। প্রতিবছর বৈশাখ মাসের শেষে বাবুজীকে সেখানে গিয়ে দশ-পনেরো দিন ক'রে থাকতে হয়। ঠিক হয়েছে, এবার বৈশাখের শেষে দিদিমণিকে নিয়ে আমি, পরিতোষ ও বাবুজী সেখানে যাব। বছর দু-তিন পরে আর দিদিমণি কিংবা বাবুজী কারুকেই যেতে হবে না। আমি আর পরিতোষ যাব, আমরা ততদিনে সাবালক হয়ে যাব কিনা, আমাদের নামে দিদিমণি ওকালতনামা দিয়ে দেবে।

এই ফাঁকে ফাঁকে দুই বন্ধুর পরামর্শ চলতে থাকে, রাজকুমারীর প্রতিশ্রুতির প্রশ্রয়ে বেড়ে-ওঠা আমাদের সেই বিরাট বস্ত্র-ব্যবসায়, যা বিনা কারণে অতি অকস্মাৎ একদিন ফেল পড়েছিল, তারই কথা। ঠিক ক'রে রাখা গেছে, দিদিমণির কাছ থেকে টাকা নিয়ে আবার সেই ব্যবসা জাঁকিয়ে তুলতে হবে, চিরদিন কোথাও অন্নদাস হয়ে থাকা চলতে পারে না। ব্যবসা কিছুদিন চলবার পর টাকা শুধে দিলেই চলবে।

মনে পড়ছে সেই দিনগুলির কথা। শীতান্তের উতলা বাতাসে দেখ্-দেখ্ ক'রে প্রকৃতি মাতাল হয়ে উঠল। দিনরাত্রি হু-হু হাওয়া আর বড় বড় গাছের উল্লাস ও চিৎকারে ধরণী মুখরিত। বিকালবেলা মাঝে মাঝে আমরা রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়ে পড়ি, গাছগুলো নতুন পাতায় একেবারে চিক্কণ সবুজ। মধ্যে মধ্যে এক এক ঝোঁক বাতাস ওঠে হা-হা ক'রে, আর সেগুলো থেকে ঝরঝর ক'রে শুকনো পাতা খ'সে পড়তে থাকে চারিদিকে, সজীব বড় বড় গাছগুলোর মধ্যে কোথায় এত শুকনো পাতা লুকিয়ে থাকে, এমনিতে তা বোঝা যায় না। কলকাতার জীব আমরা, প্রকৃতির এই অপরূপ রীত এর আগে দেখি নি—

আর মনে পড়েছে সেদিন সকালের কথা—দিন ছিল রবিবার। বাবুজীর কাশী যাবার তাড়া নেই। চা-জিলিপির পর্ব তখনও শেষ হয় নি, এমন সময় দিদিমণি কাগজ ও দোয়াত-কলম নিয়ে এসে হাজির হ'ল আমাদের ঘরে। বললে, আজ তোরা দুজনে কাশীতে গিয়ে এই জিনিসগুলো কিনে আন্, আমি খাবার তৈরি করতে বলেছি, খেয়ে বেরিয়ে যা, সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে আসবি।

জিনিসপত্রের লম্বা ফর্দ তৈরি হ'ল। মনে আছে, তার মধ্যে আমাদের জন্যে তিন জোড়া ক'রে ধুতি, চারটে ক'রে শার্ট ও এক জোড়া ক'রে জুতো।

তা ছাড়া বাবুজীর পা-জামা ও ফতুয়ার জন্যে এক থান সবচেয়ে ভালো লাঠ্‌টা অর্থাৎ লংক্লথ, তা ছাড়া আরও কত কি জিনিস!

হিসেব ক'রে দেখা গেল, সব জিনিসের দাম সত্তর টাকার কিছু বেশি হবে। দিদিমণি আঁচলের গেরো খুলে একখানা একশো টাকার নোট আমার হাতে দিয়ে বললে, সাবধানে রাখ্।

নিজের হোক বা পরের হোক, একশো টাকার নোট হাতে করবার সৌভাগ্য জীবনে এর আগে আমার হয় নি। আজকের দিনে এক প্যাকেট সিগারেট কিনলে বিড়িওয়ালার দোকানে যেমন একশো টাকার নোটের ভাঙানি পাওয়া যায়, সেদিন তেমন ছিল না। একশো টাকার নোট তখনকার দিনে নম্বরী নোটের মধ্যে গণ্য ছিল। বয়স্ক লোকেরা সে-নোট ভাঙাতে গেলেও উল্‌টো পিঠে নাম-ঠিকানা লিখে দিতে হ'ত, ছেলেমানুষের হাতে দেখলে দোকানদারেরা হয় তাকে ফিরিয়ে দিত, নয়তো পুলিস ডেকে ধরিয়ে দিত।

একশো টাকার নোট নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সুবিধা না পেলেও এসব বিষয়ে আমরা ওয়াকিবহাল ছিলুম। নোটখানা হাতে নিয়েই বললুম, সর্বনাশ! এ-নোট দেখলে দোকানদার নিশ্চয় আমাদের পুলিসে দেবে।

দিদিমণি বললে, দূর, তাও কি কখনও হয়!

শেষকালে মীমাংসার জন্যে বাবুজীর কাছে যাওয়া হ'ল। বাবুজী বললেন, ওরা ঠিকই বলেছে। ছেলেমানুষদের হাতে ও-নোট দেখলে হাঙ্গামা হতে পারে, ওদের খুচরো টাকা দিয়ে দাও।

দিদিমণির হাতে খুচরো অত টাকা নেই। শেষকালে বাবুজীই দশটা দশ-টাকার নোট দিয়ে আমাদের হাত থেকে সেই নোটখানা নিয়ে নিজের মনিব্যাগে পুরে রাখলেন।

যতদূর মনে পড়ছে, পাঁচটাকার নোটের আবির্ভাব তখনও হয় নি।

ট্যাঁড়সের এক চচ্চড়ি দিয়ে দিস্তে-খানেক ক'রে আটার ফুলকো লুচি মেরে বাকি জায়গা দুধে ভর্তি ক'রে আমরা বেরিয়ে পড়লুম কাশীর উদ্দেশে।

* * *

আবার সেই রাজঘাট স্টেশন।

প্রথম যেদিন সন্ধ্যারাত্রে শীতে কাঁপতে কাঁপতে এইখানে ট্রেন থেকে নেমে পড়েছিলুম, সেদিন থেকে আজকের দিনে কত প্রভেদ! সেদিন আমাদের জীবনের ভবিষ্যৎ-আকাশ ছিল দিগন্তবিস্তৃত মেঘে সমাচ্ছন্ন। বিশ্বনাথের দয়ায়

আজ সে-মেঘ অপসারিত হয়েছে। ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্ন হাসি কল্পনার পরকলা দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে ভবিষ্যৎ হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল। আশ্বাসে বুক ভরা, ট্যাঁকও পয়সায় ভর্তি।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে একখানা এক্কা ভাড়া করা গেল চৌক অবধি, সেখান থেকে জুতো কিনে দশাশ্বমেধ ঘাটে যাব, সেখানে বাঙালীদের বড় কাপড়ের দোকান আছে।

চৌকে নেমে দু-তিনটে জুতোর দোকানে ঘুরলুম, কিন্তু জুতো আর পছন্দ হয় না। শেষকালে রাস্তার ধারেই একটা বাড়ির দেওয়ালে আলমারি-ঝোলানো এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আলমারিতে সাজানো জুতোগুলো দেখছি আর দোকানদারের সঙ্গে দর-দাম নিয়ে কথাবার্তা চলছে, এমন সময় একটা তীব্র চিৎকার কানে এল, এই যে শালার ছেলে!

চমকে উঠে ফিরে দেখি, আমাদের বড়কর্তা অর্থাৎ বড়ভাই অর্থাৎ কিনা শ্রীযুক্ত অমরনাথ বন্দ্যোউপাধ্যায় মহাশয় অক্টোপাসের মতন পরিতোষের একখানা হাত আঁকড়ে ধরেছে। ভয়ে বেচারার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

বড়কর্তা পরিতোষের গালে বিরাশী-সিক্কা ওজনের একটি চড় কষিয়ে হুঙ্কার ছাড়লে, এবার তোর কোন্ বাবায় বাঁচাবে রে শালা?

পরিতোষ বেচারা চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। দেখলুম, তার গালে ও ঘাড়ের খানিকটা জায়গায় লম্বা-লম্বা আঙুলের দাগ লাল হয়ে ফুটে উঠল।

আমি বললুম, কেন ওকে মারছেন? কি করেছে ও আপনার?

লোকটা 'চোপ' ব'লে আচমকা আমার কোমরে একটা লাথি লাগাতেই আমি একেবারে রাস্তায় লুটিয়ে পড়লুম। ব্যাপার বিশেষ সুবিধার নয় বুঝে উঠে পালাবার যোগাড় করছি, এমন সময় বড়কর্তা চিৎকার ক'রে উঠল, পাকড়ো শালেকো।

এতক্ষণে দেখতে পেলুম, বড়কর্তাকে ঘিরে চার-পাঁচজন দুশমন-চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে একটা লোক দৌড়ে এসে আমাকে ধ'রে আমারই কোঁচাটা দিয়ে বাঁ-হাতের বাহুতে এমন জোরে একটি বন্ধন লাগালে যে, হাতখানা ঝিমঝিম করতে করতে একেবারে অবশ হয়ে গেল।

ওদিকে বড়কর্তা পরিতোষের মুখে চড় ঘুষি ও তার চেয়ে নিদারুণ খিস্তি চালিয়ে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে আমাদের ঘিরে লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠল।

জুতোওয়ালা সামান্য একটু আপত্তি জানাতেই বড়কর্তা চিৎকার ক'রে বলতে লাগল, এই হারামজাদারা খেতে পেত না, রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াত, আমার ছোটভাই দয়াপরবশ হয়ে এদের বাড়িতে নিয়ে এসে মানুষ করছিল ; কিন্তু শেষকালে নিমকহারামেরা তার বাক্স ভেঙে টাকা চুরি ক'রে পালিয়েছিল, আজ ধরেছি। চল্ শালা কোতোয়াল—

বাস্, আর যায় কোথায়! বড়কর্তার মুখ দিয়ে এই বাক্যটি বেরুনো মাত্র সেই ভিড় ভেঙে পড়ল চারিদিক থেকে আমাদের ওপরে। তারপর ঘুষি কিল চড় লাথি, যার যাতে হাত বা পা আসে তাই লাগাতে আরম্ভ করলে। চোখের সামনে দেখলুম, পরিতোষ এলিয়ে পড়ল পথের ওপরে। কিন্তু তখন আমার আর অন্য কারও দিকে দেখবার অবসর নেই,—বাঁ-হাতখানা অন্য লোকের কবলে, ডান হাত দিয়ে যতটা সম্ভব নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু কত আটকাব! তিন-চার মিনিটের মধ্যেই চোখের সম্মুখে ফুটে উঠল বিস্তীর্ণ সরষের ক্ষেত।

সংসারে কোনও জিনিসই বৃথা যায় না। শৈশব থেকেই পিতৃহস্তে যে তালিম পেয়েছিলুম, এতদিন পরে তা সত্যিকারের কাজে লাগল, এত প্রহার সত্ত্বেও কিন্তু আমি জ্ঞান হারাই নি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলতে লাগলুম।

ও-দিকে বোধ হয় ভিড় বাড়ছে দেখে বড়কর্তার দল আমাদের টানতে-টানতে নিয়ে চলল কোতোয়ালির দিকে।

পরিতোষের দিকে ফিরে দেখলুম, তার মুখখানা ফুলে এক অদ্ভুত রকমের দেখতে হয়েছে। আমার মুখও যে ফুলে উঠেছে, তা চোখে না দেখলেও বেশ বুঝতে পারছিলুম।

অঙ্গের বেদনায় এক-পা চলতে পারি না এমন অবস্থা। আমাদের দুজনকে একরকম হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরিতোষকে ধরেছে বড়কর্তা, আর আমাকে যে ধরেছে তার চেহারা ভিক্তোর হুগোর কল্পনারও অতীত।

সামনেই কোতোয়ালির লাল প্রাসাদোপম অট্টালিকা। মনে করেছিলুম, আমাদের বোধ হয় সেইখানেই নিয়ে যাওয়া হবে, কিন্তু সেখানে না নিয়ে গিয়ে তারা ঠিক কোতোয়ালির পাশেই একটা সরু রাস্তা দিয়ে আমাদের টেনে নিয়ে চলল, পশ্চাতে বিপুল জনসংঘ।

সরু একটা গলিতে ছোট একখানা বাড়ির সামনে এসে আমরা দাঁড়ালুম, পেছনে তখনও অনেক লোক। বড়কর্তা তাদের একটা ধমক দিয়ে কি-সব

বলতেই ভিড় কিছু পাতলা হ'ল বটে, কিন্তু তখনও কেউ কেউ দাঁড়িয়ে রইল মজা দেখতে। বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল। বড়কর্তা জোরে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল।

বাড়িটা এত নীচু যে রাস্তা থেকে লাফিয়ে দোতলার রাস্তার ধারের জানলার খড়খড়ি ধ'রে ফেলা যায়। দরজা খুলে যাওয়ামাত্র লোকগুলো আমাদের টেনে একরকম হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে তুলতে লাগল। সিঁড়ির মাথাতেই একটা সরু বারান্দা, তার গায়ে ঘর। আমরা ওপরে পৌছবার আগেই ঘর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে ব্যাপার দেখে 'থ' হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার ?

এ দলের লোকেরা কিন্তু তার কথার কোনও জবাব না দিয়ে আমাদের টানতে-টানতে মেয়েটি যে-ঘর থেকে বেরিয়েছিল, সেই ঘরে নিয়ে গেল।

যাই হোক, এতক্ষণে নারীমূর্তি দেখে মনে আশা জাগতে লাগল, হয়তো এবার এই নিরর্থক নির্যাতনের কবল থেকে মুক্তি পাব।

ঘরখানা অত্যন্ত ছোট ও নীচু, লাফিয়ে হাতে হাত লাগানো যায়। ঘর-জোড়া একটা ময়লা শতছিন্ন শতরঞ্জি পাতা। এক কোণে প্রায় চৌকো একটা গদির ওপরে ময়লা বিচিত্র দাগ-ধরা চাদর পাতা। ওরা আমাদের দুজনকে সেই গদির ওপরে একরকম ছুঁড়েই ফেলে দিলে। তার পরে বড়কর্তা গদির ওপর উঠে এক কোণে ব'সে হাঁক দিলে, দুলারী, জল খাওয়া এক গেলাস।

দুলারী তাড়াতাড়ি একটা মুরাদাবাদী গেলাসে জল ভ'রে এনে দিলে। বড়কর্তা স্রেফ এক ঢোকে সেটা শেষ ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে গেলাসটা তার হাতে ফিরিয়ে দিলে। এতক্ষণে বড়কর্তার অনুচরের দল কেউ-বা শতরঞ্জির ওপর, কেউ-বা গদিতে উঠে বসল।

দুলারী গেলাসটা যথাস্থানে রেখে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি ?

বড়কর্তা একবার রোষকষায়িত লোচনে আমাদের দিকে চেয়ে বললে, আজ শালাদের ধরেছি।

কথাটা ব'লেই পরিতোষের হাতের বাঁধনটা ধ'রে এক টানে তাকে কাছে টেনে নিয়ে এসে মারলে একটা চড়।

দুলারীর দিকে ফিরে একবার তাকে ভালো ক'রে দেখে নিলুম, বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুন্দরী স্ত্রীলোক। আশা করছিলুম, এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে

হয়তো কিছু বলবে; কিন্তু তার চোখে বিপুল কৌতূহল ছাড়া সহানুভূতির চিহ্নমাত্রও দেখতে পেলুম না।

বড়কর্তা দুলারীকে সম্বোধন ক'রে বলতে লাগল, সেই যে কলকাতার ছোঁড়া-দুটোর কথা তোকে বলেছিলুম, আমাদের বাড়ি থেকে বাক্স ভেঙে পালিয়েছিল, আজ রাস্তায় ধরেছি।

এই কথা ব'লেই আবার সে পরিতোষকে মারতে আরম্ভ ক'রে দিলে, পরিতোষ নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

এবার আমি মরিয়া হয়ে উঠলুম। ইতিমধ্যে হাতের বাঁধন খুলে কোঁচা দিয়েছিলুম। দাঁড়িয়ে উঠে, যতটুকু হিন্দী-জ্ঞান তখন হয়েছিল, সেই ভাষাতেই দুলারীর দিকে চেয়ে বললুম, এসব আগাগোড়া মিথ্যে কথা। প্রমাণ চাও তো তোমরা সবাই চল ওদের বাড়িতে। তারা যদি বলে, আমরা টাকা ভেঙে পালিয়েছি তো যত টাকা তারা বলবে, তার ডবল টাকা গুনে ওদের নাকের ওপরে ফেলে দেব। আমরাও ভিখিরীর ছেলে নই।

তার পরে বড়কর্তাকে সোজাসুজি ব'লে দিলুম, তোমার মতন দশ-পনেরোটা বদমাইশ আমার বাড়িতে দারোয়ানের কাজ করে। আর চুরি যদি ক'রেই থাকি, তা হ'লে আমাদের পুলিসে দিয়ে দাও, বুঝিয়ে দেব কত ধানে কত চাল হয়!

আসর এবারে নিস্তব্ধ। সবার মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, এক বড়কর্তা ছাড়া আর সকলেই বিস্মিত।

আমি উৎসাহিত হয়ে আবার শুরু করলুম, আমাদের মেরেছ ভালোই করেছ, যদি নিজে বাঁচতে চাও তো একেবারে মেরে ফেল, নইলে তোমার বরাতে দুঃখ আছে ব'লে দিচ্ছি।

আমার কথা শেষ হতে-না-হতে বড়কর্তা ক্ষিপ্ত হয়ে একরকম লাফিয়ে এসে, 'তবে রে' ব'লেই আমার মুখে মারলে এক ঘুষো।

দুলারী হাঁ-হাঁ চিৎকার ক'রে আমাদের দুজনের মাঝে প'ড়েও বাঁচাতে পারলে না, নাক দিয়ে আমার ঝরঝর ক'রে রক্ত পড়তে লাগল।

রক্ত দেখে দুলারী মহা চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিলে। সে বলতে লাগল, আমার বাড়িতে এসে এসব খুনোখুনি চলবে না, সেসব করতে হয় তো ওদের নিয়ে অন্য কোথাও চ'লে যাও। আমি আগে থাকতে ব'লে দিচ্ছি, আমাকে নিয়ে যদি শেষে টানাটানি হয় তো কারুর ভালো হবে না।

ঠারে-ঠোরে বুঝতে পারলুম, এর আগে এখানে খুন-খারাবিও হয়ে গিয়েছে এবং এদের বাঁচাতে গিয়ে তুলারীকে যথেষ্ট হাঙ্গামাও পোয়াতে হয়েছে।

তুলারীর ওই চেঁচামেচি শুনেও কিন্তু আমার মনে কোন ভয়েরই উদ্রেক হ'ল না, বরঞ্চ সমস্ত বিশ্ব-সংসারের প্রতি একটা দারুণ অভিমান মনে হতে লাগল, এরা যদি এখানে আমাদের সত্যিই মেরে ফেলে, তা হ'লে ভালোই হয়। নিত্য বিনাদোষে এই অপমান আর সহ্য হয় না।

ইতিমধ্যে তুলারী চেঁচাতে চেঁচাতে এক গেলাস জল গড়িয়ে অঞ্জলি ভ'রে আমার নাকে ছিটিয়ে দিতে আরম্ভ করলে, জামা-কাপড় রক্ত ও জলে ভিজে যেতে লাগল।

মনে হ'ল, তুলারীর চিৎকারে বড়কর্তা একটু যেন দ'মে গেল। সে তার কথার কোন জবাব না দিয়ে ট্যাঁক থেকে একটা সিকি বার ক'রে সামনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, এক প্যাকেট রেলওয়াই সিগারেট নিয়ে আয় তো।

একটা লোক সিকিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমার নাকের রক্ত-পড়া ক'মে গেল বটে, কিন্তু ভেতরটা খুব জ্বালা করতে লাগল। আমি কোঁচা দিয়ে নাকটা চেপে ধ'রে ব'সে রইলুম। একটু দূরেই পরিতোষ ব'সে নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, দেখতে দেখতে তার মুখখানা অসম্ভব রকমের ফুলে উঠতে আরম্ভ করল।

একটু বাদে তুলারী আমাকে প্রশ্ন করলে, তোমরা কবে কাশীতে এসেছ?

আজ সকালে। এই ঘণ্টাদেড়েক আগে।

এই যে বাবু বললে, তোমরা ওদের বাড়ি থেকে টাকা ভেঙে অনেকদিন হ'ল পালিয়েছ?

ওসব মিথ্যে কথা। ও আজ পনেরো দিন আগে ওর বোনকে ছুরি মেরে বাড়ি থেকে চ'লে এসেছে, ওকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয় না, তাই আমাদের ওপরে এত রাগ।

আমার কথা শেষ হতে-না-হতে বড়কর্তা সিংহের মতন গর্জন ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, কেয়া বোলা! আজ তুঝে মার হি ডালুঙ্গা—

ব'লেই কোমর থেকে সাঁই ক'রে সেই সনাতন বিছুয়া বার ক'রে ফেললে।

পরিতোষ সেই দৃশ্য দেখে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল, নিমেষের মধ্যে আমাদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে তুলারী বললে, খবরদার, ওসব করতে

চাও তো এদের নিয়ে অন্যত্র চ'লে যাও, নইলে এখুনি আমি কোতোয়ালিতে খবর পাঠাব।

বড়কর্তা হঠাৎ যেমন দাঁড়িয়ে উঠেছিল, ডুলারীর সেই মূর্তি দেখে ও কথা শুনে তেমনই ধড়াস ক'রে ব'সে পড়ল।

ইতিমধ্যে তার অনুচর এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসায় একটা ধরিয়ে সে নির্বিকারভাবে সাঁ-সাঁ ক'রে টানতে শুরু ক'রে দিলে।

ডুলারী আবার আমায় জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ ভাই, তো কাশী কি করতে এসেছিলে আজ?

আমি বললুম, দিদিমণি ও বাবুজী অর্থাৎ ওঁর বোন আর ওঁর বাবা আমাদের কাশী পাঠিয়েছেন বাড়ির কতকগুলো জিনিস কেনবার জন্যে।

এবার ডুলারী বড়কর্তার দিকে ফিরে বললে, শুনা তুম্‌নে?

বড়কর্তা সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বললে, শুনিস কেন ওদের কথা!

তার পর বললে, কোথায় কি জিনিস কিনতে দিয়েছে দেখি?

ফর্দখানা আমার কাছে ছিল, পকেট থেকে বের ক'রে ডুলারীর হাতে দিতেই ফস ক'রে কাগজখানা সে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, এ বাংগালীতে লিখেছে, তুই বুঝতে পারবি নে।

অনেকক্ষণ ধ'রে বানান ক'রে ফর্দখানা প'ড়ে সে বললে, টাকা কোথায়?

টাকা পরিতোষের কাছে ছিল। সে পকেট থেকে নোটের তাড়াটা বের ক'রে তার হাতে দিতেই সে গুনে দেখে তার অনুচরদের নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমরা ডুলারীর ঘরে ব'সে রইলুম।

কিছুক্ষণ পরে ছাতের সিঁড়ি দিয়ে এক অতি বৃদ্ধা নেমে এসে ডুলারীকে কি-সব বললে, বোধ হয় রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে। তার সঙ্গে কি-সব আলোচনা ক'রে ডুলারী ওপরে উঠে গেল, আমরা দুজনে সেই গদির দু-কোণে গাড্ডু হয়ে ব'সে রইলুম।

অদৃষ্টের এই নতুন প্যাঁচে উভয়েই কাত, কারুর মুখে কোনও কথা নেই। হঠাৎ পরিতোষ তার আঙুল থেকে দিদিমণির দেওয়া সেই আংটিটা খুলে আমায় দিয়ে বললে, এটা লুকিয়ে রাখ্।

আমি তাড়াতাড়ি কাছার খুঁটে আংটিটা বেঁধে ফেললুম।

দুজনে দু-কোণে ব'সে আছি। পরিতোষ চোখ বুজে—আমার নাক চাপা থাকলেও চোখ-দুটো তার দিকে স্থিরনিবদ্ধ। হাঠাৎ মনে হ'ল, যেন সে থরথর

ক'রে কাঁপছে, দেখতে-না-দেখতে কাঁপতে কাঁপতে সে গদির ওপরে এলিয়ে পড়ল। আমি উঠে গিয়ে তার মাথায় হাত দিতেই সে বললে, বড্ড শীত করছে রে।

পরিতোষ আচ্ছন্নের মতন প'ড়ে রইল, আর আমি তার মাথার কাছে নাকে কাপড় চেপে ব'সে রইলুম।

দুলারী সেই যে ওপরে গিয়েছিল, আর সে নামল না। মধ্যে মধ্যে তাদের কথাবার্তা, রান্নার আওয়াজ ও গন্ধ নাকে ও কানে এসে পৌঁছতে লাগল।

বোধ হয় ঘণ্টা-দেড়েক এইভাবে কেটে যাওয়ার পর, বড়কর্তা তার দলবল নিয়ে ফিরে এল, প্রত্যেকে একেবারে মদে চুরচুরে হয়ে। আমি মনে করেছিলুম, আমাদের অঙ্গসেবা ক'রে বোধ হয় মনে অনুতাপ হওয়ায় আমাদের হয়ে সে জিনিসপত্র কিনতে গিয়েছিল। হায় রে আশা!

বড়কর্তা ঘরে ঢুকতেই আমাদের বললে, এই, ওঠ্।

পরিতোষ তখনও চোখ বুজে প'ড়ে, তাকে ঠেলে-ঠুলে দাঁড় করালুম। সে একরকম আমার ওপরেই ভর ক'রে দাঁড়িয়ে ধরা-গলায় জিজ্ঞাসা করলে, কি রে?

বড়কর্তা ধমকের স্বরে আবার বললে, চল্।

আমরা তাদের সঙ্গে নীচে রাস্তায় বেরিয়ে গেলুম। বড়কর্তার অনুচরদের মধ্যে যে লোকটা সব-চাইতে ষণ্ডা ও দুশমনের মতন চেহারা, দেখলুম, সেই সব-চেয়ে বেশি মাতাল হয়েছে। নেশা হ'লে লোকের যেমন মাথার প্রতিক্রিয়ায় পা টলে, এর কিন্তু সেরকম হচ্ছিল না। এর কোমর থেকে মাথা অবধি লোহার ডাণ্ডার মতন স্থির। পা-দুটো একটু ল্যাক-প্যাক করছিল বটে, কিন্তু চলতে চলতে হঠাৎ পা-দুটো মুড়ে একেবারে ব'সে পড়বার মতন হয়ে সেই অবস্থাতেই একটা-দুটো পাক খেয়ে, কাতরানো লাট্টু যেমন সোজা হয়ে ওঠে, তেমনই সামলে উঠতে লাগল।

আমি এক হাতে কোঁচার কাপড় জড়ো ক'রে নাকে চেপে ধরেছি, আর এক হাত দিয়ে পরিতোষকে ধরেছি জড়িয়ে। সে একরকম আমার ওপরেই ভর দিয়ে চলেছে। নিজের অঙ্গও প্রায় অবশ, তবুও সেই লোকটার ওইরকম সার্কাসের ক্লাউনের ধাঁচে চলবার ছিরি দেখে হাসি পেতে লাগল।

যা হোক, কোনরকমে তো বড়রাস্তায় এসে পৌঁছানো গেল। সেখানে একটা ঠিকে-গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, ওরা আগেই সেখানা ভাড়া ক'রে এনেছিল।

আমাদের দুজনকে ঠেলে ঠেলে গাড়ির মধ্যে পূরে দিয়ে তারপরে বড়কর্তা উঠে সেই মাতাল লোকটাকে গাড়ির ভেতরে আসতে বললে।

লোকটা বললে, বে ফিক্‌র্ থাক্, আমি কোচ-বাক্সে চড়ব।

ব'লেই সে সেইরকম হাঁটু মুড়ে মুড়ে বাকি তিনজনকে গাড়ির মধ্যে পূরে দিলে। তারপরে নিজে কোচ-বাক্সে চড়বার কসরৎ করতে আরম্ভ করলে। দু-তিন বার ওঠবার চেষ্টা ক'রে একবার হাঁটু মুড়ে ওপর থেকে দড়াম ক'রে নীচে প'ড়ে গেল।

গাড়ির ভিতর থেকে বড়কর্তা ও আর-একটা লোক বিশ্রী গালাগালি দিতে দিতে বেরিয়ে প'ড়ে লোকটাকে রাস্তা থেকে টেনে তুললে।

ভূমিশয্যা থেকে উঠেই আবার সে কসরৎ ক'রে কোচ-বাক্সে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল, ওদের মানা শুনলে না।

যা হোক, ওরা ও রাস্তার আরও দু-চারজন লোকের সাহায্যে লোকটাকে কোচ-বাক্সে তুলে দেওয়া হ'ল। বড়কর্তা গাড়ির মধ্যে ফিরে এসে গাড়োয়ানকে হুকুম দিলে, রাজঘাট চল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি রাজঘাট স্টেশনে এসে উপস্থিত হ'ল। বড়কর্তা গাড়ি থেকে নেমে আমাকে বললে, উৎরো।

গাড়ি থেকে নেমে দেখা গেল, কোচ-বাক্সের সেই লোকটা গাড়ির ছাতে হাত-পা ছড়িয়ে একেবারে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছে। তাকে না তুলে, গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করতে ব'লে তারা আমাদের স্টেশনে নিয়ে গিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মের একটা বেঞ্চিতে বসল।

কিছুক্ষণ, বোধ হয় মিনিট পনেরো বাদে মোগলসরাই-যাত্রী একটা ট্রেন আসতেই তারা আমাদের নিয়ে একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় গ্যাঁট হয়ে বসল।

গাড়ি ছাড়ে-ছাড়ে এমন সময় বড়কর্তা উঠে বাইরে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে ডেকে পকেট থেকে দুখানা টিকিট বের ক'রে বললে, এই নাও, দুখানা হাওড়ার টিকিট, ফের যদি কখনও এখানে তোমাদের দেখতে পাই তো জান্‌সে মেরে দেব, মনে থাকে যেন।

আমি হাত বাড়িয়ে টিকিট-দুখানা নেবার কয়েক মিনিট পরেই গাড়ি ছেড়ে দিলে, বড়কর্তার অনুচরদের মধ্যে তিনটে লোক আমাদের সঙ্গে গাড়িতে ব'সে রইল।

দেখতে দেখতে গাড়ি মোগলসরাই স্টেশনে পৌঁছে গেল। আমাদের সঙ্গের

লোকেরা স্টেশনে নেমেই বললে, ওই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, চ'লে এস তাড়াতাড়ি।

আমরা 'ওভারব্রিজ' পেরিয়ে অন্য একটা প্ল্যাট্‌ফর্মে এসে পৌঁছলুম। একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল, তার কামরাগুলো একেবারে খালি বললেই হয়। লোকগুলো আমাদের নিয়ে একটা একেবারে খালি কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

এতক্ষণে পরিতোষের সেই তন্দ্রা-ঘোর কেটে গিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার রে ?

আমার মুখে সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপার শুনে আর কোনও কথা না ব'লে সে বেঞ্চির ওপর গা ঢেলে দিলে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অতি অস্বস্তিকর অপেক্ষার পর আমাদের ট্রেন ন'ড়ে উঠল। দেখলুম, বড়কর্তার তিনজন অনুচরের মধ্যে একজন নেমে গিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়াল, আর দুজন গাড়িতেই ব'সে রইল।

গাড়ি ছেড়ে দিলে। বিদায় বারাণসী !

* * *

গাড়ি চলেছে। দুই লম্বা বেঞ্চি ও দুটো বাংক্‌ওয়ালা ছোট্ট সরু কামরা। ধারে একটা পায়খানা, তা থেকে তীব্র গন্ধ ছুটছে—গাড়ি ছুটলে একটু কম থাকে, কিন্তু থামলে আর টেঁকা যায় না। পরিতোষ একটা বেঞ্চে পা থেকে মাথা অবধি র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে প'ড়ে আছে, তার পায়ের কাছে বড়কর্তার সেই দুটো অনুচর পাশাপাশি ব'সে আছে। আমি সামনের বেঞ্চিটায় বাইরের দিকের জানলার ধারে ব'সে। পকেটে দুখানা হাওড়ার টিকিট—সংসারে সেই মাত্র সম্বল। মনের মধ্যে বর্তমান ছাড়া আর চিন্তা নেই। গাড়ি চলেছে।

গাড়ি চলেছে—গরুর গাড়ির চালে। প্যাসেঞ্জার গাড়ি, দশ-পনেরো মিনিট অন্তর একটা ক'রে স্টেশনে থামে। থামে তো থেমেই যায়—মেরে না তাড়ালে এগুতে চায় না এমন অবস্থা।

ঘণ্টা দেড় কি দুই বাদে বড়কর্তার একজন অনুচর আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের বাড়ি কি খাস কলকাতায় ?

বললুম, হ্যাঁ, খাস কলকাতায়।

কলকাতার কোন্ জায়গায় ?

মেছুয়াবাজারে।

লোকটা আর কোনও কথা না ব'লে চুপ ক'রে রইল। কিছুক্ষণ চুপচাপ

কাটবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলুল, এ গাড়ি কখন গিয়ে কলকাতায় পৌঁছবে ?

সে বললে, আজ সারাদিন যাবে, সারারাত যাবে, কাল বিকেলে পৌঁছবে, পাসিঞ্জার গাড়ি কিনা, কিছু ঢিমা চলে।

আমি আবার প্রশ্ন করলুম, তোমরা কলকাতায় যাবে নাকি ?

লোকটা আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে সলজ্জভাবে এক রহস্যময় মুচকি হাসি হেসে মুখখানা ফিরিয়ে নিলে। হনুমানের মতন সেই মুখে ওই হাসি দেখে ইচ্ছে হতে লাগল, চোয়ালে একটি 'নক্ আউট' ঝেড়ে বদনটি একেবারে বিগড়ে দিই। কিন্তু হায়! মানুষ অবস্থার দাস। চুপ ক'রে ব'সে থেকে সেই নীরব অভিনয় সহ্য করতে লাগলুম। বেশ বুঝতে পারলুম, বড়কর্তা পাহারাস্বরূপ এদের পাঠিয়েছে আমাদের সঙ্গে। মনে মনে হিসাব করতে লাগলুম, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে একবার যদি লোক-দুটোকে আমাদের আস্তানায় জিম্মে করতে পারি, তা হ'লে আমাদের ওপরে এই অত্যাচারের শোধ তুলব।

লোকটাকে খুব মিষ্টি ক'রে বললুম, কলকাতায় আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকবে চল। কিছুদিন থেকে মৌজ ক'রে আবার চ'লে আসবে, কোনও খরচ লাগবে না তোমাদের।

লোকটা আমার কথা শুনে আবার সেইরকম রহস্যময় হাসি হেসে জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

গাড়ি ছুটতে লাগল।

আরও কয়েকটা স্টেশন পার হয়ে যাবার পর আমিও পরিতোষের মতন আপাদমস্তক র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম, গাড়ির দোলানিতে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম টেরও পাই নি।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না। ঘুম ভেঙে দেখি, বেলা অনেকখানি গড়িয়ে গিয়েছে। উঠে দেখলুম, আমাদের প্রহরী দুজন কোথায় নেমে গিয়েছে, কামরার দুই বেঞ্চিতে আমরা দুজন শব্দ ও গতির তরঙ্গে আন্দোলিত হচ্ছি।

পরিতোষ তখনও সেইভাবে শুয়ে। বাইরের রোদের ঝাঁজ একেবারে ক'মে গিয়েছে। ব'সে থাকতে থাকতে বেশ শীত করতে লাগল, মনে হ'ল, যেন একটু জ্বরও এসেছে, বেঞ্চির ওপরে পা-দুটো গুটিয়ে বেশ ক'রে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বসলুম।

ঘুমিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত ছিলুম। জাগা-মাত্র আমার চিন্তা শুরু হয়ে গেল মনে হতে লাগল, এমন ঘটনাবহুল, এমন বিচিত্র দিন আমার জীবনে আর আসে নি। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি ভাগ্য-পরিবর্তন পৃথিবীর ক'জনের হয়েছে তা জানি না। সেই ভোর থেকে আরম্ভ ক'রে একে একে সমস্ত ঘটনা মনের মধ্যে এসে উদয় হতে লাগল। বয়স অল্প ছিল বটে, কিন্তু সেই বয়সেই অভিজ্ঞতার অশ্রুধারায় আমার জীবনপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

অভিমান নেই; কার ওপর অভিমান করব, কতবার অভিমান করব! মনে মনে শুধু বলতে লাগলুম, হে আমার ভাগ্যবিধাতা! এই যদি তোমার মনে ছিল তবে এমন রামধনু কেন রচেছিলে আমার ভাগ্যাকাশে?

রেলগাড়ি চলেছে। প্যাসেঞ্জার গাড়ি হ'লেও স্থিরভাবে টেনে নিয়ে চলেছে আমাকে সেই ফেলে-আসা জীবন-আবর্তের পানে।

বাইরের দিকে চেয়ে ব'সে রইলুম। বেহারের রুক্ষ জমি, ঘাস কিংবা শস্য নেই। কোন স্টেশনের কাছাকাছি এলে দেখতে পাওয়া যায়, পল্লীবালারা সারে সারে মাথায় জলভরা গাগরী নিয়ে দল বেঁধে চলেছে, সুন্দর সে দৃশ্য! কোথাও-বা নীচু কুয়ো থেকে বলদের সাহায্যে ওপরে জল তোলা হচ্ছে, কলকাতাবাসীর কাছে সে-দৃশ্য অভিনব।

সূর্য ক্রমেই পশ্চিমের গভীরে ঢ'লে পড়তে লাগল, স্টেশনগুলো ক্রমেই হয়ে উঠতে লাগল জনবিরল। কোন কোন স্টেশনে একেবারেই লোক নেই; শুধু একটানা করুণ সুর মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, রোটি গো-স্ত্।

খিদেয় পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছে, কিন্তু একটি পয়সা কাছে নেই যে কিছু খাই। কাশীতে আসার টিকিট করবার সময় কিছু খুচরো পাওয়া গিয়েছিল, আনা কয়েক হবে। কিন্তু সেগুলো পরিতোষের কাছে আছে, না, ওরা কেড়ে নিয়েছে, তা কিছুই মনে নেই। প্রহারের চোটে লোকে বাপের নামই ভুলে যায়, পয়সার হিসেব তো দূরের কথা!

আরও কয়েকটা স্টেশন পার হবার পর পরিতোষ ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে বিহ্বলদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে স্থিরভাবে চেয়ে রইল। দেখলুম, তার মুখখানা এমন ফুলেছে যে, তাকে আর চিনতে পারা যায় না। চোখ-দুটো, এমন-কি তার অস্বাভাবিক লম্বা নাকটা পর্যন্ত কোথায় ভেতরে ঢুকে গিয়েছে। কিছুক্ষণ সেইরকম বিহ্বলদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে কুতকুত ক'রে চেয়ে থেকে সে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলে। বললুম, কাঁদছিস কেন ভাই, খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?

সে একবার-দু'বার ঘাড় নেড়ে বললে, তোর কি হয়েছে?

কি হয়েছে রে?

নাকটা যে ভেঙে গেছে।

অ্যাঁ!—ব'লে নাকে হাত দিয়ে দেখি, নাক অদৃশ্য। দুই গাল আর নাক একেবারে সমভূমি হয়ে গেছে। সকাল থেকেই নাকের কাছে একটা ভার ও অস্বস্তিকর বেদনা অনুভব করছিলুম বটে, কিন্তু তিনি যে এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছেন তা কল্পনাও করতে পারি নি। ভাগ্যে কাছে আয়না ছিল না!

পরিতোষকে আর তার মুখের অবস্থার কথা বললুম না। পকেট থেকে একটা ভাঙা বিড়ি বার ক'রে ধরিয়ে তাকে দিতেই সে আমার নাকের শোক ভুলে গেল।

আবার পরামর্শ শুরু হ'ল। অনেক চিন্তা ও গবেষণার পর স্থির করা গেল যে, ভাগ্যের কাছে এত সহজে হার মানা হবে না। তার ওপরে কাল এই হাঁড়িমুখ নিয়ে বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হ'লে তারাই বা বলবে কি? ঠিক করা গেল, একটা স্টেশনে নেমে প'ড়ে আবার একবার ভাগ্য পরীক্ষা করা যাক।

পরিতোষ জিজ্ঞাসা করলে, আংটিটা আছে তো?

এতক্ষণ আংটির কথা একেবারেই মনে ছিল না। তাড়াতাড়ি কাছা খুলে দেখলুম, সেটা তখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে নি।

পরিতোষ বললে, বড্ড খিদে পেয়েছে।

বললুম, তোর কাছে খুচরো কিছু আছে না?

হ্যাঁ হ্যাঁ।—ব'লেই সে পকেট হাতড়ে একটা আধুলি, তিনটে পয়সা ও একটা সিকি বার করলে।

ঠিক হ'ল, আনা-চারেকের রোটি-গোস্ত্ কিনলে দুজনের পেট ভ'রে যাবে।

বাইরে রোদ প'ড়ে গেল। শীতের ম্লান গোধূলি আমাদের আশা-প্রদীপ-শিখার চতুর্দিকে ধীরে ধীরে জমাট হয়ে উঠতে আরম্ভ করলে। শোন নদীর লম্বা পোল পার হয়ে আরও কয়েকটা ছোটখাটো স্টেশন পেরিয়ে আমাদের ট্রেন একটা বড়গোছের প্ল্যাট্ফর্মে এসে দাঁড়াল। বড় প্ল্যাট্ফর্ম মানে—লম্বা-চওড়ায় বড়, বাঁধানোও নয়, ঢাকাও নয়। প্ল্যাট্ফর্মের ওপরেই কয়েকটা বড় গাছ, বোধ হয় শিরীষফুলের গাছ হবে। স্টেশন প্রায় জনশূন্য, গাছগুলোতে রাজ্যের

পাখির কিচির-মিচির ধ্বনিতে জায়গাটা আরও গম্ভীর হয়ে উঠেছে, দিবালোকও প্রায় নিবে এসেছে। এইখানে আমরা নেবে পড়লুম।

প্ল্যাট্‌ফর্ম থেকে বেরিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মের সঙ্গে লাগা যাত্রীদের ঘরে এসে এক জায়গায় বসলুম। পরিতোষ তখন শীতে ঠকঠক ক'রে কাঁপছে।

বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে র‍্যাপারটি আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে পরিতোষ বললে, যা, রোটি-গোস্ত্‌ কিনে নিয়ে আয়।

তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম, জ্বরে একেবারে দেহ পুড়ে যাচ্ছে। বললুম, রোটি-গোস্ত্‌ আজ আর খেয়ে কাজ নেই ভাই, এত জ্বরে ওসব খাওয়া ঠিক হবে না।

পরিতোষ প্রায় কেঁদে ফেলে বললে, কি খাব, খিদেয় যে ম'রে গেলুম রে!

বললুম, তুই শুয়ে পড়্‌, আমি দেখছি, কোথাও থেকে যদি একটু দুধ যোগাড় করতে পারি।

কোঁচা দিয়ে পাথরের মেঝের ধুলো ঝেড়ে দিতেই সে একেবারে লাঠির মতন প'ড়ে গেল।

পরিতোষের দেখাদেখি কিনা জানি না, আমারও জ্বর একটু একটু বাড়তে লাগল ও সেইসঙ্গে শীতে ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে কাঁপতে আরম্ভ করলুম। কোনরকমে মনের জোরে বন্ধুর পাশে কুঁকড়ে-সুঁকড়ে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে গাড্ডু হয়ে ব'সে রইলুম বটে, কিন্তু জ্বরের কাঁপুনিকে ঠেকাতে পারবার মতন মনের জোর কোথায় পাব? বোধ হয় মিনিট পনেরো অত্যন্ত কষ্টে কাটিয়ে একটু সামলে উঠতেই ঘরের মাঝখানে একটা বড় আলো জ্ব'লে উঠল।

ঘরের এক কোণে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা চায়ের দোকান। দোকানের সর্বাঙ্গে অ্যান্‌ড্রু ইউল কোম্পানির পৃথিবী-মার্কা চায়ের বিজ্ঞাপন ঝুলছে। বড় বড় কাচের চ্যাপ্‌টা বোতলের মধ্যে লেড়ো বিস্কুট ও অন্যান্য বিস্কুট ও কেক সাজানো রয়েছে, সেখানে কয়েকজন লোক ব'সে চা খাচ্ছে ও গুলতানি করছে। দোকানটার দিকে দেখতে দেখতে মনে হ'ল, হয়তো এইখানে চেষ্টা করলে একটু দুধ পাওয়া যেতে পারে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে গিয়ে চা-ওয়ালাকে বললুম, বাপু হে, আমাকে একটু দুধ দিতে পার? আমার বন্ধুটির জ্বর হয়েছে, একটু দুধ পেলে বড় ভালো হ'ত।

লোকটি আমার দিকে কিছু সময় চেয়ে থেকে বললে, আপনি কি বাংগালী?

হ্যাঁ।

আপনার বন্ধু কোথায় ?

আঙুল দিয়ে পরিতোষকে দেখিয়ে দিলুম। একবার তার দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, আপনারা কোথায় যাবেন ?

বললুম, এইখানে, তোমাদের দেশে নেমে পড়েছি, এখন ভগবান কোথায় নিয়ে যান দেখি !

একটা আধবুড়ো লোক সেখানে ব'সে চা খাচ্ছিল, আমার কথা শুনে চা-ওয়ালাকে আমাদেরই উদ্দেশ্যে বললে, দিওয়ানা হ্যায়।

চা-ওয়ালা বললে, তোমরা আজ রাতে এইখানেই থাকবে তো ?

বললুম, হ্যাঁ।

তা হ'লে ঘণ্টাখানেক সবুর কর, টাটকা দুধ আসবে, তাই থেকে দেব। আমার কাছে দুধ আছে, কিন্তু সে সেই সকালবেলাকার দুধ, অসুস্থ লোককে তা খাওয়ানো ঠিক হবে না। ততক্ষণ ওকে এক কাপ চা খাইয়ে দাও।

প্রস্তাবটা শুনে ভালোই লাগল। বললুম, আচ্ছা, আমাকে এক কাপ চা দাও তো।

আগুন-গরম এক কাপ চা খেয়ে আমার শীত তো চ'লেই গেল, পরন্তু বেশ ভালোই লাগতে লাগল। আর এক কাপ চা নিয়ে গিয়ে পরিতোষকে তুলে খাইয়ে দিলুম। চা খেয়ে সে বললে, অনেক ভালো লাগছে।

চা-ওয়ালার প্রাপ্য দুটো পয়সা চুকিয়ে দিতে সে জিজ্ঞাসা করলে, কতখানি দুধ চাই তোমাদের ?

জিজ্ঞাসা করলুম, কত ক'রে সের ?

দু-আনা সের।

তা হ'লে এক সের দুধ গরম ক'রে দিও।

চা খেয়ে পরিতোষ অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। একটু পরেই কিন্তু আবার রোটি-গোস্ত্ খাবার জন্যে বায়না শুরু করলে, কিন্তু আমি কিছুতেই রাজী না হওয়ায় সে হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, আচ্ছা, এক বাণ্ডিল বিড়ি কিনে নিয়ে আয়।

আবার এক কাপ চা খেয়ে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে ভবিষ্যতের মনোনিবেশ করা গেল। ঠিক করা হ'ল, এবার যদি কোথাও আশ্রয় মেলে তো নেহাত অন্নদাস হয়ে আর থাকব না। বাড়ির ছোট ছেলে-মেয়ে পড়াব কিংবা চাকরের কাজ করব তাও স্বীকার, কিন্তু একান্ত আশ্রয়দাতার ওপরে

নির্ভর ক'রে আর কোথাও থাকব না। যদি কোথাও চাকরি না জোটে তো এবারকার মতন বাড়ি ফিরে যাব। অন্তত ছ'মাস খেয়ে প'রে কাটাবার মতন টাকার ব্যবস্থা করতে না পারলে আর ভাগব না। সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক করা গেল যে, কালই যেমন ক'রেই হোক দিদিমণিকে একখানা চিঠি লিখে সমস্ত কথা জানিয়ে দিতে হবে। কারণ সে মনে করতে পারে, তার একশো টাকা নিয়ে আমরা চম্পট দিয়েছি। আমাদের গোটা পঁচিশেক টাকা দিদিমণির কাছে জমা রেখেছিলুম, একটা ঠিকানার ব্যবস্থা হ'লে পাঠিয়ে দিতে লেখা যাবে। ছেঁড়া ধুতি-জামা যা সেখানে প'ড়ে রইল তা র'য়েই গেল। ওই সঙ্গে বিশুদাকেও একখানা চিঠি লিখব, তাদের দয়ার কথা জীবনে কখনও ভুলব না।

চারিদিক নির্জন নিস্তব্ধ। প্ল্যাট্‌ফর্ম অন্ধকার, শুধু চায়ের দোকানে মাঝে মাঝে দু-একজন লোক এসে বসছে, খেয়ে-দেয়ে চ'লে যাচ্ছে। এইরকম প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে যাবার পর হঠাৎ আবহাওয়া চঞ্চল হয়ে উঠল। রেলের কুলীরা ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ ক'রে দিলে, অন্ধকার প্ল্যাট্‌ফর্মের বাতিগুলো জ্ব'লে উঠল। টিকিট-ঘরের ঘুলঘুলির সামনে ছোট একটা ভিড় জ'মে গেল, টিকিট-ঘর খুলে গেল। দেখতে দেখতে চায়ের দোকানে খদ্দেরের ভিড় লেগে গেল। বাইরে এক্কা ও টাঙ্গাওয়ালাদের চিৎকারে জায়গাটা সরগরম হয়ে উঠল।

আমাদের শরীর তখন বেশ একটু চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। নিজেদের জায়গা ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখলুম, সামনেই একটা চওড়া রাস্তা সোজা চ'লে গিয়ে অন্ধকারে মিশে গিয়েছে। দূর অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে ভাবতে লাগলুম, কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই রাস্তা ধ'রে এগিয়ে চলব—কোথায় কোন্ গৃহে কতদিনের মতন আমাদের অন্ন-সংস্থান হয়ে আছে কে জানে!

কিছুক্ষণ চারিদিক ঘুরে-ফিরে ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব দেখে শুনে আবার ঘরের মধ্যে নিজেদের জায়গায় গিয়ে বসলুম।

দেখতে দেখতে বিকট আওয়াজ করতে করতে একটা ট্রেন এসে প্ল্যাট্‌ফর্মে ঢুকল। যাত্রী, কুলী ও ফেরিওয়ালাদের চিৎকারে জায়গাটা যেন একেবারে বিষিয়ে উঠল। মিনিট দশেক বাদে ট্রেনটা চ'লে যেতেই আবার সব চুপচাপ। দেখলুম, প্ল্যাট্‌ফর্মের বাতিগুলো কিন্তু জ্বালাই রইল। চা-ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম যে, আধঘণ্টার মধ্যেই কলকাতা যাবার এক্সপ্রেস গাড়ি আসবে।

আবার ধীরে ধীরে জনতা ও গোলমাল বাড়তে আরম্ভ করল। পাছে

আমাদের জায়গাটুকু মারা যায়, সেই ভয়ে গ্যাঁট হয়ে নিজেদের জায়গায় ব'সে রইলুম। বাইরে টাঙ্গাচক্র ও টাঙ্গাওয়ালাদের মুখরতা ক্রমেই গগনভেদী হয়ে উঠতে লাগল, এমন সময় একটি বাঙালী ভদ্রলোক, সম্মুখে মুটের মাথায় একটা বড় ট্রাঙ্ক ও তার ওপরে বিছানা, নিজের হাতে একটা বড় বালতি ও পশ্চাতে আপাদমস্তক টকটকে-লাল-র‍্যাপার-মণ্ডিত একটি মহিলা নিয়ে এসে আমাদের কাছেই জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে চিৎকার ক'রে কুলীদের বললেন, গাড়িতে তুলে দেবার পর বকশিশ মিলবে।

তার পরে ট্রাঙ্কটার ওপর থেকে বিছানার মোট নামিয়ে রেখে সেইরকম উচ্চৈঃস্বরে মহিলাটিকে বললেন, তুমি একটু ব'স, আমি মাস্টারমশায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে এখুনি আসছি। টিকিট-ঘর খুলতে এখনও দেরি আছে। আজ গাড়িতে বেশি ভিড় হবে না ব'লেই তো মনে হচ্ছে।

ভদ্রলোক প্ল্যাট্‌ফর্মের দিকে চ'লে গেলেন, আর ভদ্রমহিলা সেই ট্রাঙ্কের ওপরে বেশ জাঁকিয়ে বসলেন। বাঙালীর মেয়ে, রং হয়তো উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছিল, কিন্তু শীতের চোটে নির্জলা শ্যামবর্ণে দাঁড়িয়েছে। সুন্দর ঢলঢলে মুখ, টিকটিকে নাকে ঝকঝক করছে একটি নাকছাবি, জুলজুল ক'রে আমাদের দিকে কৌতূহলী চোখে চাইতে লাগলেন।

আমাদের চোরের মন! খালি মনে হয়, ধরা না প'ড়ে যাই! ভদ্রমহিলাকে ওইরকম ভাবে বারে বারে আমাদের দিকে চাইতে দেখে দস্তুরমতন অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল। পরিতোষ একবার আমার কানে কানে বললে, কি রে বাবা! চেনাশোনা না হয়ে পড়ে!

কিছুক্ষণ বাদে ভদ্রলোক হৈ-হৈ করতে করতে ফিরে এসে চিৎকার ক'রে মহিলাটিকে বললেন, জান রাণু, মাস্টার বললে—ট্রেন আজ অন্তত আধ ঘণ্টা লেট হবে।

বুঝতে পারা গেল, আমাদের সামনে শয়নগৃহের নামে অভিহিত হয়ে ভদ্রমহিলা কিঞ্চিৎ চঞ্চল ও বিব্রত হয়ে মুখ ফিরিয়ে স্বামীকে কি বললেন। স্বামীটি কিন্তু সে ইঙ্গিত ধরতে না পেরে সেইরকম উচ্চৈঃস্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন, কি? কে? কোথায়?

এবার ভদ্রমহিলা নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। লোকটি কিঞ্চিৎ বিস্ময়াপন্ন হয়ে একবার চারদিকে চেয়ে স্ত্রীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি কি বললেন। লোকটি আমাদের দিকে একবার চেয়ে একটু

হেসে স্ত্রীকে কি ব'লে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে ট্রাঙ্কটার ওপরে ব'সে জিজ্ঞাসা করলেন, দাদারা কি কলকাতায় যাচ্ছ ?

গিন্নী আর সেদিকে এগুলেনই না। তিনি দূরে দাঁড়িয়ে দার্শনিকের দৃষ্টিতে চায়ের দোকানের প্ল্যাকার্ডগুলো পড়তে আরম্ভ ক'রে দিলেন।

আমি বললুম, কলকাতায় যাচ্ছিলুম, কিন্তু একটা বিশেষ দরকারে এখানে নেমে পড়েছি।

কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?

কাশী থেকে।

তা টিকিট কি এই অবধি করা হয়েছিল, না, হাওড়া অবধি ?

হাওড়া অবধি।

তা হাওড়া তো আর যাওয়া হচ্ছে না ?

না।

এবারে ভদ্রলোক ট্রাঙ্ক ছেড়ে উঠে একেবারে আমাদের কাছে এসে উঁচু হয়ে ব'সে বললেন, তা দাদা, টিকিট-দুটো আমাকে বেচেই দাও না। আমারও সস্তায় কিস্তি হয়, আর তোমাদের কিছু এসে যায়।

আমি বললুম, তাতে আমাদের আপত্তি নেই, এ তো ভালোই হ'ল।

আমার কাছ থেকে টিকিট-দুখানা নিয়ে তারিখ ইত্যাদি ভালো ক'রে দেখে তিনি বললেন, ঠিক আছে। তবু ভাই, একবার মাস্টারমশায়কে দেখিয়ে আনি—কি জানি, কোম্পানির কারবার তো, সাবধানের মার নেই, কি বল ?

ভদ্রলোক টিকিট-দুখানা নিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মে ঢুকে গেলেন। দেখলুম, ভদ্রমহিলা তেমনই দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন, একবার আমার চোখে চোখ পড়তেই সেখান থেকে আরও একটু দূরে স'রে গেলেন।

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর পরিতোষ বললে, কি রে, রাজা-রানী দুজনেই যে স'রে পড়ল !

বললুম, সরবে কোথায় ! ট্রাঙ্ক রয়েছে যে এখানে। দেখতে দেখতে ঘরের মধ্যে ভিড় বাড়তে আরম্ভ করল, চায়ের দোকানের তিনদিকের বেঞ্চি খদ্দেরে ভ'রে গেল। সবই বেহারী স্ত্রী-পুরুষ। কুলীদের হাল্লায় কানে তালা লাগবার উপক্রম, কিন্তু তখনও পর্যন্ত ট্রেনের কোনও চিহ্নই নেই। টিকিট-ঘরের ঘুলঘুলি বন্ধ।

আমরা দেওয়ালে হেলান দিয়ে ব'সে ব'সে দেখতে লাগলুম, ভদ্রমহিলা

ওখানে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অস্বস্তি ভোগ করছেন, কিন্তু তবুও এসে ট্রাঙ্কের ওপরে বসছেন না। একবার দেখলুম, একটা কুলী মোটঘাট নিয়ে প্রায় তাঁর ঘাড়ের ওপরে পড়তে পড়তে সামলে গেল।

ব্যাপার দেখে আমি উঠে সোজা গিয়ে তাঁকে বললুম, এখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন মা? এ লোকগুলোর তো হস্‌সি-দীঘ্‌ঘি জ্ঞান নেই, কখন মোটঘাট নিয়ে হয়তো ঘাড়ের ওপরেই প'ড়ে যাবে।

হঠাৎ এইভাবে সম্ভাষিত হয়ে তিনি চমকে উঠলেন। কিন্তু হাজার হোক বাঙালীর মেয়ে, তার ওপরে 'মা'-ডাক কানে গেছে, মুহূর্তের মধ্যেই সেই সচকিত ভাব সামলে নিয়ে হাস্যোজ্জ্বল চোখে আমার দিকে ফিরে বললেন, দেখ তো বাবা! একটু হ'লেই ওই গন্ধমাদন ঘাড়ে ফেলে দিয়েছিল আর কি!

বললুম, চলুন, ওখানে গিয়ে বসবেন।

আর কোনও কথা না ব'লে তিনি ফিরে এসে নিজের ট্রাঙ্কটির ওপরে জমিয়ে ব'সে বালতিটা ঘ্যাড়্‌র্‌র্ ক'রে কাছে টেনে নিয়ে তার মধ্যে কি খুঁজতে লাগলেন, বোধ হয় দেখে নিলেন, বালতির জিনিসপত্রগুলোর মধ্যে কোনওটি স্থানচ্যুত হয়েছে কিনা। তারপর মুখ তুলে ,আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি বাবা?

নাম বললুম। পরিতোষটা অন্য দিকে মুখ ক'রে ব'সে ছিল। তার উদ্দেশে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ গা ছেলে—ও ছেলে—

পরিতোষকে একটা কনুই দিয়ে খোঁচা মারতেই সে এদিকে মুখ ফেরালে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি বাবা?

পরিতোষ নাম বললে।

জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

কলকাতায়।

ঠিক বুঝেছি। কলকাতার লোক না হ'লে আর এমন হয়! আমিও বাবা কলকাতার মেয়ে। হোগোলকুঁড়োয় আমাদের বাড়ি। আমরা তিন বোন, তা তিনজনেরই বিয়ে হয়েছে পশ্চিমে। বাবা মেয়ে ছেড়ে থাকতে পারেন না, তাই তিন বোনে পালা ক'রে বছরে চার মাস ক'রে এক-একজন বাবার কাছে থাকি। আমি গেলে দিদি চ'লে যাবে তার শ্বশুরবাড়ি মজঃফরপুরে। বাবার আমার বড় কষ্ট।

তার পরে অত্যন্ত যেন একটা গোপনীয় কথা বলছেন, এমন ভঙ্গীতে ঘাড়টা

লম্বা ক'রে মুখখানা প্রায় আমাদের কানের কাছে নিয়ে এসে চুপিচুপি বললেন, মা নেই কিনা!

বাপের কথা বলতে বলতে ভদ্রমহিলার গলা প্রায় ধ'রে এল, তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যেই সামলে নিয়ে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, পোড়ারমুখো ট্রেন আসতে আজ বড্ড দেরি হবে মনে হচ্ছে।

পরিতোষ বললে, ট্রেনের সময় এখনও পেরিয়ে যায় নি।

ভদ্রমহিলা এবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এই ট্রেনেই যাবে তো?

বললুম, না, আজ আমরা কলকাতায় যাব না, এইখানেই একটু কাজ আছে।

এখানে! এই পাণ্ডববর্জিত দেশে আবার কি কাজ বাবা?

আছে একটু কাজ।

ভদ্রমহিলা ব'লেই চললেন, কলকাতা গিয়েই আমার সঙ্গে দেখা করবে, মাকে ভুলো না যেন। অমুক জায়গায় অমুক নম্বরের বাড়িতে গিয়ে বলবে, রাণুমা'র সঙ্গে দেখা করব। যখন খুশি যাবে, ভুলো না যেন। আমার স্বামীর নাম এই দেখ প্যাঁটরাটার গায়ে লেখা রয়েছে—মনে থাকবে তো?

বললুম, নিশ্চয় থাকবে।

ওদিকে আমাদের চারদিকে ভিড় ও সেইসঙ্গে কোলাহল বাড়তে আরম্ভ করলে। সেই তালে ভদ্রমহিলাও চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগলেন। শেষকালে আর থাকতে না পেরে আমার নাম ধ'রে ডেকে বললেন, দেখ তো বাবা, উনি গেলেন কোথায়? বোধ হয় এই ইষ্টিশান-মাস্টারের ঘরে ব'সে আড্ডা দিচ্ছেন। আড্ডা পেলে আর কিছু মনে থাকে না। এই মানুষকে ফেলে গিয়ে কি ক'রে আমার দিন কাটে তা ভগবানই জানেন। ওদিকে বাবার যে কি কষ্ট! তোমরা যে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাও নি—বেঁচে গেছ। মেয়েমানুষের মনের কষ্ট মেয়েমানুষ ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না।

যা হোক, মেয়েমানুষের কষ্ট বোঝবার আর অধিক চেষ্টা না ক'রে আমি উঠে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে স্টেশন-মাস্টারের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। দেখলুম, ঘরের মধ্যে একটা গোল টেবিল ঘিরে রেল-কোম্পানির কালো কোট ও গোল-টুপি-পরা জন-তিনেক লোক ব'সে আছে, আর আমাদের ইনি দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে হিন্দী ভাষায় তাদের কি-সব বলছেন, আর তারা থেকে থেকে হাসিতে ফেটে পড়ছে।

দরজার কাছে আমি দাঁড়িয়েই আছি, ভদ্রলোক একবার ফিরেও দেখেন না।

হঠাৎ একবার চোখে চোখ পড়তেই তিনি ঘরের ভেতর থেকেই চিৎকার ক'রে উঠলেন, এই যে ভায়া!

তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, তুমি বোধ হয় মনে করলে, শালা টিকিট-তুখানা নিয়ে স'রেই পড়ল। আরে, সরবো কোথায়, আমার সর্বস্ব যে তোমাদের কাছে জিম্মে ক'রে এসেছি। পালাবার আর কি পথ আছে!

ব'লেই হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

বললুম, না না, তা নয়। আমি সেজন্য আসি নি, মানে, আপনার স্ত্রী ডাকছেন আপনাকে।

ও! ডাকছেন বুঝি আমাকে? বলো-গে, এক্ষুনি আসছি আমি, কোনও ভয় নেই, ট্রেন খুব লেট।

আমি চ'লে আসছি, এমন সময় ভদ্রলোক আমাকে ডেকে বললেন, ভায়া, শোন।

কাছে যেতেই বললেন, স্টেশন-মাস্টারকে টিকিট-তুখানা দেখালুম, সে বললে, ঠিক আছে।

তার পরে কোটের ভেতর থেকে একটা ব্যাগ বের ক'রে আমাকে বললেন, এখান থেকে হাওড়ার টিকিটের দাম হয় ছ'টাকা ক'আনা। আমি তোমাকে পাঁচটি টাকা দিচ্ছি ব্রাদার।

ব্যাগ থেকে পাঁচটি টাকা বের ক'রে আমার হাতে দিয়ে বললেন, কেমন, খুশি তো? এতে তোমাদেরও কিছু হয়ে গেল, আমারও কিছু লাভ হ'ল। ভাই, বিদেশে ডাকঘরে কেরানীগিরি করি, এই ক'রেই চালিয়ে নিতে হয়। রাগ করলে না তো?

বললুম, না না, রাগ করব কেন? আপনি আমাদের উপকারই করলেন।

ফিরে আসছিলুম, আমাকে ডেকে বললেন, ভায়া, আমার স্ত্রীকে এসব কথা ব'লো না যেন।

না, না, কি দরকার!—ব'লে টাকা-ক'টি ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে ফিরে এলুম। অপ্রত্যাশিতভাবে টাকা পাঁচটি পেয়ে বুক যেন দশহাত হয়ে গেল। প্রহার ও অনাহার-জনিত শারীরিক গ্লানি কোথায় যে উবে গেল, কি বলব! অর্থ এমনই সালসা!

লম্বা-লম্বা পা ফেলে ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি, পরিতোষের বাঁ-হাতের তেলোয়

পর্বতপ্রমাণ লুচির দিস্তে, তার ওপরে চূড়োর মতন খানিকটা তরকারি। তার চোয়াল-ত্নটো ঢেঁকির মতন উঠছে আর পড়ছে।

আমি কাছে আসতেই রাণুমা বললেন, তুমি তো বড় দুষ্টু ছেলে বাছা! সারাদিন খাওয়া হয় নি—এ-কথা মাকে বলতে হয়। কিরকম ছেলে তুমি আমার?

দস্তুরমতন মিলিটারী স্বরে আমায় হুকুম করলেন, ব'স এখানে।

পরিতোষের পাশে ব'সে পড়লুম। রাণুমা একটা বড় গোল পেতলের কৌটো-গোছের বাক্স খুলে তার ভেতর থেকে একতাড়া লুচি ও খানিকটা আলু-প্যাঁজের চচ্চড়ি তার ওপরে চাপিয়ে আমাকে দিয়ে বললেন, খাও।

সারাদিন অনাহারের পর সে-খাবার যে কি ভালো লাগল, তা কি ক'রে বোঝাব! প্রতি গ্রাসে মনে হতে লাগল, যেন ছ'মাসের পর পথ্যি পাচ্ছি।

রাণুমা বকবক ক'রে ব'কে যেতে লাগলেন। জানি না, এরই মধ্যে পরিতোষ তাকে কি বলেছিল! তিনি বলতে লাগলেন, শখ ক'রে এ-কষ্ট ভোগ করা কেন? ভালো ঘরের ছেলে তোমরা, এত কষ্ট কি সহ্য হবে? আমি যদি এখানে থাকতুম, তা হ'লে নিশ্চয় ধ'রে নিয়ে যেতুম তোমাদের, ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে বাইরে প্ল্যাট্ফর্মে ঢং-ঢং ক'রে ঘণ্টা বেজে উঠল। ওদিকে ঘরের ঘুলঘুলি গেল খুলে, আর সেখানে শুরু হ'ল গুঁতোগুঁতি আর হুড়োহুড়ি।

মিনিট পাঁচ-সাত বাদে রাণুমা'র স্বামী অর্থাৎ সম্পর্কে আমাদের রাজাবাবা হন্তদন্ত হয়ে এসে ব্যাপার দেখে স্ত্রীকে বললেন, কি লাগিয়েছ?

রাণুমা নির্বিকারভাবে বললেন, ছেলেগুলোকে খাওয়াচ্ছি। সারাদিন না খেয়ে আছে, তা বাছারা কি আমায় আগে বলেছে! কথায় কথায় বার ক'রে নিলুম।

ভদ্রলোক মুখে একটা ঔদাস্যের ভাব এনে ফরাসী কায়দায় হাতের তেলো-ত্নটোকে চিতিয়ে এক ভঙ্গী ক'রে মুটেদের দিকে ফিরে বললেন, এইজন্যেই শাস্ত্রে বলেছে—মেয়েদের নিয়ে পথে বেরুতে নেই।

ভদ্রমহিলা স্বামীর দিকে মুখ তুলে বললেন, তা নিয়ে বেরুলে কেন? একলা পাঠিয়ে দিলেই হ'ত।

ভদ্রলোক স্ত্রীর কথার কোন জবাব না দিয়ে সশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলে মুটেকে বললেন, ওরে, এই বিছানাটা তুলে নে।

মুটের পেছু পেছু তিনিও প্ল্যাট্‌ফর্মে ঢুকে গেলেন।

পরিতোষের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। আমি তাড়াতাড়ি ক'রে গিলতে আরম্ভ করেছি দেখে রাণুমা বললেন, তাড়াতাড়ি ক'রো না বাবা, ধীরে সুস্থে খাও।

মিনিট দু-তিন যেতে-না-যেতে আমাদের রাজাবাবা লাফাতে লাফাতে এসে বললেন, ওগো, উঠে পড়, সিগ্‌ন্যাল প'ড়ে গেছে।

রাণুমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, পড়ুক্‌-গে সিংগেল, পোড়ারমুখোরা এতক্ষণ করছিল কি! ছেলেগুলোকে খেতে দিয়েছি, এখন যত রাজ্যের সিংগেল পড়বার তাড়া লেগে গেল!

আমি এতক্ষণে বাকি দু-তিনখানা লুচি ও তরকারিটুকু ঠেলে মুখগহ্বরে পূরে দিয়ে সেগুলিতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

রাণুমা কিন্তু স্বামীর তাগাদায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে আবার বালতিটা টেনে এনে তার ভেতর থেকে আর-একটা কাপড়ে-মোড়া কৌটো বার ক'রে ন্যাকড়ার গাঁট খোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ওদিকে ব্যাপার দেখে রাজাবাবা পাছা চাপড়ে একরকম নৃত্য করতে করতে গলা দিয়ে একটা অস্বাভাবিক সরু ও করুণ স্বর বের ক'রে গান শুরু ক'রে দিলেন। গানের ভাষা হচ্ছে—হায় হায়! আজ নেঘ্‌ঘাত ট্রেন ফেল করালে দেখছি—

রাণুমা নির্বিকার। স্বামীর নৃত্যগীতে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে ধীরে সুস্থে ন্যাকড়ার গাঁট খুলে বড় কৌটোর ভেতর থেকে আর-একটা ছোট কৌটো বের ক'রে সেটার ঢাকনা খুলে দুটো প্যাঁড়া বের ক'রে আমাদের দুজনের হাতে দিয়ে আবার কৌটো বাঁধতে লাগলেন।

রাজাবাবা আর সহ্য করতে না পেরে হেঁট হয়ে পরিতোষের একখানা হাত ধ'রে বললেন, চল ভায়া, প্ল্যাট্‌ফর্মের কলে তোমাদের জল খাইয়ে আনি।

আমরা দাঁড়িয়ে উঠলুম। ভদ্রলোক তাড়া দিয়ে মুটের মাথায় সেই বিরাট ট্রাঙ্ক তুলে দিয়ে বালতিটা টপ ক'রে হাতে নিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মের দিকে দৌড় দিলেন।

প্ল্যাট্‌ফর্মে পৌঁছবার পূর্বেই বিরাট গর্জন করতে করতে ট্রেন এসে উপস্থিত হ'ল। জল খাওয়া তখনকার মতন বন্ধ ক'রে ছুটোছুটি ক'রে খালি কামরার খোঁজ করতে লাগলুম। ট্রেনে বেশি ভিড় ছিল না। একটা দু-বেঞ্চিওয়ালা সরু কামরা খালি আছে দেখে সেইটেতে তুলে দিয়ে আমরা দরজার কাছে দাঁড়ালুম। গাড়ি বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না, জল পরে খেলেও চলবে।

রাজাবাবা মুটে বিদেয় করতে করতে রাণুমা জিনিসপত্র গুছিয়ে জানলার ধারে এসে বসলেন।

আবার ঢং-ঢং ক'রে কতকগুলো ঘণ্টা পড়ল। রাজাবাবা আমাদের বললেন, ভাগ্যে ভায়ারা ছিলে, তাই তাড়াতাড়ি উঠতে পারলুম।

রাণুমা স্বামীকে ধমক দিয়ে বললেন, ভায়া আবার কি! ওরা আমার ছেলে যে।

ওঃ, ছেলে নাকি? তা আগে বলতে হয়! জানো বাবা, তোমাদের এই মা একটু রাগী মানুষ বটে, কিন্তু মনটা বড় ভালো—

তুমি থাম।—ব'লে রাণুমা আমার নাম ধ'রে বললেন, কলকাতায় গিয়েই দেখা করবে, ওই পরিতোষ ছেলের কাছে ঠিকানা-পত্র সব লিখে দিয়েছি, রাণুমাকে ভুলো না যেন—

বলতে বলতে ট্রেন ছেড়ে দিলে।

রাণুমাকে ভুলি নি, নিশ্চয় ভুলি নি। তবে তাঁর সঙ্গে দেখা-করাটা আর হয়ে ওঠে নি। মাস-কয়েক বাদে কলকাতায় ফিরে এসেছিলুম বটে, কিন্তু পরিতোষের বাবার তখন খুবই অসুখ। বোধ হয় সপ্তাহখানেক বাদেই তারা চ'লে গেল পশ্চিমের এক শহরে হাওয়া বদলাতে। আমি যাই-যাই করতে করতে দিন পনেরোর মধ্যেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়লুম একজ্বরে। অনভ্যাস-অত্যাচারের শোধ প্রকৃতি সুদে-আসলে তুলে ছাড়লেন। রোগশয্যা ত্যাগ করবার কিছুদিনের মধ্যেই আবার আমাকে বেরুতে হ'ল পথের আহ্বানে।

রাণুমা'র সঙ্গে জীবনে আর দেখা হয় নি বটে, কিন্তু রাণুমাকে ভুলি নি। অতীত দুর্দিনের পটভূমিতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অকস্মাৎ সূর্যোদয়ের মতন প্রসন্নময়ী সেই মাতৃমুখ মনের মধ্যে ফুটে উঠছে আর শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে পড়ছে। দূর অতীতের সেই এক সন্ধ্যায় প্রহারজর্জর, ক্ষুৎপিপাসাকাতর এই দুটি বালকের মুখে অযাচিত অন্ন দিয়ে যে রক্ষা করেছিল, তাকে কি কখনও ভুলতে পারি! জীবনের সেই দারুণ দুঃসময়ে হঠাৎ পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া মাকে আজ আমি প্রণাম জানাচ্ছি। বন্ধু পরিতোষ আজ কাছে নেই, তার হয়েও আমি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। জানি, আমাদের নিবেদন ব্যর্থ হবে না।

ট্রেন প্ল্যাট্‌ফর্ম থেকে বেরিয়ে যেতে-না-যেতে টপ টপ ক'রে আলোগুলো সব নিবিয়ে দেওয়া হ'ল। প্ল্যাট্‌ফর্মের কলে আকণ্ঠ জল পান ক'রে আবার আমরা

যাত্রিগৃহে ফিরে এলুম। বোধ হয় মিনিট পনেরোর মধ্যেই চারিদিক একেবারে নিষুতি হয়ে পড়ায় আমরা দুটো বেঞ্চি দখল ক'রে ঘুমের সাধনায় মন দিলুম।

ঘুম জিনিসটা প্রাণিজগতে ঈশ্বরের এক অদ্ভুত দান। সন্ধ্যায় যে মাতা উপযুক্ত পুত্র হারিয়েছে, কাঁদতে কাঁদতে শেষরাত্রে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও সে ঘুমের কোলে ঢ'লে পড়ে—আমরা তো কোন্ ছার! সারারাত্রি কখনও ঘুম কখনও জাগরণ, এই করতে করতে রাত্রি ভোর হয়ে গেল।

সকালবেলা দু-তিন কাপ চা খেয়ে ধাতস্থ হয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মের কলে স্নান ক'রে র‍্যাপার প'রে ধুতি শুকিয়ে নিয়ে ঘণ্টাখানেক বাদে চায়ের দোকান থেকে দুজনে আধ সের ক'রে দুধ মেরে বেরিয়ে পড়া গেল অনির্দিষ্ট যাত্রায়। ট্যাঁকে টিকিট-বিক্রয়-লব্ধ পাঁচটি টাকা, কাছায় বাঁধা একটি আংটি আর পরিতোষের পকেটে কয়েক আনা—এই মাত্র সম্বল।

স্টেশনের সামনে যে রাস্তাটার খানিকটা রাত্রে দেখা যাচ্ছিল, সেটা বেশি লম্বা নয়। একটু দূরে গিয়ে অপেক্ষাকৃত সরু কিন্তু বেশ ভালো একটা উত্তর-দক্ষিণমুখো সড়কে প'ড়ে আমরা উত্তরমুখো চলতে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

ছোট্ট শহর। আমরা যে রাস্তা ধ'রে অগ্রসর হতে লাগলুম, তার দু-দিকে কোন কোন জায়গায় ঘন খোলার চালের বসতি। কদাচিৎ দু-একখানা ইটের একতলা কি দোতলা বাড়ি চোখে পড়ল। মধ্যে মধ্যে রাস্তার দু-পাশেই চষা মাঠ, মাঝে মাঝে কোন ক্ষেতে ফসল দেখা যাচ্ছে। চলতে চলতে ছোট্ট বাজার অর্থাৎ খান-তিন-চার-দোকানওয়ালা একটা জায়গায় এসে একজন মুরুব্বীগোছের লোককে জিজ্ঞাসা করলুম, এ রাস্তা কোথায় গিয়েছে?

লোকটা গম্ভীরভাবে বললে, গয়াজী।

পরিতোষকে বললুম, ভালোই হ'ল, চল্, গয়াতেই যাওয়া যাক।

আরও কয়েক মাইল গিয়ে আর-একজনকে জিজ্ঞাসা করলুম, হ্যাঁ বাবা, এ রাস্তা কতদূর গিয়েছে?

লোকটি বললে, বিহারশরীফ তক্।

কথাটা শুনে একটু দ'মে গেলুম। কারণ বিহারশরীফ মানুষের নাম, না, জায়গার নাম, তা অনেক গবেষণা ক'রেও ঠিক করতে পারলুম না। বিশুদার ওখানে যতটুকু উর্দুজ্ঞান হয়েছিল, তাতে শরীফ কথাটি মানুষের মেজাজের প্রতিই প্রযোজ্য, সেটি যে জায়গার পেছনেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে সে-জ্ঞান আমাদের হয় নি, এইজন্যেই বলে—অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী!

আরও কতদূর অগ্রসর হয়ে এক ব্যক্তিকে ওই প্রশ্ন করায় সে বললে, পাটনাশরীফ তক্।

এতক্ষণে শরীফ-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম ক'রে জিজ্ঞাসা করলুম, এখান থেকে পাটনাশরীফ কতদূর হবে?

লোকটি মনে মনে কি হিসাব ক'রে বললে, তা ষাট-সত্তর মিল হবে।

যা হোক, হিসাব ক'রে ঠিক করা গেল যে, এই রাস্তা হয় বিহারশরীফ, আর না-হয় পাটনা, আর না-হয় গয়া অবধি পৌঁছেছে, রাস্তা শেষ হতে এখনও ষাট-সত্তর মাইল বাকি আছে।

চলতে চলতে শহর গ্রাম পেরিয়ে গেলুম। দু-পাশে শস্যক্ষেত্র, তারই মাঝখান দিয়ে সোজা রাস্তা বেয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি মন্থরগতিতে, পথের শেষ কোথায় কে জানে!

ক্রমে মধ্যাহ্নসূর্য পশ্চিমে ঢ'লে পড়ল। বোধ হয় সকাল থেকে দশ-বারো মাইল পথ অতিক্রম করেছি। জুতোর অবস্থা আগে থাকতেই ছিল খারাপ, এতখানি পথ চলার ফলে তারা মুখব্যাদান ক'রে চিৎকার করতে আরম্ভ করলে, ছেড়ে দে বাবা, কেঁদে বাঁচি। তাদের প্রতি মায়াপরবশ হয়ে জুতো হাতে ক'রে চলতে শুরু করলুম। সেইদিন প্রথম বুঝতে পারলুম যে, খালি-পায়ে হাঁটাও অভ্যেস করতে হয়।

সারাদিন পথশ্রমে দেহও বিশ্রাম চাইছিল। সকালবেলা ইষ্টিশানের সেই আধ সের দুধ কখন হজম হয়ে গিয়েছে, ক্ষিধের চোটে মনে হতে লাগল, পেটের মধ্যে যেন দধি-মন্থন চলেছে।

সম্মুখেই রাত্রি, কিন্তু আশ্রয় কোথায়? পথের দু-দিকে মাঠের প্রান্তে, সেই একেবারে দিগন্তে বললেই হয়, সেখানে বোধ হয় গ্রাম আছে; কিন্তু সেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠ পার হবার সাহস নেই। দেখলুম রাস্তা দিয়ে দু-তিন দল রাখাল পাল-পাল গরু নিয়ে চিৎকার ক'রে বেসুরো গান গাইতে গাইতে গেল —কোথায় গেল কে জানে! চলেছি তো চলেইছি, কিন্তু আর যে পা চলে না!

সূর্য তখন প্রায় ডুবে গেছে, এমন সময় আমরা একটা গ্রামের মতন জায়গায় এসে পৌঁছলুম, অর্থাৎ দু-একটা লোক পথে দেখা গেল, একটা বলদের গাড়িও যেতে দেখলুম।

রাস্তার ধারেই বেশ একটু উঁচু জায়গায় একটা ছোট পুকুর, বাংলাদেশের

বড় ডোবার মতন হবে, তার চারদিকে ঘন তালগাছের সারি। একটা গাছ থেকে আর-একটার ব্যবধান বোধ হয় দশ হাতও হবে না, কোথাও-বা জোড়া-জোড়া গাছ একসঙ্গে উঠেছে। আমরা পথ ছেড়ে এই উঁচু জায়গাটাতে উঠে একজোড়া তালগাছের তলায় ব'সে বিশ্রাম করতে লাগলুম।

পুকুরটাতে জল নেই বললেই হয়। তবুও মুখ ধোবার জন্যে পাড় বেয়ে জলের ধারে গিয়ে দেখলুম, অত্যন্ত নোংরা জল। মুখ না ধুয়েই উঠে এসে আবার সেইখানে বসলুম। জীবনে এতখানি পথ কখনও হাঁটি নি। অঙ্গের বেদনায় তালগাছের গুঁড়িতে দেহ এলিয়ে দেওয়া গেল।

ব'সে ব'সে দেখতে লাগলুম, মাথার ওপর দিয়ে দু-তিন-দল বক উড়ে গেল। একটু দূরেই রাস্তার দু-ধারে দুটো বড় গাছ, তার মধ্যে পাখিদের কচ্‌কচিতে সেই নিস্তব্ধ জায়গাটা যেন ভ'রে উঠল, কিন্তু তা অতি অল্পক্ষণেরই জন্য, তার পরেই সব স্তব্ধ। দূরে পশ্চিমে সূর্য ডুবে গেল। গোধূলির শেষরশ্মিতে দেখলুম, পরিতোষের চোখ-দুটো প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। অন্ধকার একেবারে ঘনিয়ে ওঠবার আগেই বৃক্ষমূলে সে দেহ বিছিয়ে দিলে।

চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। পরিতোষ ঘুমিয়ে পড়েছে, ব'সে ব'সে আমার ভয় করতে লাগল, এই অন্ধকারে কি সারারাত্রি কাটাতে হবে! মুখ ধুতে যাবার সময় পুকুর-পাড়ে গোটাকয়েক শুকনো তালের পাতা দেখেছিলুম, মনে হ'ল, সেগুলো টেনে নিয়ে এসে আগুন ধরালে মন্দ হয় না। কিন্তু কি জানি, সেখানে নামতে সাহস হ'ল না। পরিতোষকে ধাক্কা দিয়ে তোলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু অদ্ভুত তার ঘুম! কি কতকগুলো বিড়বিড় ক'রে ব'কে সেই ধূলিশয্যায় পাশ ফিরে শুল।

অন্ধকারে উৎকর্ণ হয়ে ব'সে আছি, মধ্যে মধ্যে কাছে দূরে কড়কড় সড়সড় আওয়াজ হতে লাগল। দেশলাই জ্বালিয়ে যতটুকু আলো পাওয়া যায়, তাই দিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করতে লাগলুম—তারপরে শান্তিময়ী নিদ্রা এসে কখন কোলে তুলে নিলে জানতেও পারি নি।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলুম—দিদিমণির সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ির দেশে গিয়েছি—রাজপুতানার পাহাড়ের কোলে স্বর্গের মতন সেই সুন্দর দেশে। পাহাড়ে হচ্ছে তুষার-বর্ষণ ও সেইসঙ্গে পড়ছে বড় বড় বাঁশের লাঠির মতন মোটা ও লম্বা মালাইয়ের কুল্‌পী। দু-হাতে ক'রে সেই কুল্‌পী-বরফ খাচ্ছি, কিন্তু পেট ভরছে না কিছুতেই। দিদিমণি ঘরের ভেতর থেকে চ্যাঁচাচ্ছে—

খাবার তৈরি হয়েছে, এবার খেতে এস। কিন্তু খেতে যাওয়াটা যে কেন হচ্ছে না, তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ কিসের একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, পরিতোষের মতন আমিও ধূলিশয্যায় লম্বা হয়ে প'ড়ে আছি। কোন্ দূরে যেন কারা গান গাইছে। তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে আবার পরিতোষকে ধাক্কা দিয়ে তোলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু সে কোন সাড়াই দিলে না।

দেখলুম, মাথার ওপরে একটুখানি চাঁদ উঠেছে, রাস্তায় খানিকটা আলো ও খানিকটা অন্ধকার। বড় গাছ-দুটোর লম্বা ডালপালার ছায়া পড়েছে রাস্তার ওপরে।

রাস্তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছি। মধ্যে মধ্যে একটা দমকা হাওয়া গাছগুলোর ঝুঁটি ধ'রে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার সেই ঘুমন্ত ছায়ানটীদের মধ্যে সাড়া জাগছে। থেকে থেকে ওপর দিয়ে নাম-না-জানা রাত-পাখির দল চিৎকার করতে করতে উড়ে যাচ্ছে—নিস্তব্ধ নৈশ প্রকৃতির বুকে করাত চালিয়ে দিয়ে। মনের মধ্যে একটার পর একটা চিন্তার ঢেউ উঠছে। রাজকুমারী, চাটুজ্জে, দিদিমণি, বদ্যিনাথ, বাঙাল-মা, বড়কর্তা, বিশুদা, গিরিধারীর মুখ তালগোল পাকাতে পাকাতে আবার ঘুমিয়ে পড়লুম।

এবার অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম। কিসের একটা বিশ্রী উগ্র গন্ধে ঘুম ভেঙে যেতেই চোখ খুলে দেখি, প্রায় আমার নাকের ডগায় একটা জানোয়ারের মুখ! তার চোখ-দুটো পড়ন্ত চাঁদের আলোয় জ্বলজ্বল করছে।

বাপ রে!—ব'লে ধড়মড় ক'রে উঠে বসতেই জন্তুটা ভড়্কে চার-পাঁচ হাত পেছনে হ'টে গিয়ে আবার জ্বলজ্বলে চোখ দিয়ে আমায় নিরীক্ষণ করতে লাগল।

শীতের রাত্রিশেষ। সারারাত রাস্তায় শুয়ে স্রেফ কাঁপুনির চোটে মুহুর্মুহু ঘুম ছুটে যাচ্ছিল, হঠাৎ এই নতুন আপদের সম্মুখীন হয়ে দরদর ক'রে কালঘাম ছুটতে আরম্ভ হ'ল। জানোয়ারটা তখনও আমার দিকে তেমনই ভাবে চেয়ে। ভয়ে আমার কথা বন্ধ হয়ে গেলেও চক্ষু সজাগ ছিল। দেখলুম, শেয়ালের মতন চেহারা হ'লেও সেটা শেয়াল নয়, শেয়ালের চাইতে অনেক বড়। ঘাড়ের চারিদিকে ঘন কেশর, মাথার দিকটা উঁচু অর্থাৎ সামনের পা দুখানা অপেক্ষাকৃত বড় আর ল্যাজের দিকটা নীচু। মিনিটখানেক তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছি, হঠাৎ উঠে মারব দৌড়—এইরকম একটা সঙ্কল্প আঁটছি মনে মনে, এমন

সময় খসখস শব্দ হতে পাশের দিকে চেয়ে দেখি, আরও চার-পাঁচটা জানোয়ার নিকটে ও দূরে ঘোরাফেরা করছে। অতগুলোকে একসঙ্গে দেখে আমার মনে হ'ল, নিশ্চয় এ নেকড়ের পাল, কারণ নেকড়েরা যে দলবদ্ধ হয়ে শিকার খুঁজতে বেরোয়, সে-কথা ছেলেবেলা থেকে বইয়ে প'ড়ে এসেছি। যাঁহাতক সেই কথা মনে হওয়া আর অমনই সেই উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে নীচে প'ড়েই চিৎকার করতে আরম্ভ ক'রে দিলুম, পরিতোষ, উঠে পড়্, আমাদের নেকড়ে বাঘে অ্যাটাক্ করেছে। পরিতোষ, বাঁচতে চাস তো এখনও ওঠ্। পরিতোষ. আমি পালাচ্ছি।

আমার ওইরকম চিৎকার শুনে জানোয়ারগুলো একটি ক'রে লাফ মেরে মারলে দৌড় ওদিককার মাঠে, ক্ষীণ চাঁদের আলোতে দেখতে পেলুম, রামদৌড় দৌড়ে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

এমন একটা সংঘাতিক ফ্যাসাদ থেকে যে এত সহজে উদ্ধার পাব, তা কল্পনাও করতে পারি নি। জানোয়ারগুলোর পলায়নের ধরন দেখে তৃতীয় পক্ষ হয়তো বুঝতেই পারত না, ভয়টা বেশি পেয়েছিল কে! আমি, না, তারা?

যা হোক, একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার উঠে পরিতোষের কাছে গেলুম। এতক্ষণে দেখি, সে মুখের কাপড়টা সরিয়ে শুয়ে-শুয়েই জুলজুল ক'রে চাইছে। আমাকে দেখে সে ধীরে-সুস্থে উঠে ধরা-ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলে, কি রে. ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাচ্ছিলি কেন?

তার সেই নিশ্চিন্ত বেপরোয়া ভাব দেখে রাগে আমার গা জ্ব'লে উঠল। বললুম, কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমোও, এখুনি যে নেকড়ের পাল এসেছিল তার খোঁজ রাখ?

পরিতোষ সেইরকম ভাঙা গলায় বললে, এঃ, হেঁটে-হেঁটে তোর মাথাটা একদম গরমে গিয়েছে দেখছি। স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি?

দেখলুম, তখনও তার চোখ থেকে ঘুমের ঘোর একেবারে কাটে নি। আমি রেগে সেখান থেকে স'রে একটু দূরে গিয়ে ব'সে রইলুম।

আকাশে চাঁদ ক্রমেই নিষ্প্রভ হতে থাকল। পূর্বদিগন্তে একটু ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা দিল। দূর থেকে দেখতে লাগলুম, পরিতোষ আবার শুয়ে পড়ল। আরও কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ ক'রে উঠে ধীরে ধীরে এসে আমার পাশে ব'সে বললে, কি রে, রাগ করলি?

বললুম, না, রাগ করব কেন? সারারাত কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমোবে, তোমার

এই ঘুমের জন্যে কোন্‌দিন নেকড়ের পেটে চ'লে যাব, তবুও তোমার ঘুম ভাঙবে না।

পরিতোষ আর কথা না বাড়িয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর সে বললে, এর আগে নেকড়ে বাঘ কখনও দেখেছিলি ?

বললুম, কেন, আলিপুরের চিড়িয়াখানায় নেকড়ের পাল আছে।

পরিতোষ চুপ ক'রে রইল। ব্যাপারটার ওপরে আরও খানিকটা গুরুত্ব চাপাবার জন্যে বললুম, শুনেছি, এইসব জায়গায় নেকড়ে বাঘের ভারি উপদ্রব।

এতক্ষণে ব্যাপারটি অনুধাবন ক'রে পরিতোষবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করলে, কতগুলো এসেছিল রে ?

সত্যি কথা বলতে কি, কতগুলো যে এসেছিল তা দেখবার মতন মানসিক অবস্থা সে-সময় আমার ছিল না। যতদূর মনে পড়ে, পাঁচ-ছ'টা জানোয়ার দেখেছিলুম। তবুও অবস্থার গাম্ভীর্য বাড়াবার জন্যে বললুম, সে-সময় কি আর গুনে দেখবার মতন মনের অবস্থা ছিল ? তবুও দেখে মনে হ'ল, পঞ্চাশ-ষাটটা হবে।

পঞ্চাশ-ষাটটা নেকড়ে বাঘের কথা শুনে পরিতোষ এবার দস্তুরমতন দ'মে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চুপ ক'রে ব'সে ও তারই মধ্যে বেশ এক পক্কড় ঘুম মেরে চাঙ্গা হয়ে পরিতোষ বললে, চল্, ওঠা যাক।

তখন বেশ রোদ উঠে গিয়েছে, রাস্তা দিয়ে দু-চারজন লোক ও একটা গরুর গাড়িও চ'লে যেতে দেখা গেল। আমরা পথে নেমে আবার চলতে শুরু করলুম। পথের শেষ কোথায় !

আধ ঘণ্টা অতীত হতে-না-হতে বেশ টের পেতে লাগলুম, কালকের মতন মনের উৎসাহ বা শরীরের শক্তি আজ আর নেই। খানিকটা পথ এগিয়ে যাই, আবার রাস্তার ধারে কিছুক্ষণ ক'রে বিশ্রাম করি—এইভাবে চলতে চলতে প্রায় মাইল-আষ্টেক পথ অতিক্রম ক'রে আমরা গ্রাম অথবা সেইরকম একটা কোনও জায়গায় এসে পৌঁছলুম। কিছুদূর এগিয়েই একটা বাজার দেখা গেল। দু-তিনখানা একতলা ইটের আর বাকি সব খোলার বাড়ি। গোটা-দুয়েক মুদীর দোকান, একটি মাত্র ময়রার দোকান—খাদ্যের মধ্যে দেখলুম, একতাল গুড়ের জিলিপি প'ড়ে রয়েছে একটা তেলচিটে ময়লা বারকোশের ওপর। জিলিপিগুলোতে বোলতা ও রাজ্যের শ্যামাপোকা লেপটে রয়েছে, অর্থাৎ সেগুলো

নিরামিষ কি আমিষ তা বিচার করবার প্রয়োজন হয়। দোকানের প্রায় সামনেই কতকগুলো বলদ ব'সে রোমন্থন ক'রে চলেছে, তারই কিছু দূরে খানকয়েক গরুর গাড়ি। চারদিকে এমন অনেকরকমের তরকারি ও শাক বিক্রি হচ্ছে, যা এর আগে কখনও দেখি নি।

ক্ষিধের চোটে তখন আমাদের প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়বার মতন অবস্থা। মোদকের দোকানে ঢুকে খাবার-দাবারের অবস্থা বিচার ক'রে দু-পয়সার চিঁড়ে ও চার পয়সার দই কিনে কাঁচা শালপাতায় তো মাখা গেল। কিন্তু সে দই কি টক্ রে বাবা! আবার পয়সা-দুয়েকের একেবারে ধুলো-রঙের চিনি কিনে তাতে মাখলুম ; কিন্তু তাতে মিষ্টি কিছুই হ'ল না, টকের তীব্রতা একটু কম পড়ল মাত্র।

যা হোক, সেই খাদ্য উদরস্থ ক'রে মোদকের কাছ থেকে জল চেয়ে নিয়ে খেয়ে সেইখানেই রাতটা কাটানো যেতে পারে কিনা তারই জল্পনা করতে লাগলুম।

মোদককে বললুম, দেখ, আমরা পরদেশী লোক, আশ্রয়হীন। তোমার এখানে রাতটা কাটাতে পারি কি? সেজন্যে ভাড়া যা লাগবে তা আমরা দেব।

আমাদের প্রস্তাবটা শোনামাত্রই মোদক বললে, না বাপু। আমার এখানে পরদেশী লোক রাখি না, তোমরা অন্যত্র ব্যবস্থা কর।

মোদক এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে হেসে কথা বলছিল, কিন্তু থাকতে দেবার প্রস্তাব শুনেই সে গম্ভীর হয়ে পড়ল। ভাবলুম, আজও বোধ হয় আমাদের জন্যে পথের ধারেই শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। শরীর এমন ভেঙে পড়েছিল যে, মনে হতে লাগল, আজ রাতে বাইরে শুলে ঠাণ্ডায় ম'রে যাব, তার ওপরে নেকড়ের পাল কি আজও মুখের শিকার ফেলে পালিয়ে যাবে?

পরিতোষ জিজ্ঞাসা করলে, এখান থেকে রেলের ইষ্টিশান কত দূরে?

মোদক হিসেব ক'রে তিনটে স্টেশনের নাম করলে। তার প্রত্যেকটির দূরত্ব সেখান থেকে আট-দশ মাইলের কম নয়। একটু চিন্তা ক'রে সে আবার বললে, এখান থেকে সকালবেলা রওনা হ'লে বিকেল নাগাদ সেখানে পৌঁছনো যায়।

তখন বোধ হয় বেলা তিনটে হবে, কোনও স্টেশনের দিকে রওনা হওয়া সুবিবেচনার কাজ নয়। তার ওপরে দু-দিন ধ'রে অতখানি ক'রে হেঁটে দেহ ও

মনের শক্তি প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল। কি করব, কোথায় যাব, সেই চিন্তায় অভিভূত হ'য়ে পড়লুম। আবার মোদককে জিজ্ঞাসা করা গেল, আচ্ছা, রাতের মতন এখানে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে কি ?

মোদক কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললে, এই দেহাতে কোন্ গৃহস্থ অজানা পরদেশীকে ঘরে থাকতে দেবে, বল ? এ কি শহর ?

একজন আধাবয়সী লোক সে-সময় দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সেই শ্যামা-পোকার তবক-চড়ানো জিলিপি কিনছিল ও আমাদের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাচ্ছিল। মোদকের কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে ?

মোদক তাকে বললে, এরা পরদেশী, রাত্রে এখানে থাকতে চায়। তা এখানে থাকবার জায়গা কোথায় ? অজানা লোককে আশ্রয় দিয়ে কি শেষে ফ্যাসাদে পড়ব ?

লোকটি জিলিপির ঠোঙা হাতে আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা আজ রাতে এখানে থাকতে চাও ?

বললুম, আমরা পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত, দু-তিন দিন অনবরত হেঁটেছি, আজ আর নড়বার শক্তি নেই। যদি আজকের রাত্রের জন্য কোথাও একটু আশ্রয় পাই তো বেঁচে যাই।

লোকটি আমাদের কথা শুনে বেশ আগ্রহের সঙ্গে বললে, এর জন্যে কি হয়েছে! তোমরা পরদেশী, আমাদের গ্রামে এসে কি পথে প'ড়ে থাকবে ?

তারপরে মোদককে দেখিয়ে দিয়ে বললে, এ-ব্যাটা বেনিয়ার বাচ্চা, দাঁও না দেখলে কি ও জায়গা দেবে! এখানে আমাদের জমিদারের কাছারি আছে, সেখানে গিয়ে শুয়ে থাক, কেউ কিছু বলবে না।

কোথায় তোমাদের জমিদারের কাছারি বাবা ?

উঠে এস, আমি তোমাদের সেখানে নিয়ে যাচ্ছি।

এতবড় আশ্বাস পেয়ে তখুনি তড়াক ক'রে উঠে পড়া গেল। লোকটি আমাদের নিয়ে চলল এ-গলি সে-গলি দিয়ে। চলতে চলতে সে বলতে লাগল, আমাদের মালিক অর্থাৎ জমিদার, সে একেবারে দেবতা। হুকুম আছে যে, তাঁর এলাকার মধ্যে কোনও লোক আশ্রয়হীন বা অনাহারে না থাকে। তাঁর রাজ্যে কোন পরদেশী আশ্রয়হীন হয়ে পথে প'ড়ে আছে শুনলে সে-দেশের সবাইকে তার ফল ভোগ করতে হবে। ও-ব্যাটা বেনের বাচ্চা

তোমাদের ভড়কি দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। মেহমানের ইজ্জৎ ও কি ক'রে বুঝবে?

জিজ্ঞাসা করলুম, তোমাদের জমিদার কে?

লোকটি ভক্তিভরে দেড়গজী লম্বা কি-একটা নাম বললে, গোড়ায় নবাব ও শেষে বাহাদুর ছিল, এইটুকু মনে আছে।

যা হোক, আমরা বড় একটা ইটের গোলাবাড়ির সামনে এসে পৌঁছলুম। বাড়ির সামনে ঘাসবিহীন মাঠে একজায়গায় বিস্তর গরুর গাড়ি পাশাপাশি সাজানো। বোধ হয় পঞ্চাশ-ষাটটা বলদকে একদিকে খেতে দেওয়া হচ্ছে, মাটির ছোট ছোট উঁচু ঢিপি পাশাপাশি লাইন-বাঁধা, ঢিপির প্রত্যেকটাতে একটা ক'রে মাটির গামলা বসানো। এই গামলাগুলোতে বলদদের খাবার দেওয়া হচ্ছে, আর তারা মিলিটারী কায়দায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সশব্দে খেয়ে চলেছে।

লোকটি আমাদের নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। গেট পেরিয়ে প্রকাণ্ড উঠোন, লম্বা-চওড়ায় প্রায় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির উঠোনের সমান হবে, তবে বাঁধানো নয়। সেখানে বোধ হয় সারাদিন শস্য ঝাড়া হয়েছে। সে সময়ে পনেরো-ষোলটি স্ত্রীলোক মিলে শুকনো তালপাতার গোছা দিয়ে সেই বিরাট উঠোন পরিষ্কার করবার চেষ্টা করছিল। আমরা নাকে কাপড় দিয়ে কোনরকমে সেই মাঠ পার হয়ে একটা সরু গলিপথ দিয়ে অপেক্ষাকৃত একটা ছোট উঠোনে এসে পড়লুম। এ জায়গাটা বেশ পরিষ্কার। উঠোনের তিন দিকে সারি সারি ঘর, কোন কোন ঘরে লোকজন ব'সে কাজ করছে, দেখলেই বোঝা যায় জমিদারী সেরেস্তা।

এইরকম গোটাকয়েক ঘর পেরিয়ে এসে আমাদের অনুগ্রাহক একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। এই ঘরের ভেতর ফরাশের বদলে চেয়ার টেবিল দেখা গেল বটে, কিন্তু সে-আসবাবের বয়েস নির্ণয় করতে হ'লে প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রয়োজন হয়। লোকটি বাইরেই দাঁড়িয়ে ভেতরদিকে উঁকি দিয়ে যেন কাকে খুঁজতে লাগল। বারান্দা দিয়ে একটা চাকর-গোছের লোক যাচ্ছিল, তাকে ডেকে সে জিজ্ঞাসা করলে, পাঁড়েজী কোথায়?

লোকটা চিৎকার ক'রে উত্তর দিলে, ওই যে ভেতরে রয়েছে, যাও না চ'লে।

চাকর চ'লে যেতেই লোকটি ইঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করতে ব'লে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপরে চেয়ার-টেবিলের গলি-ঘুঁজি ও দু-পাঁচটি লিখনরত কর্মচারীকে পেরিয়ে আমরা সেই নায়েব-নাজিমের সম্মুখীন হলুম।

দেখলুম, এক বৃদ্ধ, মাথা-ন্যাড়া, সেই শীতে আদুড়-গায়ে চোখে ডাল-ভাঙা চশমা লাগিয়ে একটা প্রকাণ্ড খাতার মধ্যে মুখ জুবড়ে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে কি দেখছে। লোকটির সেই ন্যাড়া মাথা থেকে আরম্ভ ক'রে কোমর অবধি ও দুই হাতের আঙুলের ডগা অবধি চন্দনের ছাপে রামনাম লেখা। সেই দৃশ্য দেখে পরিতোষ আমার কানে কানে বললে, এ যে চিতেবাঘের খপ্পরে এনে ফেললে!

পরিতোষের একখানা হাত জোরে টিপে তাকে চুপ করতে ইঙ্গিত করলুম। আমাদের সঙ্গের লোকটি কিছুক্ষণ সেইদিকে অবাক হয়ে চেয়ে থেকে হঠাৎ যেন ডুকরে উঠল, গোড় লাগে পাঁড়েজী!

কথাটা কানে যাওয়া-মাত্র পাঁড়েজী খাতা থেকে মুখ না তুলেই চেঁচিয়ে উঠলেন, বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক, রামজী তোমার কল্যাণ করুন।

আরও খানিকটা বিড়বিড় ক'রে কি বললেন, সেগুলো অভিশাপ না আশীর্বাদ, তা ঠিক বোঝা গেল না। তার পরে ধীরে-সুস্থে সেই বিরাট খাতা বন্ধ ক'রে চশমা খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি?

আমি শিউরতন। এই দুটি ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।

বৃদ্ধ আমাদের দিকে চাইতেই আমরা ঘাড় নীচু ক'রে অতি বিনীতভাবে নমস্কার করলুম। আবার তুবড়ির মতন খানিকটা আশীর্বাদ বর্ষণ ক'রে হাসি-হাসি মুখে আমাদের দেখতে লাগলেন।

শিউরতন বললে, অমুক বেনের দোকানে এরা রাত্রিটুকুর মতন আশ্রয় চাইছিল, তা আমি এখানে নিয়ে এসেছি।

বৃদ্ধ আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় দেশ?

কলকাতায়।

কলকাতা শুনে বৃদ্ধ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমাদের নিরীক্ষণ ক'রে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, খাস কলকাতায়?

আজ্ঞে, খাস কলকাতায়।

তা বিছানাপত্তর সঙ্গে আছে তো?

এ-কথার আর কি জবাব দেব, চুপ ক'রে রইলুম। বহুদর্শী লোক, আমাদের অবস্থা বুঝতে বিশেষ দেরি হ'ল না। সঙ্গের লোকটিকে বললেন, আচ্ছা, তা হ'লে ওঁদের মুসাফিরখানায় নিয়ে যাও।

শিউরতন আবার তাঁকে ভক্তিভরে নমস্কার ক'রে আমাদের বললে, আসুন। আবার সেই চেয়ার-টেবিল পেরিয়ে বাইরে এসে সামনের উঠোন পেরিয়ে এ-পারের দরদালানে এসে একটা ঘরের ভেজানো দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে শিউরতন আমাদের বললে, এই হচ্ছে মুসাফিরখানা। এই সারের পাশাপাশি যতগুলো ঘর দেখছ, সবই মুসাফিরদের জন্যে। এই ঘরটাই সবচেয়ে ভালো ঘর, তোমরা এই ঘরে আজকের রাতটা কাটিয়ে দাও।

ঘরের মধ্যে দুটো তক্তাপোশ প'ড়ে আছে। তক্তাপোশের তক্তাগুলির মধ্যে ব্যবধান অন্তত এক বিঘৎ ক'রে হবে। অসাবধানে শুলে হাত-পা গ'লে নীচে প'ড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু খাটে শোয়া আরামদায়ক হবে কিনা, সে-কথা বিচার করার মতন অবস্থা আমাদের ছিল না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় মাথার ওপরে আচ্ছাদন পেয়েই খুশি হয়ে উঠলুম।

একটু ব'সেই শিউরতন উঠে বললে, আচ্ছা ভাই, আমি এখন তবে চলি। কাল তোমরা কখন বেরুবে?

বললুম, আমাদের বেরুতে-করতে অন্তত দশটা বেজে যাবে।

আচ্ছা, তোমরা যাবার আগে আমিই আসব'খন।

শিউরতন চ'লে গেল। আমরা দুজনে দুখানা তক্তাপোশে গিয়ে বসলুম। ঘরখানা বেশ বড়। মেঝে মাটির, কিন্তু দেওয়াল ও ছাত পাকা। ঘরের এক কোণে একরাশ, প্রায় ছাত অবধি তাড়া-করা কাঁচা কাঠ চেলা ক'রে রাখা হয়েছে, তা থেকে তীব্র একটা মদির গন্ধ বেরুচ্ছে। সেই গন্ধের আকর্ষণে রাজ্যের চকোলেট ও হলদে রঙের বড় বড় ভীমরুলের আমদানি হয়েছে। ভীমরুলদের অবিচ্ছিন্ন গুঞ্জনে ঘরের মধ্যে একটা অতিপ্রাকৃত অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। ঘরের আর-এক দিকে একটা আলমারির মতন বড় কুলুঙ্গি, সেই কুলুঙ্গির মধ্যে ফুট-দুয়েক উঁচু চারটে লোহার পা-ওয়ালা চৌকো কাচের দীপাধার ও তার ভেতরে গেলাসের মধ্যে জল ও রেড়ির তেলের দীপ রয়েছে। ঘরের আর-এক দিকে একটা বিরাট ঢেঁকি বংশপরম্পরা ধ'রে উইয়ের দল খেয়ে চলেছে, কিন্তু তখনও সেটার আধখানাও তারা শেষ করতে পারে নি।

আমরা খাটের ওপর ব'সে থাকতে-থাকতেই ঘরের মধ্যে অন্ধকার নিবিড় হয়ে এল। দেশলাই দিয়ে সেই বাতি জ্বালিয়ে শোবার ব্যবস্থা করছি, এমন সময় বৃদ্ধ পাঁড়েজী খড়ম পায়ে খট খট ক'রে আমাদের ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলুম, বৃদ্ধের সেই রামনাম-অঙ্কিত দেহ একটা মোটা গাঢ়ার চাদরে

আবৃত হয়েছে। ভদ্রলোক কিছুক্ষণ প্রশ্নাদি ক'রে বললেন, তাই তো, তোমাদের সঙ্গে বিছানাপত্র নেই, শীতে তো বড় কষ্ট হবে!

গতকাল যে আমরা রাস্তায় কাটিয়েছি, সে-কথা আর তাঁকে বললুম না। তিনি কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক চেয়ে উপরি-উপরি দু-চারটে হাঁক ছাড়লেন। একটা চাকর দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক হুকুম দিলেন, মেহমানদের জন্যে দুটো কম্বল এনে খাটে বিছিয়ে দাও।

চাকর চ'লে গেল। পাঁড়েজী জিজ্ঞাসা করলেন, আহার করবেন তো?

বিকেলবেলা বাজারে সেই যে ধুলো দিয়ে চিঁড়ে-দই মেখে খেয়েছিলুম, তাঁরা ততক্ষণে পেট থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে মহা হাঙ্গামা শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। ক্ষুধা তো দূরের কথা, বিবমিষায় দেহ অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল। পাঁড়েজীকে বললুম, বাজারে চিঁড়ে-দই খেয়েছিলুম, এখন আর খাবার কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই।

পাঁড়েজী বললেন, আচ্ছা, দুধ খানিকটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, রাত্রে যদি ক্ষুধার উদ্রেক হয় তো খেয়ো। আমাদের মালিকের হুকুম আছে, মেহমানদের যেন কোনও অসুবিধা না হয়। তা ছাড়া এখানে মহিষের দুধ অপর্যাপ্ত পাওয়া যায়, তোমাদের কোনও সঙ্কোচ করবার কারণ নেই।

ইতিমধ্যে একজন চাকর দুটো কালো 'ঘোড়ার কম্বল' নিয়ে উপস্থিত হ'ল। পাঁড়েজী বললেন, খাট-দুখানায় পেতে দাও।

চাকর কম্বল পেতে দিয়ে চ'লে যেতেই পাঁড়েজী বলতে লাগলেন, এই যে কম্বল দেখছ, এ অতি অদ্ভুত জিনিস। কোনও জানোয়ার, তা বিচ্ছুই বলো আর সাপ কি বিষখোপ্‌রাই বলো, এই কম্বলের ওপর কিছুতেই উঠতে পারবে না। দিনের বেলা হ'লে পিঁপড়ে ছেড়ে দেখিয়ে দিতুম, তারা এর ওপর দিয়ে চলতেই পারবে না, পা আটকে যাবে। এইজন্যে সন্ন্যাসী উদাসীরা এই কম্বল সঙ্গে রাখে। রাত-বিরেতে জঙ্গলে পাহাড়ে পথে ঘাটে তাদের ঘুরতে হয়, এই কম্বল পেতে শুয়ে পড়ে, কিছুতেই কিছু করতে পারে না।

আমরা ছেলেবেলা থেকে বাঘ ভাল্লুক সিংহ নেকড়ে সাপ কাঁকড়াবিছে প্রভৃতি সাংঘাতিক চতুষ্পদ ও সরীসৃপের কথা শুনেছি এবং বইতেও পড়েছি, কিন্তু বিষখোপ্‌রা মালটির কথা কখনও শুনি নি।

পাঁড়েজীকে জিজ্ঞাসা করলুম, বিষখোপ্‌রা কি?

ভদ্রলোক একটু বৈদান্তিক হাসি হেসে বললেন, সে ভগবানের তৈরী এক জানোয়ার, সাপের মতনই দেখতে, তবে তার পা আছে।

ভয়ের চোটে জিজ্ঞাসা করতেই ভুলে গেলুম, ক'টা পা আছে ?

একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা মহাভারত পড় নি বুঝি ?

বললুম, নিশ্চয় পড়েছি।

পাঁড়েজী বললেন, আশ্চর্য ! তা হ'লে বিষখোপ্‌রার কথা পড় নি ? আরে, ওই বিষখোপ্‌রাই তো পরীক্ষিতরাজাকে ডেঁশেছিলেন। বিষখোপ্‌রা ডাঁশলে লোকে একবার মাত্র চেঁচিয়ে ওঠে—আ-ই মুঝে বিষখোপ্‌রা নে ডাঁশা। বাস্, তারপরেই শেষ হয়ে যায়।

অদূর-ভবিষ্যতেই নিজের ঘুম সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পরিতোষ চকিতে প্রশ্ন করলে, এই ঘরে বিষখোপ্‌রা আছে নাকি ?

পাঁড়েজী অত্যন্ত উদাসীনভাবে বললেন, এ-ঘরে আছে কিনা জানি না, তবে মাঝে মাঝে তাঁর ডাক শুনতে পাই এদিকটায়।

পাঁড়েজী আমাদের ভরসা দিতে লাগলেন, কোনও ভয় নেই, রামজীর নাম করতে করতে শুয়ে পড়। ব্রহ্মশাপ না হ'লে বিষখোপ্‌রা কখনও কামড়ায় না।

ভদ্রলোক যাবার সময় আবার বললেন, আমি এক লোটা দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাই খেয়ে রামনাম ক'রে শুয়ে পড়।

পাঁড়েজী খট খট ক'রে বেরিয়ে চ'লে গেলেন। আমরা সামনা-সামনি সেই খাট-দুটোতে দুজনে উবু হয়ে মুখোমুখি ব'সে রইলুম। নতুন বিপদে প'ড়ে বাবা বিশ্বনাথের নাম জপতে জপতে হঠাৎ পাঁড়েজীর উপদেশ মনে প'ড়ে গেল। মনে মনে বিশ্বনাথের কাছে ক্ষমা চেয়ে বললুম, বাবা বিশ্বনাথ ! কিছু মনে ক'রো না বাবা। তুমি গোখরো কেউটে নিয়ে ঘর কর, বিষখোপ্‌রা সামলাতে পারবে না। এই রাত্রিটুকুর মতন দায়ে প'ড়ে ইষ্টনাম একটু অদলবদল ক'রে নিতে হচ্ছে।

মিনিটে সত্তরটা হিসাবে রামনাম জপ করতে শুরু ক'রে দিলুম।

উবু হয়ে ব'সে আছি। থেবড়ে বসতে ভয় হচ্ছে, পাছে কোথা দিয়ে বিষখোপ্‌রা এসে ডেঁশে দিয়ে যাবে, তারপর একবার 'আ-ই মুঝে বিষখোপ্‌রা নে ডাঁশা' ব'লেই কেতরে পড়ব।

একটু পরেই পরিতোষ একটা 'উঃ' আওয়াজ ক'রে বললে, কি বরাত দেখেছিস আমাদের ! ডাইনীর কবল থেকে খুনের কবলে, খুনের কবল থেকে আধমরা হয়ে বেঁচে নেকড়ের কবলে, নেকড়ের হাত থেকে যদি-বা বাঁচা গেল তো বিষখোপ্‌রা—

বাকিটুকু ভয়ে আর তার মুখ দিয়ে বেরুলই না।

ভাবতে লাগলুম, এর চেয়েও যে রাস্তায় নেকড়ের পালের মধ্যেও প'ড়ে থাকা ভালো ছিল বাবা! নেকড়েদের মতন ইনিও যদি একটু শুঁকেই ছেড়ে দেন, তবে এ-যাত্রা রক্ষা পাই,—জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম—

দুজনে মুখোমুখি ব'সে আছি। ঘরের দরজাটা খোলা, বাইরে একেবারে অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় ঘরের আলোটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঘরের কোণের কাঁচা কাঠের মধুপিয়াসী ভীমরুলদলের সেই অবিশ্রান্ত গুঞ্জন স্তব্ধ হয়েছে। ব'সে ব'সে ভাবছি,—সে আকাশ-পাতাল ভাবনার কি সীমা আছে? মাঝে মাঝে পরিতোষের মুখের দিকে চাইছি, তার চোখ-দুটোর সমস্ত স্পষ্ট দেখতে না পেলেও যতখানি দেখা যায়, তাতেই মনে হচ্ছে, অত্যন্ত অস্বস্তিকর চিন্তায় সে কাতর হয়ে পড়েছে।

নিস্তব্ধতাটা ক্রমেই যেন পীড়াদায়ক হয়ে উঠছিল, এমন সময় পরিতোষ হঠাৎ 'বাপ রে' ব'লেই সেই উবু-হওয়া অবস্থা থেকেই কিরকম ক'রে লাফ মেরে ব্যাঙের মতন মেঝেতে প'ড়ে গোঁ-গোঁ করতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

কি রে! কি হ'ল?—ব'লে খাট থেকে নেমে তাকে ধরলুম। সে সেই গোঁ-গোঁ অবস্থাতেই বললে, কিসে যেন পশ্চাদ্দেশে ডেঁশে দিলে!

বলিস কি রে!

নিশ্বাস বন্ধ ক'রে তার শরীরে বিষের ক্রিয়ার প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। রামনামের গতি অজ্ঞাতসারেই দ্বিগুণ হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে পরিতোষ দাঁড়িয়ে উঠে কাতরভাবে বললে, জায়গাটা ফুলে উঠেছে ব'লে মনে হচ্ছে।

তাড়াতাড়ি দুজন মিলে সেই গন্ধমাদন প্রদীপ উঠিয়ে নিয়ে এসে পরিতোষের খাটের ওপরে রেখে দংশন-কর্তা অথবা কর্ত্রীর সন্ধান করতে লাগলুম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলুম না। পরিতোষ বললে, আলোটা এই দুই খাটের মধ্যিখানে একটা উঁচু জায়গায় রাখতে পারলে ভালো হ'ত। আলো থাকলে শুনেছি তারা আসতে পারে না।

একটা উঁচু টুলের মতন কিছু পাওয়া গেলে ভালো হ'ত। কিন্তু ঘরের চারদিক খুঁজে-পেতে সেরকম কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। শেষকালে পরিতোষ প্রস্তাব করলে, একরাশ ওই চেলাকাঠ খাট-দুটোর মধ্যিখানে রেখে তার ওপরে আলোটা রাখতে পারলে কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পারা যেত।

প্রস্তাবটা সমীচীন মনে হওয়ায় ঘরের কোণের সেই চেলাকাঠের পাহাড় থেকে যেমন একখানা কাঠ টানা, অমনই রাজ্যের ভীমরুল বোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ ক'রে উড়তে আরম্ভ ক'রে দিলে। আমরা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলুম। আমার তো সেই শীতে একেবারে ঘাম ছুটতে লাগল, কারণ ইতিপূর্বে ভীমরুল-দংশনের অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছিল কিনা!

ভয়াল সেই অভিজ্ঞতার কথা মনে ক'রে আজ একাধারে হাসি পাচ্ছে আর পরিতোষের কথা মনে পড়ছে।

যা হোক, বেশ কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে একবার দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে উৎকর্ণ হয়ে ভীমরুলের গুঞ্জন শোনবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু কিছুই শুনতে পেলুম না। কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার খাটের ওপরে সেইরকম উবু হয়ে বসা গেল।

একটু বাদেই একজন একটা মাঝারি-গোছের এক-লোটা দুধ ও একটা কাঁসার গেলাস নিয়ে এসে মেঝেতে রেখে বললে, দুধ রেখে গেলুম, যখন ইচ্ছা হয় খেয়ো।

দরজার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে সে বললে, দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ো, নইলে কুকুর ঢুকে বিরক্ত করবে।

লোকটা বেরিয়ে যেতেই দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে খাটে এসে বসলুম। বিষখোপ্‌রার চিন্তা তখনও মনের মধ্যে উদ্যত হয়ে রয়েছে। স্মৃতির গভীরে ডুব মেরে হাতড়াচ্ছি, ব্রহ্মশাপ কখনও হয়েছে কিনা! মনে হতে লাগল, ভাগ্যে আমি জন্মাবার আগেই বাবা ব্রহ্মণ্যের 'ণ'কারটি লুপ্ত ক'রে দিয়েছিলেন! নইলে ব্রাহ্মণদের মধ্যেই তো আমাকে মানুষ হতে হ'ত, আমি যা ছেলে, কখন কোন্ ব্রাহ্মণ কি শাপ ঝেড়ে দিত, কে জানে!

একবার পরিতোষের দিকে চোখ পড়তে সে বললে, আচ্ছা, কাশী স্টেশনে কোনও পাণ্ডা আমাদের শাপ-টাপ দিয়েছিল রে?

অনেক ভেবে-চিন্তে বললুম, কই ভাই, কিছু মনে তো পড়ছে না।

আরও কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে পরিতোষ বললে, পূর্বজন্মের ব্রহ্মশাপও এ-জন্মে ফ'লে যেতে পারে। রোহিতাশ্ব বেচারীকে যে সাপে কামড়েছিল, সে তো পূর্বজন্মের ব্রহ্মশাপের ফলে।

তার পরে সে ঘটি থেকে গেলাসে দুধ ঢালতে ঢালতে গম্ভীরভাবে বললে, নিয়তি যদি থাকে তো কেউ বাঁচাতে পারবে না।

এক গেলাস সেই আগুন-গরম দুধ চোঁ-চোঁ ক'রে মেরে দিয়ে গেলাসটা ঘটির ওপর রেখে পরিতোষ বললে, বেড়ে দুধ রে, খেয়ে ফেল্।

ভয় ও উৎকণ্ঠা-রূপ দুই সড়কির তাড়নায় বিকেলবেলার সেই সাংঘাতিক চিঁড়ে-দইয়ের বিপ্লবাত্মক আর্তনাদ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিছু ক্ষুধারও উদ্রেক হচ্ছিল। গেলাসে খানিকটা দুধ ঢেলে নিয়ে ফুঁ দিয়ে-দিয়ে চুমুক দিতে লাগলুম। ও-দিকে পরিতোষ কম্বলের ওপর লম্বা হয়ে পড়ল। গেলাসটা শেষ হবার আগেই সে ঘুমের অভয় অঙ্কে ঢ'লে পড়ল।

খাটের ওপরে সেইরকম উবু হয়ে ব'সে আছি চক্ষুকর্ণ সজাগ ক'রে। পরিতোষের দিকে মধ্যে মধ্যে চোখ পড়ছে। তখন সন্ধ্যারাত্রি, বোধ হয় ন'টাও বাজে নি, ওরই মধ্যে দেহ তার ধনুকে পরিণত হয়েছে। বাইরে মাঝে মাঝে লোকজনদের কথাবার্তা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল, ক্রমে তাও বন্ধ হয়ে গেল। মাথার মধ্যে পাঁচ-সাত-দশজন থেকে থেকে ডুকরে উঠছে, আই মুঝে বিষখোপ্‌রা নে ডাঁশা। পরিতোষের নিশ্চিন্ত নিদ্রা দেখে ঈর্ষা হচ্ছে।

ক্রমে চারিদিক একেবারে নিষুতি হয়ে গেল, ঘরে-বাইরে ঝিল্লীর ঝঙ্কার শুরু হয়ে গেল—ঝম্ ঝম্ ঝম্।

লোটা থেকে বাকি দুধটা গেলাসে ঢেলে নিয়ে এক চুমুকে মেরে দিয়ে শোবার যোগাড় করতে লাগলুম। ভয়ানক জলতেষ্টা পেতে লাগল, কিন্তু জল কোথায়!

বিছানার ওপর গা ঢেলে দেওয়ার বোধ হয় মিনিটখানেকের মধ্যে তিড়-বিড়িয়ে লাফিয়ে উঠলুম। বাপ রে, এ যে কণ্টকশয্যা! সত্যিই, অদ্ভুত সেই কম্বল! সাপ বিছে বিষখোপ্‌রা তো দূরেব কথা, বাঘ ভাল্লুক পর্যন্ত তাতে পা দিতে পারে না। আমার গেঞ্জি শার্ট ধুতি ফুঁড়ে তার শোঁয়াগুলো ছুঁচের মতন দেহে বিঁধতে লাগল। একবার উঠে বসি, আবার শুয়ে পড়ি—এই করতে-করতে সেই কণ্টক-শয্যাতেই ঘুমিয়ে পড়লুম। সারারাত স্বপ্নের ঘোরে বিষ-খোপ্‌রা, পরীক্ষিৎ ও রোহিতাশ্বের সঙ্গে তর্ক করতে করতে কেটে গেল।

ঘুম থেকে উঠে দেখি, পরিতোষবাবুর তখনও নিদ্রাভঙ্গ তো দূরের কথা, তিনি একেবারে বেনের পুঁটুলি মেরে গেছেন, সেই পুঁটুলির গেরো খুলতে-খুলতে আমার দম বেরিয়ে গেল।

যা হোক, অনেক বায়নাক্কার পর তিনি গাত্রোত্থান ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, কত বেলা হয়েছে রে?

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখি, প্রকৃতির ঘুম তখনও ঘন কুয়াশার অবগুণ্ঠনে আচ্ছন্ন, অথচ কাজকর্ম শুরু হয়ে গিয়েছে, দু-একজন লোকও চলাফেরা করছে। যা হোক, মুখ ধুয়ে তাজা হয়ে আবার রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। যাবার আগে পাঁড়েজীর কাছে বিদায় নেবার জন্যে সেই ঘরে গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল। দেখলুম, সেই ভোরেই পাঁড়েজী স্নান সেরে সর্বাঙ্গে রামনাম দেগে খালি-গায়ে ব'সে সেই বিরাট খাতায় মুখ জুবড়ে হিসাবপত্রের মধ্যে ডুব দিয়েছেন। অন্যান্য কর্মচারীরাও সেই ভোরে এসে নিজের নিজের জায়গায় ব'সে গিয়েছে। আমরা পাঁড়েজীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম ; কিন্তু তিনি হিসাবপত্রে এমনই তন্ময় যে, তা বুঝতেও পারলেন না। দু-এক মিনিট অপেক্ষা ক'রে ব'লে ফেললুম, গোড় লাগে পাঁড়েজী।

সেই অবস্থাতেই পাঁড়েজী তুবড়ির মতন বড়বড় ক'রে আশীর্বাদ বর্ষণ করতে-করতে মুখ তুলে চশমা খুলে বললেন, কি, রাত্রে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার আশীর্বাদে ভালোই ঘুমিয়েছি। এবার আমরা যাই, আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। এই শীতের রাতে আশ্রয় দিয়ে আপনি যে উপকার করলেন—এ-জীবনে তা ভুলব না।

আমাদের কথা শুনে পাঁড়েজী দু-হাতে দু-কান চেপে ধ'রে বললেন, আরে, না না। আশ্রয় দিয়েছেন আমাদের মালিক, যাঁর আশ্রয়ে আমি আছি। আমাদের জমিদার, তিনি গরিব ও নিরাশ্রয়ের মা-বাপ। একবার যদি তাঁর কাছে গিয়ে তোমাদের দুঃখ জানাতে পার তো সারাজীবনের হিল্লে হয়ে যাবে।

কি একটু চিন্তা ক'রে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোথায় যাবে?

পাটনা।

পাটনায় কি কোনও খাস কাজ আছে?

বললুম, না, পাটনায় খাস কাজ কিছু নেই। আমরা দুঃখী লোক, চাকরির উমেদার, যেখানে দু-মুঠো খাবার ব্যবস্থা হবে, সেখানেই প'ড়ে থাকব। আমাদের উম্মিদও এমন কিছু বেশি নয়। আমরা একেবারে মূর্খও নই, কিছু ইংরেজী লেখাপড়াও জানা আছে।

আমাদের কথা শুনে বোধ হয় পাঁড়েজীর মনে একটু দয়া হ'ল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের আপনার জন কে আছে?

বললুম কেউ নেই হুজুর, আমরা একেবারে অনাথ।

পাঁড়েজী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা দুজনে কি ভাই হও?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মাসতুতো ভাই।

আমার কথা শুনে পরিতোষ ফিক ক'রে হেসে ফেললে। কিন্তু তখুনি গম্ভীর হয়ে পাশের সেই পাহাড়-প্রমাণ উঁচু খাতাপত্রের দিকে চেয়ে রইল।

পাঁড়েজী কিছুক্ষণ আমাদের দিকে চেয়ে থেকে বললে, দেখ, আমি তোমাদের একটা পরামর্শ দিচ্ছি, বৃদ্ধের পরামর্শ বিপদকালে সর্বদা গ্রহণীয়। তোমরা সোজা চ'লে যাও আমাদের মালিকের কাছে। কোনরকমে তাঁর কাছে গিয়ে যদি নিজেদের দুঃখ জানাতে পার তো একটা হিল্লে তোমাদের হয়েই যাবে। সেখানে যদি বিফলমনোরথ হও তো আমার কাছে ফিরে এসো, কোনরকমে খেয়ে প'রে বেঁচে থাকবার মতন ব্যবস্থা হয়েই যাবে। মাথার ওপর রামজী আছেন, তাঁর নাম করতে করতে চ'লে যাও।

যা হোক, রামজী আমাদের মনোমত দেবতা না হ'লেও আপদ্ধর্ম হিসাবে রামজীর নামই স্মরণ ক'রে বেরিয়ে পড়া গেল। বাজারে কিছু খেয়ে নিয়ে রওনা হব ঠিক ক'রে সেদিকে কিছুদূর অগ্রসর হতেই কালকের সেই শিউরতনের সঙ্গে দেখা। শিউরতন বললে, আমি তোমাদের কাছে যাচ্ছিলুম। একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম যে, তোমরা আজ সকালে চ'লে যাবে।

তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমরা সেই মোদকের দোকানে এসে উপস্থিত হলুম। দেখলুম, প্রায় দশ-বারোজন লোক দোকানের ভেতরে ব'সে খাচ্ছে। কেউ-বা চাল-ছোলা-ভাজা, কেউ-বা ভুট্টার খই দিয়ে জলপান করছে। অপেক্ষাকৃত বিলাসী যারা, তারা চিঁড়ে-দই খাচ্ছে। শিউরতনের মুখে শুনলুম, এরা প্রায় সকলেই অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। তা না হ'লে ময়রার দোকানে এসে সকালবেলা জল খাবার সাধ্য এখানকার অল্প লোকেরই আছে।

দোকানে ঢুকে এক কোণে বসতেই সকলে জিজ্ঞাসু ও কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইতে লাগল। শিউরতন সাধারণভাবে আমাদের পরিচয় দিলে, এরা বাংগাল দেশের লোক। ঘরে কেউ নেই, ভাগ্য টেনে এনেছে এখানে। নিরাশ্রয়, পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আমি কাল কাছারিতে নিয়ে গিয়ে শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলুম।

এতখানি ব'লে শিউরতন একবার সগর্বে চারিদিক চেয়ে নিয়ে আবার আরম্ভ করলে, পাঁড়েজী এঁদের বলেছে মালিকের সঙ্গে দেখা করতে, আমিও তাই বলেছি।

একটা লোক, ভুট্টার খইয়ে তার মুখ ভরতি, পাছে তার আগেই কেউ কোনও মন্তব্য প্রকাশ ক'রে ফেলে, সেজন্য অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে 'মরি কি বাঁচি' ক'রে অর্ধচর্বিত খাদ্যের তাল গিলতে গিলতে আমাদের ব'লে ফেললে, আমাদের মালিক মানুষরূপী দেবতা, তাঁর কাছে একবার যদি পৌঁছতে পার তো সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে।

বলতে বলতে সেখানে যতগুলি লোক ব'সে ছিল, তারা সকলেই গদগদ হয়ে মালিকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

যা হোক, আবার সেই ধুলোরূপী চিনি দিয়ে সামান্য কিছু চিঁড়ে-দই গলাধঃকরণ ক'রে শিউরতনের কাছ থেকে মালিক-গৃহের পথ-নির্দেশ নিয়ে রামনাম স্মরণ ক'রে যাত্রা করা গেল।

পথ চলতে চলতে কানের মধ্যে বাজতে লাগল, 'কোশল-নৃপতির তুলনা নাই, জগৎ জুড়ি যশোগাথা, দীনের তিনি সদা শরণ-ঠাঁই, ক্ষীণের তিনি পিতা-মাতা।'

চলেছি পথ বেয়ে। দীর্ঘ পথ সর্পিল গতিতে এঁকে-বেঁকে চ'লে গিয়েছে মাঠের মধ্য দিয়ে। চোখের ওপর দিয়ে সেই পুরাতন ছবি একটার পর একটা ভেসে যাচ্ছে, মনের মধ্যে কিন্তু তোলপাড় চলেছে। অদৃষ্টের হালচাল দেখে মনে হচ্ছে, অতি ধীরে হ'লেও নিশ্চিতরূপে সে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে সেই পুরাতন আবর্তের পানে। সে-সম্বন্ধে মাঝে মাঝে পরিতোষের সঙ্গে আলোচনাও হচ্ছে। একবার তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, কলকাতায় যদি ফিরে যেতে হয়, আবার ইস্কুলে ঢুকবি তো?

অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে সে বললে, নাঃ, আবার ইস্কুল!

বললুম, তোর বাবা কিছু বলবেন না?

সে বললে, না।

মনে হতে লাগল, ইস্কুল-যাওয়া সম্বন্ধে যদি তারই মতন বলতে পারতুম 'নাঃ'!

সঙ্গে সঙ্গে একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল, একদিন সকাল-বেলা কি-একটা কথা নিয়ে তক্কাতক্কি হতে হতে দাদা বাবাকে ব'লে ফেললে, লেখাপড়া আমার আর হবে না। ওসব ছেড়ে দিয়ে চাকরি-বাকরি ক'রে সংসারে সাহায্য করবার দিকে মন দেব।

এই কথা শুনে বাবার মাথায় সেদিন কিরকম খুন চেপে গেল। তিনি সারাদিন ধ'রে অমানুষিকভাবে দাদাকে পিটতে আরম্ভ করলেন। একতলা-

দোতলা রক্তে রক্তারক্তি হয়ে গেল। পাড়ার মুরুব্বীরা এসে বাবাকে থামাতে না পেরে চ'লে গেলেন। আশপাশের বাড়ির গিন্নীরা চেঁচিয়ে মাকে ডেকে বাবার উদ্দেশে বলতে লাগলেন, ছেলেটাকে মেরে ফেললে যে!

মা নির্বিকার হয়ে দু-হাতে বারান্দার রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে সেই বীভৎস কাণ্ড দেখতে লাগলেন।

প্রহারের যন্ত্রণায় দাদা চিৎকার করতে লাগল, কে আছ, আমায় বাঁচাও—আজ আমাকে যে বাঁচাবে, আমি চিরকাল তার কেনা হয়ে থাকব।

কিন্তু কেউ এল না। বাবার মুখে এক কথা, আজ তোমাকে মেরেই ফেলব।

এইরকম চলেছে। নির্জিত ও নির্যাতনকারী উভয়েই ক্লান্ত, তবুও মার চলেছে। শেষকালে কেউ যখন বাঁচাতে এল না, তখন দাদা নিজেকে সাহায্য করবার গুরুভার নিজের কাঁধেই তুলে নিলে।

এক হেঁচকায় বাবার হাত থেকে ছিটকে প'ড়ে প্রায় গড়াতে গড়াতে ছুটে দাদা একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বাবাও তার পেছনে-পেছনে ছুটলেন। কিন্তু তাঁকে ঘরের মধ্যে আর ঢুকতে হ'ল না। দরজার কাছে পৌছবার আগেই দাদা দরজার খিলটা এক হেঁচকায় উপড়ে ফেলে বাবার সম্মুখীন হয়ে বললে, আর একটা আঘাত যদি আমায় কর তো একঘায়ে তোমায় শেষ ক'রে দেব।

দাদার সেই মূর্তি দেখে বাবা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দেখলুম, তাঁর প্রহারোদ্যত হাতখানা শিথিল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে নীচে প'ড়ে গেল। দাদা চিৎকার করতে লাগল, আপনার অনেক অত্যাচার আমি শৈশব থেকে সহ্য ক'রে আসছি, আজ তার শেষ হয়ে যাক।

বাবা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাদার সামনেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি আর অস্থির এতক্ষণ কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে-কাছেই ওপর-নীচ করছিলুম। দাদার আর্তনাদের তালে তালে আমাদের কান্নার আওয়াজও উঠছিল পড়ছিল। হঠাৎ তাকে বৈষ্ণবভাব থেকে শাক্তভাবে পরিণত হতে দেখে আমরাও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম।

বোধ হয় ব্যাপারটা বিশেষ গোলমেলে হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেখে মা এসে পড়লেন তাঁদের দুজনের মাঝখানে, তাঁর মুখখানা ঘিরে একটা অস্বাভাবিক কাঠিন্য, কিন্তু দুই চোখে অশ্রু টলটল করছে।

মা বাবাকে সেখান থেকে চ'লে যেতে বলামাত্র তিনি চ'লে গেলেন।

দাদাকে দেখলুম, তার চোখ-দুটো লাল, মুখখানা একেবারে থেঁতো হয়ে গেছে, ধুতি শতচ্ছিন্ন, সেইভাবে হুড়কোখানা তখনও তুলে থরথর ক'রে কাঁপছে।

দাদার সেই অবস্থা দেখে মা ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। সেও মাকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

দাদা ম'রে গেল মনে ক'রে আমি আর অস্থির চিৎকার ক'রে উঠলুম। মা বললেন, জল নিয়ে আয়।

তখুনি বালতি ক'রে জল নিয়ে এসে দাদার মাথায় দিতে লাগলুম। মা'র চিৎকার শুনে প্রতিবেশিনীরা, যাঁরা অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা ছুটে এলেন। চেঁচামেচি শুনে বাবা সেখানে এসে ব্যাপার দেখে ছুটলেন ডাক্তারের সন্ধানে। মিনিট দশেকের মধ্যেই বাবা পাড়ার একজন ডাক্তারকে নিয়ে এলেন। ডাক্তার নানারকম পরীক্ষা ক'রে দাদার মাথা থেকে পা পর্যন্ত নানা স্থানে ব্যাণ্ডেজ ও তাপ্পি মেরে, দুটো-তিনটে ওষুধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন ও বাবাকে মৃদু তিরস্কার ক'রে তাঁর জন্যেও একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখলেন। বাবা ছুটলেন ওষুধ আনতে, দাদা তখনও অজ্ঞান।

বোধ হয় ঘণ্টাখানেক বাদে দাদার জ্ঞান হ'ল। সে আচ্ছন্নের মতন আমাদের দেখতে দেখতে সেই অবস্থায় শুয়ে-শুয়েই মাকে জড়িয়ে ধরলে, মা পাশেই ব'সে ছিলেন।

আমরা তিন ভাইয়ে একটা বড় বিছানায় শুতুম। দাদার জন্যে তখন আলাদা বিছানা ক'রে দেওয়া হ'ল। মা তাকে নিয়ে রইলেন।

সেদিন আর আমাদের খাওয়া-দাওয়া নেই। বাবা একটা ঘরে শুয়ে আছেন, আমাদের ঘরে মা দাদাকে নিয়ে আছেন। তিনি কখনও তার পাশে শুয়ে পড়ছেন, কখনও-বা উঠে বসছেন। ঘরের সামনেই একটা চওড়া ঢাকা বারান্দায় টেবিল চেয়ার বেঞ্চি পাতা, সেখানে ব'সে আমরা পড়াশোনা করতুম—আমি আর অস্থির সেখানে ব'সে। বাড়িতে আরও দু-তিনটি মেয়ে থাকতেন, তাঁরাই ছোট ভাই-বোনদের দেখাশোনা করতে লাগলেন।

সন্ধ্যের সময় মা দাদাকে ছেড়ে উঠে সারাদিন বাদে আমাদের খাইয়ে ওপরে পাঠিয়ে দিলেন। দাদার বিছানার অনতিদূরে বিছানা পেতে সেই সন্ধ্যে-রাতেই আমরা শুয়ে পড়লুম। মা-বাবা খেলেন কিনা জানি না। আমরা শুয়ে পড়বার বোধ হয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মা এসে দাদার মাথার কাছে বসলেন, দাদা তখন, ঘুমে কিনা জানি না, একেবারে অচেতন।

অনেক রাত্রে দাদার কণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙে গেল। শুনলুম দাদা বলছে—তুমি আমায় মাসে পনেরোটা ক'রে টাকা দিও, তা হ'লেই আমার হবে।

সকালবেলা উঠে দাদা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আর ফিরল রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টায়। জিজ্ঞাসা করলুম, সারাদিন কোথায় ছিলে দাদা?

দাদা কম্পিতকণ্ঠে বললে, এক বন্ধুর বাড়িতে।

একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললে, এবার এখান থেকে সম্পর্ক উঠল রে! আমি চ'লে যাচ্ছি বেলগেছের ভেটারিনারি কলেজে পড়তে। সেখান থেকে পাস ক'রে বেরিয়ে চাকরি নিয়ে চ'লে যাব বিদেশে। এ-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল।

অভিমানে তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। দাদার কথা শুনে আমি ও অস্থির কাঁদতে লাগলুম। অনেকক্ষণ পরে সেইরকম ধরা-ধরা গলায় দাদা বললে, মা রইল, দেখিস।

এর পরের অংশটুকুর সঙ্গে যদিও বর্তমান কাহিনীর সম্পর্ক কম, তবুও সেটুকু এইখানেই শেষ ক'রে রাখি।

দাদা প্রতিদিনই বাবা ঘুম থেকে ওঠবার আগেই বেরিয়ে যায় আর ফেরে রাত্রে। বাবাও তার কোনও খোঁজ করেন না, শুধু মা আসেন তার সঙ্গে কথা বলতে। মায়ে-ছেলেয় ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দায় ব'সে কি-সব কথাবার্তা হয় তা বুঝতে পারি না, দাদা ঘরে ফেরবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ি। এই কয়েকদিনের মধ্যে সে যেন আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে চ'লে গেল। মনের মধ্যে নিয়তই একটা খোঁচা বাজতে লাগল, দাদা চ'লে যাবে, দাদা পর হয়ে যাবে, সে আমাদের ভুলে যাবে।

এইরকম দিনকয়েক চলবার পর একদিন বাবা আপিসে বেরিয়ে যাবার কিছু পরেই দাদা বাড়িতে এসে স্নান ক'রে খেয়ে একটা বাক্সতে নিজের জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে মাকে প্রণাম ক'রে ভাড়াটে গাড়ি চ'ড়ে চ'লে গেল।

তারপর তিন বছরের মধ্যে তিন মাস সে বাড়ি থাকে নি। ওখান থেকে পাস ক'রে সে চ'লে গেল বিদেশে চাকরি নিয়ে। সেখানে, না খেয়ে, একটি একটি ক'রে পয়সা জমিয়ে সে বিলেত চ'লে গেল। অবিশ্যি বিলেত যাওয়া সম্বন্ধে বাবাই ছিলেন তার প্রধান সহায়। যা হোক, ইংলণ্ডে বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে আমেরিকায় গিয়ে অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে পড়াশোনা ক'রে মানুষের ডাক্তার হয়ে আজ সমারোহে সেখানে সে বাস করছে। সেই থেকে বাড়ির সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, আজও সে বাড়ি ফেরে নি।

বাবা মনে করেছিলেন, ছেলেকে নিজের মনের মতন ক'রে তৈরি করবেন, অবিশ্যি বাবার পক্ষে সে-কথা ভাবা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু বাবার পেছনে আর একজন বড় বাবা অদৃশ্যে ব'সে সকল বাবারই যে জীবন নিয়ন্ত্রণ করছেন, শাসন করবার সময় অনেক বাবারই সে-কথা স্মরণ থাকে না। তার ফলে বাবা হারালেন সন্তান; আর আমরা যা হারালুম, তা প্রকাশের নয়।

পথ চলতে চলতে বেলা যত প'ড়ে আসতে লাগল, মনের মধ্যে কেন জানি না, সেদিনকার সেই ছবিগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

চলেছি পথ বেয়ে। রাত্রিটুকু ছাড়া এই তিন দিন নিরন্তর পথ বেয়ে চলেছি। সেই সকাল থেকে এতক্ষণ বোধ হয় দশ-বারো মাইল পথ অতিক্রম করেছি। জুতো-জোড়ার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, সকালবেলাতেই পথের পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হ'ল। পায়ের তলা জ্ব'লে যাচ্ছে, তবুও চলেছি কোথায় সেই দীনের পালক, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা, তাঁরই উদ্দেশে।

পথে লোক দেখলেই জিজ্ঞাসা করি, কোথায় তাঁর বাড়ি, আর কতদূর?

সকলেই তাঁকে জানে; বলে, আরও কয়েক মাইল। আশায় নতুন ক'রে বুক বেঁধে আবার চলেছি। মাঝে মাঝে হাঁটু মুড়ে আসে, পথের ধারে ব'সে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার চলেছি। ক্ষুধায় নাড়ীতে পাক দিচ্ছে, জীবদ্দশাতেই বায়ুভোজী হতে হয়েছে। শীতের দিনেও তৃষ্ণায় কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে। সূর্য পশ্চিমে ঢ'লে পড়ল ব'লে, তবুও চলেছি।

চলতে চলতে আমরা একটা শহরের মতন জায়গায় এসে পড়লুম। পথের ধার দিয়েই রেল-লাইন চ'লে গিয়েছে। দু-একখানা বাড়ির গাড়িও দেখলুম আমাদের পেরিয়ে চ'লে গেল। এক জায়গায় মাঠে একদল ছেলেকে ক্রিকেট খেলতে দেখলুম। আরও কিছুদূর অগ্রসর হবার পর দু-চারখানা ইটের বড় বাড়িও চোখে পড়ল। লোকজনের চলন-ফেরন ও সাজ-পোশাকের মধ্যে একটু নাগরিক ভাবও লক্ষ্য করতে লাগলুম।

ক্রমেই রাস্তা জনবহুল হয়ে উঠতে লাগল। বেশ বুঝতে পারলুম, আমরা একটা ছোট শহরের মধ্যে অথবা কোন বড় শহরের প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। অজানা অপরিচিত হ'লেও শহরের মুখ দেখে আমাদের নাগরিক মন একটু খুশির দোলায় নেচে উঠল। ভাবলুম, আজ রাতে যদি একান্ত কোথাও আশ্রয় না-ই মেলে, তা হ'লে অন্তত ইষ্টিশানে প'ড়ে থাকতে পারব।

পথের লোকদের জিজ্ঞাসা করতে করতে চলেছি, নবাবসাহেবের বাড়ি কোথায় ?

সকলেই প্রথমে অবাক হয়ে মুখের দিকে চায়। তার পরে বলে, এই সোজা চ'লে গিয়ে বাঁ-দিকে ফিরতে হবে, তার পরে ডাইনে—

সোজা গিয়ে বাঁয়ে ঘুরে আবার ডাইনে ফিরে চলেছি। বোধ হয় আধ মাইল যাবার পর আমরা একটা বাজারের মতন রাস্তায় এসে পৌছলুম, তার দু-দিকে সারি সারি দোকান-ঘর। দু-দিকের দুই সার গিয়ে মিলেছে এক প্রকাণ্ড প্রাসাদের সিংহদ্বারে।

সিংহদ্বারের ওপরেই একটা খোলা ছাত, দূর থেকে মনে হ'ল, যেন সেই ছাতের ওপরে কারা ব'সে রয়েছে। তাদের পাশেই একটা উঁচু জায়গায় সোনালী রঙের কি-একটা ছোট্ট জিনিস ঝকঝক করছে, অস্তরাগরঞ্জিত মন্দির-চূড়ার কনককুম্ভের মতন।

সিংহদুয়ারের কাছে এসে দেখলুম, সেখানে দু-তিনজন জঙ্গী-উর্দি-পরা বন্দুক-ধারী সিপাহী গটমট ক'রে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে, সামনেই একটা ভাঙা কামান সযত্নে সাজানো রয়েছে।

ভাবতে লাগলুম, এই প্রাসাদের মধ্যে কোথায় নবাবসাহেব আছেন, সেখানে আমাদের মতন অকিঞ্চন পৌছবে কি ক'রে! কাকেই বা তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করি! সেপাইদের সাজ-পোশাক ও ঘোরন-ফেরন দেখলে তো বুকের রক্ত জল হয়ে যায়!

অনেক চিন্তা ও পরামর্শের পর বুক ঠুকে 'জয় বাবা বিশ্বনাথ' ব'লে এগিয়ে গিয়ে এক সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করলুম, এটা কি অমুক নবাবসাহেবের দৌলতখানা ?

ভেবেছিলুম, সিপাহীসুলভ ধমক ও তাড়া দিয়ে সে আমাদের দূর ক'রে দেবে ; কিন্তু আমাদের অনুমান ব্যর্থ ক'রে অতি মিষ্টি সুরে সে বললে, মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাও ? কোথায় তোমাদের বাড়ি ?

বাংলাদেশ।

সিপাহী বললে, ওই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চ'লে যাও, সেই ছাতে মালিক আর সৈয়দসাহেব ব'সে আছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, সৈয়দসাহেব কে ?

তিনি মালিকের হকিম। কোনও ভয় নেই, নির্ভয়ে উঠে যাও, কেউ কিছু বলবে না।

নির্ভয়ে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হওয়া গেল।

ওপরে উঠে দেখি, ভারতীয় চিত্রের আদর্শে একখানা উঁচু-নীচু ছাত, এখান থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে একটা ছাতে, ওখান থেকে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে অন্য ছাতে। ছাতের তিন দিক, অর্থাৎ সামনে রাস্তার দিক ছাড়া, মানুষের চেয়ে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। আর সেই দেওয়ালের মাঝে মাঝে চমৎকার সব বাহারে কুলুঙ্গি। খোলা ছাতের দেওয়ালে এমন-সব সুদৃশ্য কুলুঙ্গি রাখবার মানে বুঝতে পারলুম না। বোধ হয় সমতল দেওয়াল খারাপ দেখায় ব'লে বাহার করবার জন্যে সেগুলি করা হয়েছে।

সেখান থেকে কয়েক ধাপ উপরে উঠে আর-একটা ছাতে গিয়ে পৌঁছলুম। সামনেই দেখা গেল, একজন সঙ্গিনধারী পাহারাদার দাঁড়িয়ে আছে, ছবির মতন স্থির। অনতিদূরেই, ছাতের প্রায় সীমানায় রাস্তার দিকে মুখ ক'রে পাশাপাশি ছুটো গদি-মোড়া চেয়ারে দুজন বৃদ্ধ ব'সে আছেন। অর্থাৎ আমরা মাত্র তাঁদের পিঠের দিকটাই দেখতে পেলুম। একপাশে ঘড়াঞ্চের মতন উঁচু একটা কাঠের টেবিলের মতন জায়গায় একটা জরির টুপি। বুঝতে পারলুম, এই টুপিটাই দূর থেকে মন্দিরচূড়ার স্বুবর্ণকলসের মতন দেখাচ্ছিল, সূর্যাস্তের আভায় তখনও সেটা ঝকঝক করছিল।

আমাদের দেখে পাহারাদার জিজ্ঞাসা করলে, কি চাই তোমাদের ?

বললুম, মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ওই তো মালিক সামনেই ব'সে আছেন।

পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেলুম। দেখলুম, ছুই বৃদ্ধ পাশাপাশি চোখ বুজে ব'সে আছেন। দুজনেরই মাথায় ধপধপে সাদা বাবরি-চুল ও মুখে লম্বা সাদা দাড়ি। আন্দাজ করবার মতন বয়স তাঁদের পেরিয়ে গিয়েছে, তাই সেটা ঠিক অনুমান করতে পারলুম না। আমরা দুটো লোক যে তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম—পাশে কেন, প্রায় সামনে বললেও চলে, তা কেউ একবার ফিরেও দেখলেন না।

দুজনে একরকম নিশ্বাস বন্ধ ক'রে সেই ধ্যানী মূর্তিযুগলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তাঁরা পশ্চিম দিকে মুখ ক'রে ব'সে ছিলেন, দেখতে দেখতে তাঁদের মুখের ওপর ছায়া ঘনিয়ে আসতে লাগল, জরির শিরস্ত্রাণ ক্রমেই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। একবার পাহারাদারের দিকে তাকালুম, দেখলুম, সেও নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু তার করধৃত বন্দুকের মাথায় কিরিচের ডগাটুকু চকচক করছে।

মনের মধ্যে কে যেন খোঁচা দিয়ে ধমকে উঠল, ক'দিনের এই দুরন্ত পরিশ্রমের পর মন্দিরের দরজার কাছে এসে ফিরে যাবি? এখনি ধরণী আঁধার হয়ে যাবে, তার পরে আবার সেই অন্ধকারে পথের ধারে শোওয়া—

অথচ এঁদের মধ্যে কে যে মালিক তা বুঝতে পারছি না, কাকে সম্বোধন করব! দুজনেই চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন।

আর দেরি নয়। এক কদম এগিয়ে গিয়ে ঘাড় নীচু ক'রে কুর্নিশ ক'রে বেশ চেঁচিয়েই ব'লে ফেলা গেল, আদাব আর্জ্ মালিক!

দুই বৃদ্ধ একেবারে চমকে উঠে চোখ খুললেন। তাঁদের মধ্যে যাঁকে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী মনে হয়েছিল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে তোমরা? কি চাও?

বললুম, মালিক, আমরা মুসাফির, বহু দূর দেশ থেকে আপনার নাম শুনে হাঁটতে হাঁটতে এইমাত্র এখানে এসে পৌঁছেছি, আমরা সারাদিন অভুক্ত ও পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত, চারদিন অনবরত হেঁটেছি, আমরা দাঁড়াতে পারছি না এমন অবস্থা।

বৃদ্ধ অতি ক্ষীণস্বরে হাঁক দিলেন, এই—

অদূরেই যে শান্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল, ডাক শুনে একরকম ছুটে এসে সে কুর্নিশ ক'রে সামনে দাঁড়াতেই তিনি তাকে বিড়বিড় ক'রে কি যে বললেন, ধরতে পারলুম না।

কথাটা শুনেই লোকটা আবার সেইরকম দ্রুতপদক্ষেপে নীচে নেমে গেল। দু-তিন মিনিটের মধ্যে শান্ত্রীর পেছনে একটা লোক দুটো মোড়া নিয়ে উপস্থিত হ'ল। বৃদ্ধ তাকে হুকুম করতেই সে মোড়া-দুটো তাঁদের সামনে পাশাপাশি রেখে চ'লে গেল। তিনি আমাদের বললেন, ব'স এখানে।

আমরা দুজনে বসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

কলকাতায়।

তা, এই বয়সে তোমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছ কেন? তোমাদের কি আপনার লোক কেউ নেই?

একবার মনে হ'ল, ব'লে ফেলি, হুজুর, দুনিয়ায় আপনার বলতে আমাদের কেউ নেই। কিন্তু কি জানি কেন, একেবারে নির্জলা মিথ্যাকথাটা বলতে বাধ-বাধ ঠেকতে লাগল। বললুম, মালিক, আমাদের সবই আছে, কিন্তু আল্লা যার ভাগ্যে যা লিখেছেন, তা তো ভোগ করতেই হবে।

বলা বাহুল্য, এইরকম সব বুক্‌নি বিশুদার আড্ডায় হামেশাই লোকের মুখে শুনতুম, কিন্তু এত শিগ্‌গিরই যে সেগুলো কাজে লাগবে তা তখন মনেই করতে পারি নি।

এবারে বৃদ্ধ আমাদের আর কিছু না ব'লে পাশে উপবিষ্ট অতিবৃদ্ধকে কি-সব বলতে লাগলেন। যে ভাষায় তিনি কথা বলতে লাগলেন, তা উর্দু নয়, নিশ্চয় ফারসী হবে। তবে কথার মধ্যে দু-তিনবার বাংগালী শব্দটির উল্লেখ করলেন।

তাঁর কথা শুনে অপর বৃদ্ধ উর্দু'তে বললেন, ওদের মুসাফিরখানায় পাঠিয়ে দাও, ওরা খাবার ব্যবস্থা নিজে ক'রে নেবে'খন।

এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, আমরা যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলুম, তিনি আসল মালিক নন। যা হোক, মালিকের কথা শুনে তিনি বললেন, দেখ, আমাদের মালিকের মুসাফিরখানা আছে, সেখানে গিয়ে থাক। থাকবার কোনও অসুবিধা হবে না। তবে তোমরা হিন্দু, আমাদের তৈরী খাবার তো তোমাদের চলবে না। আমাদের হিন্দু বাবুর্চীও নেই, সেইজন্যে আহারের ব্যবস্থা তোমাদের নিজে ক'রে নিতে হবে।

কথাটা শুনে দ'মে গেলেও মনের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে আশাও উঁকি দিতে লাগল, যা হোক, থাকবার একটা জায়গা তো ভগবান ঠিক ক'রে দিয়েছেন, হয়তো আরও কিছু প্যাঁচ না ক'ষে তিনি আহারের ব্যবস্থাটা করবেন না।

পরিতোষের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার মুখখানা ঘিরে একটা অপ্রসন্ন ভাব ফুটে উঠেছে। তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হকিমসাহেবকে, অর্থাৎ যিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তাঁকে, কি-একটা বলতে যাচ্ছি, এমন সময় পরিতোষের আওয়াজ কানে এল। পরিতোষ চোস্ত উর্দু'তে বললে, মালিক, একটা কথা আপনার চরণে নিবেদন করতে চাই।

আসল মালিক, যিনি এতক্ষণ চেয়ারে হেলান দিয়ে নির্জীবের মতন ব'সে ছিলেন, পরিতোষের কথা শুনে ধড়মড় ক'রে যতদূর সম্ভব সিধে হয়ে বললেন, বল বেটা, কি তোমার বক্তব্য শুনি!

পরিতোষ বললে, মালিক, আমরা যে-ঘরের ছেলে সে-ঘরে আমাদের বয়সী ছেলেকে একলা রাস্তায় বেরুতে দেওয়া হয় না, গাড়ি-চাপা পড়ার ভয়ে। কিন্তু আমরা খোদার ভরসা ক'রে গৃহত্যাগ করেছি জীবনে উন্নতি করব ব'লে। খোদার কৃপায় অনেক স্থানে আশ্রয়ও পেয়েছি, কিন্তু সব জায়গা থেকেই বিনা-

দোষে অপমানিত ও প্রহৃত হয়ে তাড়িত হয়েছি। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, কোথাও অন্নদাস হয়ে আর থাকব না। আপনি মালিক, বিশ্বসুদ্ধ লোক আপনার দয়ার গাথা গায়, সেই কথা শুনে তীর্থযাত্রীর মতন আপনার পায়ের কাছে এসে পৌঁছেছি। আপনার বিশাল রাজত্ব, এই রাজত্বের মধ্যে কোথাও যদি কোনও কাজ দয়া ক'রে দেন, তবেই আমরা থাকব, নইলে খোদার যা মর্‌জি তাই হবে।

পরিতোষের কথা শুনে দুই বৃদ্ধ একেবারে চন্‌মনিয়ে উঠলেন। হকিম-সাহেব কিছুক্ষণ ধ'রে গড়গড় ক'রে ফারসীতে নবাবসাহেবকে কি-সব বললেন, তার একটি বর্ণও বোধগম্য হ'ল না। তাঁর কথা শেষ হতে নবাবসাহেব আমাদের বললেন, কিন্তু তোমরা তো ছেলেমানুষ, এখনও খেলে বেড়ানোর বয়স পেরোয় নি, তোমাদের ওপরে কি কাজের ভার দেওয়া যেতে পারে?

এবার আমি বললুম, হুজুর, আপনার বাড়িতে ছোট ছেলেপুলে যদি থাকে তো তাদের পড়াবার ভার আমাদের ওপর দিতে পারেন। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্রে আমরা এক-একটি দিগ্‌গজ। আমাদের বয়স দেখে আমাদের বিদ্যার মাপ করবেন না।

আমার কথা শুনে দুই বৃদ্ধ একেবারে অবাক। বোধ হয় পাছে নিজের বিদ্যা ধরা প'ড়ে যায়, সেইজন্য হকিমসাহেব এবার ফারসী ছেড়ে উর্দু ভাষাতেই নবাবসাহেবকে বললেন, বাংগালীর জেলেরা খুবই তালিম-ইয়াফ্‌তা হয়। আমি কলকাতায় অনেকদিন বাস করেছি, আমি জানি।

দুই বৃদ্ধে পরামর্শ চলতে লাগল—কখনও ফারসীতে, কখনও উর্দুতে। ওদিকে সূর্য প্রায় ডুবে গেলেন, সামান্য একটু আলোতে তাঁদের মুখ দেখা যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা চলবার পর নবাবসাহেব আমাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, হ্যাঁ, আছে, বাড়িতে ছোট বাচ্চা আছে, আমার নাতি আছে। সে আমাদের লেখাপড়া কিছু কিছু জানে, কোরানশরিফ পড়তে পারে। তোমরা যদি তাকে বাংগালী, আংরেজী, সংস্কৃত, তারিখ ও আর যা যা বললে, শেখাতে পার, তা হ'লে তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ তো থাকবই, তা ছাড়া তোমাদের আখেরে ভালো হবে।

মালিকের সহস্র বৎসর পরমায়ু হোক। আমাদের যতখানি সাধ্য তার চেষ্টার ত্রুটি করব না, আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন।

আমাদের কথা শুনে কম্পিত করুণ কণ্ঠে বৃদ্ধ চিৎকার ক'রে উঠলেন, আল্লাহ্!

আর্তনাদের মতন অস্বাভাবিক সেই কণ্ঠস্বর শুনে আমার বুকের ভেতরটা গুরগুর ক'রে উঠল। চেয়ে দেখলুম, তাঁর দুই চক্ষু মুদিত, ধ্যানস্থ যোগীর মতন। শীর্ণ শিথিল দক্ষিণ হস্ত আকাশের দিকে উত্তোলিত—বার্ধক্যজনিত দুর্বলতায় কম্পমান। নিবন্ত সূর্যের শেষ রশ্মিটুকুতে সেই অলৌকিক ছবিখানা ঝক্‌ঝক্ করতে লাগল, তার পরে সব অন্ধকার।

কিছুক্ষণ ঐ ভাবে ধ্যানস্থ থেকে হাতখানা নামিয়ে নিয়ে নবাবসাহেব আমাদের বললেন, আল্লার কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা কর বেটা, আমি কে? আমি তাঁর একজন অধম বান্দা মাত্র।

অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে উঠতে দুজন লোক একটা তোলা-চেয়ার ও একজন একটা বড় আলো নিয়ে উপস্থিত হ'ল। নবাবসাহেব আসন ছেড়ে সেই জরির টুপিখানা মাথায় দিয়ে তোলা-চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, চল আমার ঘরে। স্থবির হয়ে পড়েছি, ঠাণ্ডা লেগে গেলে আবার সবাই বিরক্ত হবেন। সেইখানে ব'সে ধীরে-সুস্থে তোমাদের কথা শোনা যাবে। চলুন সৈয়দসাহেব।

আমরা সকলে একতলার একটা ঘরে এসে ঢুকলুম। চমৎকার ঘর, এর আগে এমন সুন্দর ঘর কখনও দেখি নি। ঘরখানা নীচু, মাঝখানে একটা বড় ঝাড় ঝুলছে। আমরা এতদিন সাদা ঝাড়-ই দেখেছি, এটা কিন্তু রঙিন ঝাড়, বোধ হয় কুড়ি-পঁচিশটা রঙ-বেরঙের গেলাসে মোমবাতি জ্বলছে। সিলিঙে কড়ি-বরগা কিছু নেই। সেখানে চমৎকার নক্‌শার মধ্যে লাল নীল হলদে সবুজ সোনালী চকচকে কাঁচ বসানো, তারই মধ্যে মধ্যে গোল, চৌকো, ছ'কোণা, আটকোণা, লম্বা আয়না বসানো। আগে কলকাতার সব শৌখিন পানওয়ালার দোকানের সামনে যেমন নানা রঙের ফাঁপা কাঁচের বল ঝোলানো থাকত, সেই-রকম নানা রঙের অসংখ্য ছোট-বড় গোলক সিলিং থেকে শিকল দিয়ে ঝোলানো রয়েছে। মাঝে মাঝে এক-একটা রঙিন কাপড়-মোড়া সুদৃশ্য পাখির খাঁচা ঝুলছে। ঘরের চারিদিকের দেওয়ালেও সেইরকম সব রঙিন কাঁচ ও আয়না বসানো। মেঝেতে সুন্দর নরম কার্পেট পাতা, মনে হয় যেন এইমাত্র কিনে এনে পাতা হয়েছে। এক কোণে একটা নেয়ারের খাটে সুন্দর বিছানা। খাটের এমন সুন্দর পায়া কখনও দেখি নি, যেন চারটে বেঁটে মুগুর ও তাতে লাট্টুর মাথার মতন চকচকে-রঙ-করা। দেখে মনে হতে লাগল, আমরা যেন আরব্য-উপন্যাসের একখানা ঘরের মধ্যে এসে পড়েছি।

ঘরের মেঝেতে পাতা সেই কার্পেটের ওপরেই সকলে বসলুম। একটু পরেই একজন চাকর এসে একটা লাঠির মাথায় বাঁকানো লোহা দিয়ে টপটপ ক'রে ঝাড়ের অর্ধেক বাতি নিবিয়ে দিয়ে চ'লে গেল।

এই ক'দিনের অত্যাচারে শরীর ও মন এমন অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, সেই ঠাণ্ডা আলো ও শান্ত পরিবেশের মধ্যে ব'সে থাকতে থাকতে কেমন যেন একটা নেশায় দেহমন ভ'রে আসতে লাগল। নবাবসাহেব আমাদের নামধাম জিজ্ঞাসা করলেন। বাড়িতে কে আছে, কেন বাড়ি থেকে বেরিয়েছি—সেই সনাতন প্রশ্ন। তার পরে সব চুপচাপ।

কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে হকিমসাহেব একবার হাই তুলে চোখ চেয়েই আমাদের বললেন, তোমাদের খুবই ক্লান্ত ব'লে মনে হচ্ছে, অসুখ-বিসুখ কিছু করে নি তো?

বললুম, আমাদের শরীর ও মনের ওপর দিয়ে এ'ক'দিন অমানুষিক অত্যাচার গিয়েছে, আমরা সত্যিই বড় ক্লান্ত।

হকিমসাহেব অনেকক্ষণ ধ'রে আমাদের দুজনের নাড়ী পরীক্ষা ক'রে মৃদুস্বরে নবাবসাহেবকে কি বলতেই তিনি চমকে উঠে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তো হিন্দু, আমাদের ঘরে খেলে তোমাদের তো জাত মারা যাবে। আজ না-হয় বাজারের কোনও হিন্দুর দোকান থেকে খাবার আনবার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে, কিন্তু রোজ বাজারের পুরি-মিঠাই খেলে তো অসুস্থ হয়ে পড়বে!

পরিতোষ এতক্ষণ দেওয়ালে হেলান দিয়ে একেবারে নিঝ্‌ঝুম হয়ে ব'সে ছিল, আহারের প্রসঙ্গ শুরু হতেই সে গা-ঝাড়া দিয়ে বললে, মালিক! যে-হিন্দুর জাত মারা যায়, আমরা সে-হিন্দু নই। আমরা আপনার এখানেই খাব, তবে আমাদের দেশের হিন্দুরা গরু-শুয়োর খায় না, সেগুলো আর আমাদের দেবেন না।

পরিতোষের কথা শুনে হকিমসাহেব, 'তোবা তোবা' ব'লে কানে হাত দিয়ে বিড়বিড় ক'রে কি-সব বলতে আরম্ভ করলেন। ইতিমধ্যে নবাবসাহেব অতি মিষ্টিসুরে পরিতোষকে বললেন, বেটা, তোমরা আমার ঘরে খাবে—এ আমার সৌভাগ্য। নিশ্চিন্ত থাক, মোটা গোশ্‌ত্‌ আমাদের বাড়িতে ঢোকে না; আর ওই যে জিনিসটির নাম করলে, ও-জিনিসটি পৃথিবীর কোনও মুসলমানের ঘরেই স্থান পায় না, ও আমাদের হারাম।

এতক্ষণে হকিমসাহেব চোখ খুলে আমাদের দিকে চেয়ে মুখভঙ্গী করলেন, অর্থাৎ, কেমন, হ'ল তো ?

সেখানে খেতে রাজী হওয়ায় দেখলুম, নবাবসাহেব আমাদের ওপর বেশ খুশিই হয়ে উঠলেন। তিনি বলতে লাগলেন, তোমরা আমার বাচ্চার শিক্ষক হ'লে, তোমরা এ-বাড়ির মাননীয় ব্যক্তি। আমি আর ক'দিন আছি! তোমরা ছাত্রকে সৎপরামর্শ দিও, আল্লা তোমাদের ভালো করবেন।

কিছুক্ষণ বিড়বিড় ক'রে ভগবানের নাম উচ্চারণ ক'রে আবার বললেন, লেখাপড়া শেখা ও শেখানো—দুই কঠিন কাজ, সকলের ভাগ্যে হয় না। পড়ার জন্যে ছাত্রকে কখনও মারধোর ক'রো না বেটা, এইটুকুই আমার অনুরোধ তোমাদের কাছে।

আমি বললুম, মালিক, এই মারধোরের জন্যেই আমার লেখাপড়া অগ্রসর হতে পারে নি। আপনি অনুরোধ করলেও ছাত্রকে মারা আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না।

কিছুক্ষণ আলাপচারীর পর হকিমসাহেব বিদায় নিলেন। তিনি চ'লে যাবার একটু পরেই নবাবসাহেব বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই খুবই ক্ষুধার্ত হয়েছ? যদিও আমি রাত্রি ন'টার আগে খাই না, তবুও আজ তোমাদের খাতিরে এখুনি খাবার দিতে বলি, কি বল ?

পরিতোষ বললে, মালিকের যথা অভিরুচি।

নবাবসাহেব অতি মৃদুস্বরে ডাক দিলেন, এই !

চাকর বোধ হয় উৎকর্ণ হয়ে দরজার ধারেই দাঁড়িয়ে ছিল। আওয়াজ হওয়ামাত্র সে ঘরের মধ্যে এসে বললে, হুজুর !

নবাবসাহেব তার দিকে না চেয়েই বললেন, দস্তরখান বিছাও।

লোক 'যো হুকুম' ব'লে বেরিয়ে গেল। তখনই দু-তিনজন লোক এসে সেই কার্পেটের একধারে একটা শতরঞ্চি ও তার ওপরে ধপধপে সাদা চাদর পেতে দিলে। ইতিমধ্যে আর এক ব্যক্তি একরাশ রঙিন চিনেমাটির ছোট-বড় প্লেট ও বাটি এনে চাদরের এক কোণে রেখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। নবাবসাহেব বললেন, খাবার সময় তোমাদের বাচ্চা অর্থাৎ ছাত্রকে ডেকে পাঠাই, একসঙ্গে খাওয়া যাক, কি বল ? তোমাদের আপত্তি নেই তো ?

বললুম, না না, আপত্তি কিসের ! ডাকুন তাকে, এখুনি আলাপ-পরিচয় হয়ে যাক।

নবাবসাহেব আবার মৃদুস্বরে ডাক দিলেন, এই !

হুজুর !—ব'লে তখুনি এক ব্যক্তি হাজির।

নবাবসাহেব অন্যদিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, পেয়ারে-সাহেবকে খবর দাও, তার যদি অসুবিধা না হয় তা হ'লে এখন আমার সঙ্গেই খানা নৌশ ফরমাবে।

চাকর 'যো হুকুম' ব'লে বেরিয়ে গেল। নবাবসাহেব আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন, কতদিন হ'ল বাড়ি থেকে বেরিয়েছ ? এতদিন কোথায় কাটিয়েছ ? কোন্ ইষ্টিশান থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছ ? আহা, বড় তক্‌লিফ হয়েছে তোমাদের, ইত্যাদি।

এতক্ষণে আমরা কিছু প্রকৃতিস্থ হয়েছিলুম। নবাবসাহেবকে প্রথমে দেখেই মনের মধ্যে সত্যভাষণের যে আবেগ এসেছিল, তা অনেকটা মন্দা পড়েছিল, তবুও ওরই মধ্যে যতদূর সম্ভব ভদ্রতা ও ইজ্জৎ বাঁচিয়ে তাঁর কথার জবাব দিতে লাগলুম। ওদিকে এক-একজন লোক চিনেমাটির বাসনে ঢাকা সব খাদ্যদ্রব্য এনে সামনে রেখে চ'লে যেতে লাগল। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে খবর দিলে, সাহেবজাদা গোসল ফরমাচ্ছেন।

সঙ্গে সঙ্গে নবাবসাহেব ব'লে উঠলেন, মাশে আল্লা, খোদা তার তন্ দুরস্ত্ রাখুন।

আবার প্রশ্ন শুরু হ'ল। রাত্রে একদিন নেকড়ে আক্রমণ করেছিল শুনে নবাবসাহেব একেবারে চমকে উঠলেন। তারপর সব বৃত্তান্ত শুনে বললেন, ওগুলো নেকড়ে নয়, ওগুলো হচ্ছে হুঁড়ার, মানুষ দেখলে ভাগে, ছোট ছোট অসহায় জানোয়ার ধ'রে খায়।

নেকড়ে-পালের কবল থেকে বেঁচে আসার দম্ভে আঘাত লাগায় কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণই হলুম।

ইতিমধ্যে আর-এক ব্যক্তি এসে আদালতের নকিবের মতন গড়গড় ক'রে ব'লে গেল—হুকুম শোনামাত্র সরকারের আদেশ তামিল করতে না পারার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য সাহেবজাদা ক্ষমা প্রার্থনা করছেন, তিনি অনতি-বিলম্বেই আপনার সম্মুখে এসে উপস্থিত হবেন।

যা হোক, আরও কিছুক্ষণ এইরকম গৌরচন্দ্রিকার পর ঘরের মধ্যে একজন এসে উপস্থিত হলেন। যিনি এলেন, মানুষের চেহারার মাপকাঠির হিসাবে তাঁকে সু-উচ্চ বলা চলতে পারে। অর্থাৎ নীচে ব'সে তাঁর মুখ দেখতে আমাদের

মাথার পেছনদিকটা প্রায় পিঠে ঠেকবার উপক্রম হ'ল। উচ্চতার অনুপাতে প্রস্থের দিকও বেশ মানানসই। চাপদাড়ির গোড়া ছুঁচলো ক'রে বেশ পরিপাটী-রূপে ছাঁটা, গোঁফও ছোট ক'রে ছাঁটা। গায়ের রঙ লালচে গৌর, চমৎকার টানা-টানা চোখ, দেখলেই মনে হয় যেন হাসছে; বয়স ত্রিশের কাছাকাছি ব'লেই মনে হ'ল।

এই ব্যক্তি হলেন আমাদের ছাত্র এবং একেই প্রহার না দেবার জন্য নবাব-সাহেব এতক্ষণ ধ'রে আমাদের মিনতি জানাচ্ছিলেন।

শিক্ষকের মূর্তি দেখে ছাত্রের পিলে-চমকানো ব্যাপারটাই ন্যায়শাস্ত্রসম্মত, কিন্তু আমাদের কর্মফলজনিত অদৃষ্টলিপির বিধানে বরাবর উল্‌টো ব্যবস্থাই দেখে আসছি। ছাত্রের মূর্তি দেখে তো পেটের মধ্যে কিরকম অস্বাভাবিক গুরগুরুনি শুরু হ'ল, অবিশ্যি সেটা ক্ষিধের চোটেও হতে পারে, ঠিক বলতে পারছি না। ক্ষিধের চোটে বাঘের ঘাস খাওয়ার কথাটা কাল্পনিক হ'লেও স্রেফ ক্ষিধের জ্বালায় আমরা সেই পালোয়ান যুবককে সেদিন ছাত্র ব'লে মেনে নিয়েছিলুম।

বৃদ্ধ আমাদের সঙ্গে ছাত্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন। কি-একটা দেডগজী নাম বললেন, তা তখুনি ভুলে গেলুম, তবে বাড়িসুদ্ধ সকলে তাকে 'পিয়ারা-সাহেব' ব'লে সম্বোধন করে।

কথাবার্তা শুরু হ'ল। পিয়ারা-সাহেব বললে, আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, আপনাদের মতন সজ্জন ও পণ্ডিতের শিষ্য হবার সৌভাগ্য মিলল।

বাঙালী জাতি ও তাদের নানা গুণের এত প্রশংসা সে করতে আরম্ভ করলে যে, তার পনেরো-আনা বুঝতে না পেরেও আমাদের লজ্জা করতে লাগল। মোট কথা, দেখলুম যে, বিনয়, সৌজন্য ও আপ্যায়নে পিয়ারা-সাহেব তার ঠাকুরদাদার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ছাত্রের চেহারা দেখে ভড়কে গিয়েছিলুম বটে, কিন্তু তার চালচলন ও কথাবার্তা শুনে তাকে ভালোই লাগতে লাগল। এও বুঝতে দেরি হ'ল না যে, তার সেই বৃহৎ চেহারার মধ্যে একটি শিশু লুকিয়ে আছে।

তার পরে আহারের পালা। আহা! আহা! কেমন ক'রে কোন্ ভাষায় সেই 'ব্রহ্মানন্দ সহোদরা'র বর্ণনা করব! কি রূপ তার, আর কি তার গন্ধ ও আস্বাদন! ভোজনবিলাসী সেই বুভুক্ষু বাঙালী বালকের মুখগহ্বরে সে-খাদ্য সেদিন যে রসোল্লাস সৃষ্টি করেছিল, সে-কথা স্মরণ হ'লে আজও রোমাঞ্চ

উপস্থিত হয়। সেই রাত্রেই মনে হয়েছিল যে, মুসলমানেরা রন্ধনকার্যে পটীয়ান। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এ-বিশ্বাস বেড়েই চলেছে, এবং বাংলাদেশে দেখ্‌ দেখ্‌ ক'রে মুসলমানের সংখ্যা এত বেড়ে গেল কি ক'রে তারও একটা হদিস লাগছে।

যা হোক, আহারপর্ব শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই পিয়ারা-সাহেব আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। চাকরেরা উদ্‌বৃত্ত খাদ্য, বাসনপত্র ও চাদর শতরঞ্চি সরিয়ে ফেলে সেইখানেই আমাদের বিছানা পেতে দিলে। চমৎকার বিছানা, পাতলা বালাপোশের মতন লেপ। বিছানা পেতে চাকর আমাদের জিজ্ঞাসা করলে, একখানা ক'রে লেপেই হবে, না, আর লাগবে?

একখানা ক'রে লেপেই আমাদের হবে শুনে তারা নবাবসাহেবের খাটের কাছে যেতেই তিনি হুকুম করলেন, আমার বিছানা জমিতেই ক'রে দাও।

চাকরেরা পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি ক'রে বিনাবাক্যব্যয়ে খাট থেকে বিছানা তুলে কার্পেটের ওপর পেতে দিয়ে চ'লে গেল।

নবাবসাহেব তাঁর বিছানায় গিয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে বললেন, এবার তোমরা আরাম কর।

তাঁর মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরুনো মাত্র পরিতোষ লম্বা হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

একটু পরে নবাবসাহেব গলা থেকে গোল-গোল, হলদে পাথরের একটা লম্বা মালা বের ক'রে জপতে আরম্ভ করলেন। বোধ হয় আধ ঘণ্টা পরে একজন চাকর এসে গোটাদুয়েক বাতি ছাড়া ঝাড়ের বাকি মোমবাতিগুলো নিবিয়ে দিয়ে চ'লে গেল।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, টের পাই নি। ঘুমও হয়েছিল বেশ গাঢ়। হঠাৎ শুনতে পেলুম, দূরে যেন কোথায় পেটা-ঘণ্টায় তিনটে বাজল। চোখ চেয়েই মনে হ'ল, এ আমি কোথায় শুয়ে আছি! ওপরে লাল নীল সবুজ সাদা রঙের আয়না দিয়ে বিচিত্র নক্‌শা-করা সিলিং, তা থেকে নানা রঙের কাপড়ে-মোড়া সুন্দর সুন্দর খাঁচা ঝুলছে। এ-পাশে ফিরে দেখি, নবাবসাহেব পশ্চিম দিকে মুখ ক'রে হাঁটু গেড়ে চোখ বুজে ব'সে সেইভাবে মালা জপ ক'রে চলেছেন, সবার ওপরে স্তিমিত আলোর স্নিগ্ধ বিভা। আমার মনে হতে লাগল, আমি যেন একটা মুঘল চিত্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছি, ছবিখানার মধ্যে আমিও যেন আঁকা হয়ে বিছানায় প'ড়ে আছি। বাকি রাতটুকু কখনও ঘুম কখনও-বা ঘুমঘোরে কাটতে লাগল, শুধু মধ্যে মধ্যে দূরে কে যেন ঘণ্টা পিটে চলতে লাগল, চারটে—পাঁচটা—

রূপের নেশায় একেবারে ভোম হয়ে গিয়েছিলুম, হঠাৎ ওপরের সেই পাখি-গুলো একসঙ্গে বিচিত্র সুরে ভোরের গান শুরু ক'রে দিলে। বনে-জঙ্গলে স্বাধীন পাখির প্রাণখোলা গান শোনার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে অনেকবার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে নবাবসাহেবের ঘরে পিঞ্জরাবদ্ধ পরাধীন পাখিরা আমাকে যে গান শুনিয়েছিল তা আজও ভুলি নি, তা ভোলবার নয়।

পাখির ডাক কিছুক্ষণ চলবার পর নবাবসাহেবের ধ্যানভঙ্গ হ'ল। তিনি মালাগাছা গলায় ঝুলিয়ে রেখে আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে পড়লেন। আমি উঠে বসতেই তিনি আমাকে সম্ভাষণ ক'রে যা বললেন, তার অর্থ—রাত্রিটা তোমার সুস্বপ্নে কেটেছে তো?

আমি বললুম, কিন্তু আপনাকে দেখলুম, সারারাত্রিই তো ঘুমোন না।

নবাবসাহেব বললেন, সারাজীবন তো ঘুমিয়েই কাটালুম।

নবাবসাহেব তাঁর সেই সুন্দর ভাষায় ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে আরম্ভ করলেন, আর আমি মধ্যে মধ্যে 'হাঁ, হুঁ, না, তা বইকি' ক'রে যেতে লাগলুম।

কিছুক্ষণ আলোচনা চলবার পর গত সন্ধ্যার সেই হকিমসাহেব এসে উপস্থিত হলেন। পরস্পর অভিবাদনান্তে হকিমসাহেব নবাবসাহেবের নাড়ী দেখতে আরম্ভ করলেন।

ওঃ, সে নাড়ী দেখা বটে, নবাবী নাড়ী কিনা!

হকিমসাহেব নাড়ী দেখতে শুরু করলেন, ইতিমধ্যে একজন লোক এসে বাতিগুলো নিবিয়ে দিয়ে গেল। পাখিগুলোর সেই মধুর কাকলী তীব্রতম ও ক্রমে কর্কশ শোনাতে লাগল। একজন চাকর এসে আমাদের হাত-মুখ ধুতে ডেকে নিয়ে গেল। ফিরে এসে দেখি, হকিমসাহেব তখনও নবাবসাহেবের ডান হাতের কব্জিতে টিপ কষছেন।

ইতিমধ্যে আর-একদল চাকর এসে ওপরকার সমস্ত খাঁচা নাবিয়ে পাখিদের হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে গেল, তখনও তিনি নবাবসাহেবের কব্জি টিপে চোখ বুজে ব'সে।

আমাদের জন্যে জলখাবার এসে হাজির হ'ল। আমরা খেতে খেতে দেখতে লাগলুম, হকিমসাহেব নবাবসাহেবকে চিত করে ফেলে অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে তাঁর মাথার কাছে গিয়ে বসলেন, তারপর আবার ডান হাতের কব্জি টিপে ধরলেন। তারপর কভু এ-পাশ কভু ও-পাশ, কভু চিত কভু উপুড় করতে করতে

শেষকালে তাঁকে বসিয়ে দিয়ে হকিমসাহেব হাসিমুখে ঘোষণা করলেন, তবিয়ৎ খুব অস্তু।

যাক, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচা গেল।

কিছুক্ষণ পরে, বোধ হয় নাড়ী দেখানোর পরিশ্রমের পর একটু দম নিয়ে নবাবসাহেব উঠে টুক্‌টুক্‌ ক'রে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন, আর হকিম-সাহেব আমাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে একজন লোক এসে আমাদের বললে, আপনাদের যদি অসুবিধা না হয়, তা হ'লে পিয়ারা-সাহেব সাক্ষাৎ চাইছেন।

তখুনি উঠে চললুম তার সঙ্গে। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলুম, পিয়ারা-সাহেব আছেন কোথায় ?

কবুতরখানায়।

কথাটা কানে যেতেই পরিতোষ বললে, কি বাবা, পায়রা ওড়াতে হবে নাকি ?

বললুম, দেখাই যাক-না কি হয় !

পরিতোষ বললে, কি জানি বাবা ! এক-এক জায়গায় তো দেখছি এক-এক রকমের রেওয়াজ। হয়তো এখানকার লোকে সকালবেলা মাস্টারদের ধ'রে পায়রা উড়িয়ে নেয়।

কথাবার্তা হতে হতে আমরা একটা সুদৃশ্য বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হলুম। চারদিকে খুব উঁচু দেওয়াল-ঘেরা একটা বাড়ি, ওপরে থাকে থাকে চারতলা ছাত, অনেকটা ফতেপুর-সিক্রির পঞ্চ্-মহলের মতন দেখতে।

কিন্তু বাড়ি অমন সুন্দর দেখতে হ'লে হবে কি ! বাপ রে বাপ, কি গন্ধ সেখানে ! পায়রা ও পায়রা-বিষ্ঠার দুর্গন্ধে সে-বাড়ির বিশ রশির মধ্যে এগোয় কার সাধ্য !

যা হোক, নাকে কাপড় ঠেসে তো বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়া গেল। দেশী ও বিদেশ থেকে আহৃত হাজার হাজার পায়রা সেখানে বংশানুক্রমে পালিত হয়ে আসছে, সে বোধ হয় দু-শো বিভিন্ন জাতের।

পায়রা দেখতে দেখতে আমরা সেই লোকটির সঙ্গে তিনতলার ছাতে গিয়ে উঠলুম, সেখানে পিয়ারা-সাহেব ও আরও অনেকগুলি লোক ব'সে ছিলেন। পিয়ারা-সাহেব আমাদের দেখে উঠে অভিবাদন ক'রে আসরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলেন। পিয়ারা-সাহেব বললেন, আপনাদের

অপেক্ষায় এতক্ষণ কবুতর ওড়ানো হয় নি। অনুমতি করেন তো আমরা আরম্ভ করি।

বললুম, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়।

আসরে একজন দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ছিলেন, এঁরা বংশপরম্পরা ধ'রে কপোত-কুলগুরুর কাজ ক'রে আসছেন। নবাবসাহেবদের বাড়িতেও তাঁদের দু-তিন পুরুষ হয়ে গেছে। এই আসরে পিয়ারা-সাহেবের পরেই তাঁর ইজ্জৎ।

আমার কথা শুনে পিয়ারা-সাহেব বৃদ্ধকে বললেন, বড়ে-মিয়া, শুরু কিজিয়ে।

আমাদের ছেলেবেলায় অধিকাংশ অভিভাবকই ছেলেদের পায়রা-পোষাটা পছন্দ করতেন না। এর কারণ হচ্ছে, পায়রার পেছনে দিনরাত এত লেগে থাকতে হয় যে, ছেলেরা লেখাপড়া করবার অবকাশই পায় না। প্রথমতঃ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পায়রাদের ওড়াবার পালা, তারপরে সারাদিন ধ'রে তাদের খেতে দেওয়া, স্নান ও পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা, সন্ধ্যে হতে-না-হতে প্রত্যেকটি পায়রা খোপস্থ হয়েছে কিনা তার তদারক করা, ঠিক নিজের নিজের জোড়া নিজের ঘরে ঢুকেছে কিনা তার তদন্ত করা। শুনেছি, মানুষ যেখানে বস্তিতে বাস করে, পায়রার খোপের মতন ঘেঁষাঘেঁষি ঘর হওয়ার জন্যে সে-স্থানে ব্যভিচারের মাত্রা খুবই বেশি। আসল পায়রা-সমাজের মধ্যে কিন্তু এ-নিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়। পাশাপাশি ঘরে বাস করলেও সন্ধ্যের ঝোঁকে এর লোক ওর ঘরে ঢুকে পড়লে সে-লোকের দুর্ভোগের আর অন্ত থাকে না। বাড়ির গিন্নী সারারাত তাকে চঞ্চু ও পক্ষ-তাড়নায় একেবারে নাজেহাল ক'রে ছাড়ে—এ-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ ও দৃষ্টি রাখা। তা ছাড়া বেড়াল, ভাম ইত্যাদি যাতে পায়রা ধ'রে না খেয়ে ফেলে, সে-বিষয়ে সতর্ক থাকা। তা ছাড়া আজ এর পায়রা ও ধ'রে নিয়েছে, এ নিয়ে ঝগড়া মারামারি খুনোখুনি। ওদিকে বহুবণ্ডপ্রসূ কপোতবধূর কল্যাণে একজোড়া পায়রা দেখ্‌ দেখ্‌ ক'রে পাঁচ জোড়ায় পরিণত হতে বেশি দেরি লাগে না। ছেলেরা তখন জোড়া-জোড়া পায়রা কেউ-বা কোঁচায় ঢেকে, আর যাদের বাড়িতে পুরুষ অভিভাবকের বালাই নেই অথবা থেকেও ছেলেরা শাসনমুক্ত, তারা অভিভাবকদের সামনে দিয়েই খাঁচায় ভ'রে পায়রা নিয়ে যেত সপ্তাহে দু'বার ক'রে বৈঠকখানার হাটে বিক্রি করতে। এইভাবে দিনরাত পায়রা-চর্চা করতে করতে তারা পাড়ার ও অন্যান্য ছেলেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। আমাদের সময়ে 'পায়রা-পোষা' ছেলেদের হালচালই ছিল এক রকমের।

পায়রা-পোষার অভ্যেস না থাকলেও সকালবেলা ছাতে ওঠবার অবকাশ ঘটলেই দেখতুম, আকাশে ছোট-বড় ঝাঁকের পায়রা গোল হয়ে উড়ছে এখানে-সেখানে, মধ্যে মধ্যে এক-একটা পায়রা দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে মনের সাধে শূন্যে উপরি-উপরি গোটাকয়েক ডিগবাজি কিংবা উল্‌টোবাজি খেয়ে আবার নিজের দলে ঢুকে প'ড়ে উড়তে আরম্ভ করছে। দৃশ্যটা ভালোই লাগত। কিন্তু কলকাতায় যাই দেখে থাকি না কেন, এখানে এদের পায়রা-ওড়ানো দেখে জীবনে সত্যিই একটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলুম, যা অন্তত কলকাতার লোকের কাছে দুর্লভ।

পিয়ারা-সাহেবের হুকুম পাওয়ামাত্র বড়ে-মিয়া দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম ক'রে মুখের মধ্যে একটা আঙুল পুরে দিয়ে লম্বা একটা শিস দিলেন। বলা বাহুল্য, ওড়বার পায়রাগুলো যে কোথায় আছে, তা আমরা দেখতে পাই নি।

বড়ে-মিয়ার শিস শেষ হবার বোধ হয় মিনিটখানেক পরে মাথার ওপরে পায়রা-ওড়ার ফড়ফড় শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। তার একটু পরেই দেখা গেল, বিরাট একঝাঁক ঝকঝকে সাদা পায়রা ছাতার মতন গোল হয়ে আকাশে উড়তে আরম্ভ করেছে, বুঝলুম, মাথার ওপরকার ছাতেই পায়রার দল ব'সে আছে ইঙ্গিতের অপেক্ষায়।

কিছুক্ষণ দেখবার পর লক্ষ্য করলুম, ঝাঁকের ঠিক মাঝখানে টিপের মতো চকচকে কালো একটা পায়রা উড়ছে। একটু পরেই বড়ে-মিয়া উপরি-উপরি দুটো টানা শিস কাটলেন, আর উড়ল একঝাঁক কুচকুচে কালো পায়রা, তার মধ্যিখানে ধবধবে সাদা একটা। তার পরে বড়ে-মিয়ার এক নতুন রকমের শিসে একঝাঁক সাদা পায়রা উড়ল, যাদের ল্যাজ লাল-রঙ-করা; আর একরকম শিসে আর এক দল সাদা পায়রা উড়ল, যাদের ল্যাজগুলো কালো-রঙ-করা। চার দল পায়রা আকাশ জুড়ে গোল হয়ে কখনও ওপরে কখনও নীচে উড়তে লাগল।

এর পর শুরু হ'ল আসল খেলা। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। হঠাৎ বড়ে-মিয়া কিরকম উত্তেজিত হয়ে মুখের মধ্যে দুই হাতের আঙুল ঠেসে একরকমের শিস দিলেন, আর দেখতে দেখতে চারঝাঁক পায়রা, যারা এতক্ষণ আলাদা আলাদা উড়ছিল, তারা মিলে গিয়ে একসঙ্গে উড়তে লাগল। তার পরে আর এক ধরনের শিস, আবার যার যার দল আলাদা হয়ে গেল।

বড়ে-মিয়ার শিসের বিরাম নেই। আর এক শিসে সাদা পায়রার দল ভেঙে লাইনবন্দী হয়ে একটার পর একটা লম্বা হয়ে উড়ে ক্রমে লাইনের দুই মুখ জুড়ে বিরাট একটা পদ্মের মালার মতন হয়ে গেল, দেখতে দেখতে সেই মালার মাঝখানের শূন্য জায়গায় এসে ঢুকল কালো পায়রার দল, মনে হতে লাগল, যেন সাদা ফ্রেমে বাঁধানো একদল কালো পায়রার ছবি দেখছি। দু-দল বিপরীত মুখে উড়তে থাকায় চোখে কিরকম ধাঁধা লেগে যায়, বেশিক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকা যায় না।

এইরকম প্রায় দেড় কি দু-ঘণ্টা কসরত দেখানোর পর বড়ে-মিয়ার এক শিসে পায়রাদের ব্যায়াম বন্ধ হ'ল, তারা ছাতের ওপরে এসে বসল। ধন্য পায়রার দল, আর ধন্য বড়ে-মিয়ার শিক্ষা ও তার শিস দেবার কায়দা! আমাদের মনে হ'ল, হ্যাঁ, দেখলুম বটে একটা জিনিস!

আমরা যখন অবাক হয়ে পায়রা-ওড়ানো দেখছিলুম, তারই মধ্যে মধ্যে পিয়ারা-সাহেব আমাদের জিজ্ঞাসা করতে লাগল, আচ্ছা, কবুতরকে ইংরিজীতে কি বলে, বাংলায় কি বলে? এইভাবে চোখ, চঞ্চু, ডানা ইত্যাদি কথার ইংরিজী ও বাংলা শিখে নিতে লাগল। এই অভিনব উপায়ে উভয় পক্ষেরই শিক্ষা শুরু হ'ল আমাদের নতুন কর্মক্ষেত্রে।

দ্বিপ্রহরে আহারের সময় আর পিয়ারা-সাহেবের দেখা পেলুম না। খেতে খেতে নবাবসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, এ-ঘরে থাকতে তোমাদের যদি অসুবিধা হয় তো বল, অন্য ঘরের ব্যবস্থা ক'রে দিই।

বললুম, এ-ঘরে থাকতে আমাদের কোনও অসুবিধাই নেই, তবে আপনার যদি কিছু অসুবিধা হয়, তা হ'লে যা অভিরুচি তাই করুন।

আমরা নবাবসাহেবের ঘরেই থেকে গেলুম।

সেদিন বিকেলবেলা, তখনও রোদ বেশ চড়চড়ে আছে, পিয়ারা-সাহেব আমাদের ডেকে পাঠালেন। চাকরের সঙ্গে আমরা প্রাসাদের হুদোর মধ্যেই একটা বড় উঁচু-নীচু ছাতে গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে দেখি, আট-দশটা লোক ছাতের হেথা-হোথা ব'সে দাঁড়িয়ে ইয়া-ইয়া বোম-লাটাইয়ে ঘুড়ি উড়োচ্ছে, আকাশে রঙের বাহার লেগে গেছে।

আমাদের দুজনেরই ঘুড়ি ওড়াবার শখ ছিল। ওই প্রকাণ্ড ছাত আর সেখানে ঘুড়ি উড়ছে দেখে মনটা ভারি প্রফুল্ল হয়ে উঠল। পিয়ারা-সাহেব আমাকে ডেকে তার লাটাইটা এগিয়ে দিলে, ইয়া বোমা-লাটাই, আর সে কি

ভারি রে বাবা! একটু নাড়াচাড়া ক'রেই আবার যার গদা তার হাতে ফিরিয়ে দিলুম।

যা হোক, সকালবেলার মতন না হ'লেও এ-বেলাতেও আশ্চর্য কিছু কম হই নি। ঘুড়ি-ওড়ানোর মধ্যেও এত কারিগরি আছে, এর আগে তা দেখা তো দূরের কথা, শুনিইনি। সেখানে একজন লোক ছিল, যাকে একসঙ্গে দশজন মিলে আক্রমণ করলেও—অবিশ্যি ঘুড়ি-সুতো দিয়ে, সে অন্য কারুর ঘুড়ির সুতোয় নিজের ঘুড়ির সুতো না ঠেকিয়ে নিরাপদে বার ক'রে নিয়ে আসতে পারত। আর আক্রমণ করবারই সে কত রকমের কায়দা—কখনও বা একসঙ্গে, কখনও বা এখানে একটা, ওখানে একটা, সেখানে একটা, প্রত্যেকেই নিরপেক্ষ উদাসীন ভাবে যেন উড়তে-হয়-তাই-উড়ছি গোছের—এমন সময় হঠাৎ একটা ঘুড়ি ছুটে তাকে আক্রমণ করতে গেল, তাকে কাটিয়ে বেরুনো মাত্র ঠিক আর দুটোর সামনে, কিন্তু আক্রমণের সমস্ত কায়দা ব্যর্থ ক'রে প্রতিবারই সে-ব্যক্তি নিজের ঘুড়িকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে লাগল।

আর একটা লোক ওইখানেই আর একরকমের ঘুড়ির খেলা দেখিয়েছিল, সে-ছবিটা মনে পড়লে আজও হাসি পায়। পূর্বোক্ত ব্যক্তি যেমন পলায়নের ওস্তাদ ছিল, এ ছিল তেমনই প্যাঁচ ভণ্ডুল ক'রে দেবার ওস্তাদ। এর সঙ্গে প্যাঁচ খেলতে গেলেই সে অপর ব্যক্তির সুতোয় নিজের সুতো দিয়ে এমন একটা ফাঁস লাগিয়ে দিত যে, কারুর ঘুড়িই কাটত না, অবশেষে টানামানি হওয়া ছিল অনিবার্য, টানামানির দৃশ্যটা ছিল ভারি কৌতুকপ্রদ, এবং প্রতিবারই সে অন্য পক্ষের ঘুড়ি ছিঁড়ে আনতে পারত।

সাধারণের কাছে এই পায়রা ঘুড়ি প্রভৃতি ওড়ার প্রসঙ্গ তেমন ভালো লাগবে না জানি; কিন্তু এটুকু হচ্ছে তাঁদেরই জন্যে, যাঁরা একদা উড়েছেন, যাঁরা এখনও উড়ছেন এবং একদা যাঁরা উড়বেন।

এইখানে এই ছাতে আমাদের মাস্টারী জীবনের প্রথম দিনের আর একটি মজার অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। ঘুড়ি-ওড়ার সঙ্গে ছাত্রের তালিমও চলেছে। হঠাৎ পিয়ারা-সাহেব জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, পতংগ্‌কে ইংরেজী বাংলায় কি বলে?

প্রশ্ন শুনে বেশ বিব্রত হয়ে পড়লুম—পতঙ্গের ইংরেজী কি? মনে হ'তে লাগল, Insect মানে তো কীট। কিন্তু কীট ও পতঙ্গে যে অনেক তফাত! কি বলব ভাবছি, বেশ একটু দেরি হচ্ছে, এমন সময় ছাত্রই বাঁচিয়ে দিলে। সে বললে, আচ্ছা, নীল পতংগ্‌কে ইংরিজীতে কি বলবে?

আর ভাবতে হ'ল না। বুঝতে পারা গেল, পতংগ্ মানে ঘুড়ি।

আমাদের আবার নতুন ক'রে জীবনযাত্রা শুরু হ'ল। দিদিমণির ওখানে আমরা একেবারে ঘরের লোক হয়ে গিয়েছিলুম। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি হাজার কাজের ভার আমাদের ওপরে চাপানো ছিল। সমস্ত কাজ শেষ ক'রে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বিশুদার ঘরে আমি, পরিতোষ, দিদিমণি, বিশুদা ও আহিয়া মিলে ভারি মিষ্টি একটা আড্ডা জমাতুম। এখানে প্রতি সন্ধ্যায় সেই স্মৃতির পীড়ন চলতে লাগল আমার মনের ওপর দিয়ে মর্মান্তিকভাবে। এখানে খাওয়া-দাওয়া, থাকা-শোওয়া ওখানকার চেয়ে অনেক ভালো, কিন্তু সেই পাতা-ঝরা গাছের শ্রেণী, সেই সারাদিন ধ'রে শোঁ-শোঁ হাওয়ার হুঙ্কার, মৃত্যুপথযাত্রী বিশুদার হাসিভরা মুখ ও রসিকতা, সবার ওপরে কল্যাণময়ী দিদিমণি, কোথায় পাব এখানে!

সে-জগতে ছিল নারীমূর্তি দুর্লভ। ব্রহ্মচারীদের আশ্রম হ'লেও না-হয় কথা ছিল। কিন্তু নবাবসাহেবের ঘর ছাড়া বাড়ির এখানে সেখানে, বিশেষ ক'রে পিয়ারা-সাহেবের বৈঠকখানায় বড় বড় নগ্ন ও অর্ধনগ্ন নারীর তৈলচিত্র টাঙানো। পিয়ারা-সাহেবের সান্ধ্য আসরে বিস্তর লোক যাওয়া-আসা করে। তার মধ্যে জনকয়েক খুবই বকে, কেউ কেউ বেশি কথা বলে না, কেউ কেউ একেবারে চুপ ক'রে ব'সে থাকে, আসা-যাওয়ার সম্ভাষণটুকু বাদে তাদের মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, নারীর প্রসঙ্গ উঠলে আর রক্ষে নেই, সবাই একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

অথচ নারীর মূর্তি সেখানে দেখাই যায় না। মেয়েদের থাকবার মহল, সে যে কোথায় তা জানি না। সেখানে পিয়ারা-সাহেব, নবাবসাহেব ও হকিম ছাড়া অন্য কোন পুরুষের প্রবেশের অধিকার নেই। সে-মহলে নবাব-বাড়ির অনেক মহিলা ও নিরাশ্রয়া আত্মীয়া বাস করেন। একপাল দাসী আছে সেখানে, কিন্তু সকলের হারেম ছেড়ে বাইরে যাবার হুকুম নেই—

দিনকতক যেতে-না-যেতেই এই নারীহীন রাজ্যে নিজেকে বড়ই নিঃসঙ্গ ব'লে মনে হতে লাগল। পরিতোষকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি রে, কেমন লাগছে এখানে?

সে বেশ খুশী মনেই বললে, বেড়ে লাগছে!

রাণুমার সঙ্গে পরিচয় হবার পরদিন সকালে ইস্টিশান থেকে বেরুবার সময়

সেই যে স্নান করেছিলুম, তার পরে মাথায় আর জল ঠেকানো হয় নি। অবিশ্যি এখানে আসার পরের দিন সকালেই খাবার আগে চাকর এসে বলেছিল, চলুন, স্নান করবেন।

স্নান করব না—শুনে সে জানিয়েছিল যে, গরম জলের যদি প্রয়োজন হয় তাও আছে। আমরা 'আজকে নয়' ব'লে চাকরকে বিদায় দিলেও প্রতিদিনই 'আজকে নয়' চলতে লাগল। শীতকাতর হ'লেও আমাদের প্রতিদিন স্নান করার অভ্যেস ছিল। শীতকালেও একদিনের জন্য স্নান বাদ দিলে শরীর রুক্ষ হয়ে উঠত। তথাপি স্নানের প্রতি এমত বিরাগের কারণ হচ্ছে—আমাদের বস্ত্র-হীনতা। ধুতি ও জামা অত্যন্ত মলিন ও এমনভাবে ছিন্ন হয়েছিল যে, সদাসর্বদাই সর্বাঙ্গে র‍্যাপার জড়িয়ে থাকতে হ'ত। উত্তরার্ধের সৌজন্য রক্ষা করতে গিয়ে অপরার্ধের শ্লীলতা বাঁচাবার জন্যে তখুনি থেবড়ে ব'সে পড়তে হ'ত। কিছুদিন এইরকম চললে উভয়কে অচিরেই যে নগ্নানন্দ ও দিগম্বরানন্দ মহারাজ হয়ে বদরিনারায়ণাভিমুখে প্রয়াণ করতে হবে, সে-বিষয়ে ক্রমেই নিঃসন্দেহ হয়ে উঠছিলুম। এমন সময় দেবতা একটু নেকনজর করলেন।

চাকরেরা রোজই আসে স্নানের কথা বলতে, আর আমরা বলি 'আজ নয়', চাকরেরা চ'লে যায়। সেদিন দ্বিপ্রহরে কবুতরখানা থেকে ফিরে নবাবসাহেবের সঙ্গে আমরা গল্প করছি, এমন সময় চাকর এসে জিজ্ঞাসা করলে, হুজুর, স্নান করবেন ?

না।—বলতেই নবাবসাহেব বললেন, কেন, স্নান করবে না কেন ?

তার পরে চাকরকে হুকুম দিলেন, এঁদের নিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে তেল মালিশ ক'রে গরম জলে স্নান করিয়ে দাও।

আর আপত্তি করা চলে না, উঠতেই হ'ল। গোসলখানার সামনে দুজন লোক তেল মাখাবার উপক্রম করতেই আমরা দুজনে একসঙ্গে স্নানের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলুম,—যদিও বেশ ভালো-ক'রেই জানা ছিল যে দুজন ভদ্রব্যক্তি একসঙ্গে এক ঘরে স্নান করতে ঢোকাটা এখানকার চাকরদের চোখেও বিসদৃশ ঠেকবে। কিন্তু সদৃশ-বিজ্ঞানের সব ফর্‌মুলা মেনে চলবার মতন অবস্থা আমাদের ছিল না।

যা হোক, সেই ছেঁড়া ধুতি প'রে স্নান ক'রে র‍্যাপারকে লুঙ্গি ক'রে পরা গেল। আমার র‍্যাপারখানার রঙ ছিল গ্যাডগ্যাডে সবুজ জমির ওপরে লাল সরু চেক, আর পরিতোষের র‍্যাপারখানার ছিল ছাই রঙের জমি ও তার ওপরে চওড়া কালো চেক।

ঘরের মধ্যে একটা বড় আয়না ছিল, যাতে আপাদমস্তক প্রতিফলিত হয়। লুঙ্গি প'রে গায়ে সেই ছেঁড়া টুইলশার্ট চড়িয়ে, আস্তিন গুটিয়ে, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল, বহু কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে এতদিনে সত্যিই আমার আমিত্ব লোপ পেয়েছে, সেই মোহনমূর্তি দেখে হাস্যসংবরণ করা দুরূহ হয়ে দাঁড়াল। পরিতোষ বললে, তোকে ঠিক গ্যাঁটকাটার মতন দেখাচ্ছে।

আমি বললুম, তোকে দেখাচ্ছে ঠিক গরুচোরের মতন।

ঘরের মধ্যকার সেই ঝাপসা আলোয় পরিতোষ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিজেকে দেখতে লাগল সেই আয়নায়। তার পরে হঠাৎ ফিরে আমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে, ঠিক বলেছিস তুই। আমাদের দুজনের চোখেই কিরকম একটা চোর-চোর ভাব এসেছে, দেখেছিস ?

হবে না ! সেদিন যা চোরের মার খাওয়া গেছে !

নিজেরাই শুকোতে দেব মনে ক'রে ছেঁড়া কাপড় দুখানা নিংড়ে হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। ঘরের বাইরেই একপাল চাকর দাঁড়িয়ে ছিল, তারা আমাদের সেই মনোহর সজ্জা দেখে প্রথমটা গেল অবাক হয়ে, তার পরে হাসি চাপবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল।

আমরা সেদিকে গ্রাহ্য না ক'রে কয়েক কদম এগিয়ে যেতেই একজন চাকর ছুটে এসে আমাদের হাত থেকে ধুতিখানা একরকম কেড়ে নিয়ে একদিকে চ'লে গেল।

সত্যি কথা বলতে কি, ধুতি বেহাত হওয়াতে দস্তুরমতন শঙ্কিতই হয়ে পড়লুম। কারণ ব্যবহারের অযোগ্য মনে ক'রে সেগুলো যদি তারা আর ফিরিয়ে না দেয়, তা হ'লে তো গেছি আর কি !

যুগলমূর্তি সেই চমকপ্রদ বেশে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই নবাবসাহেব অবাক হয়ে খোলা চোখে আমাদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন, তার পরে আড়চোখে দেখতে লাগলেন। লজ্জায় মনে হতে লাগল, স্নানের ঘর থেকেই হিমালয়ের দিকে রওনা হ'লেই হ'ত ভালো। এমন সময় খাবার এসে পড়ায় সামলে গেলুম।

ইদানীং দুপুরবেলার ভোজনপর্বের পর আমরা পিয়ারা-সাহেবের ঘরে গিয়ে আড্ডা জমাতুম। সেখানে বিড়ি-সিগারেটও বেশ উড়ত, আর আমরাও খুব বকতুম,—সহনশীল শ্রোতার অভাব ছিল না। সেদিন আড্ডায় ব'সে বেশ জমাট ক'রে কলকাতার গল্প শুরু করেছি, এমন সময় ঘরের মধ্যে দুটো লোক

এসে দাঁড়াল, একজনের কাঁধে গোটাকয়েক রঙিন ও সাদা কাপড়ের থান আর একজনের গলায় ঝোলানো গজ-ফিতে।

তারা পিয়ারা-সাহেবকে সেলাম ক'রে দাঁড়াতেই সে আমাদের বললে, আপনাদের জামার মাপ নিতে এসেছে।

শুনে প্রথমটা আশ্চর্যই লাগল। উঠতে কিন্তু-কিন্তু করছি দেখে আসরের এক বৃদ্ধ বললেন, যান যান, মাপটা দিয়ে এসে গল্প করবেন 'খন।

দরজী আমাদের দুজনের মাপ নিয়ে কাপড় পছন্দ করতে বললে। দু-তিন রকমের ছিট পছন্দ ক'রে দিতে দরজী কুর্নিশ ক'রে চ'লে গেল। পিয়ারা-সাহেবের ঘর থেকে ফিরে গিয়ে দেখি, সেখানে আমাদের জন্যে ধোয়া কোরা ধুতি ও শাড়িতে মিলিয়ে বারোখানি অপেক্ষা করছে।

সেই দিনই সন্ধ্যার একটু পরে দরজী এসে ছ'টা জামা দিয়ে গেল আর বলল, বাকি ছ'টা কাল এমন সময় এসে দিয়ে যাব।

হঠাৎ এতগুলো জামা কাপড় পেয়ে, ভিক্ষার সামগ্রী হ'লেও, খুবই খুশি হওয়া গেল।

রাত্রে আহারাদির পর আমাদের পয়মন্ত র‍্যাপার ছেড়ে নতুন ধুতি ও সেই রঙিন না-শার্ট না-পাঞ্জাবি না-পিরান জামা চড়িয়ে শুয়ে পড়লুম।

পরের দিন পিয়ারা-সাহেব আমাদের আলাদা ডেকে দুজনকে পাঁচটা ক'রে টাকা দিয়ে বললে, খরচ করুন, যখন যে জিনিসের দরকার পড়বে, আমি আপনাদের খাদিম রয়েছি আমাকে জানাবেন।

এর পরদিনই পিয়ারা-সাহেবের কাছ থেকে দোয়াত, কলম, চিঠি লেখবার কাগজ ও খাম চেয়ে নিয়ে দুজনে আলাদা আলাদা ক'রে দিদিমণিকে দুখানা দীর্ঘ পত্র লেখা গেল। তাতে বড়কর্তার কথা, টাকা কেড়ে নেওয়া, প্রহার ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত তন্নতন্ন ক'রে লিখে দিলুম। দুজনেই এ-কথা লিখে দিলুম যে, পত্রপাঠ মাত্র টাকা পাঠিয়ে দেবে, টাকা পেলেই আমরা ফিরে যাব।

সময়টা যে কি ভীষণ উৎকণ্ঠায় কাটতে লাগল, তা বোধ হয় আর লিখতে হবে না।

চিঠির জবাব আসবার সময় উতরে যাওয়ার দু-তিন দিন পরে একদিন পিয়ারা-সাহেবকে জিজ্ঞাসাই ক'রে ফেললুম, আচ্ছা, সেদিন চিঠিটা ঠিক ডাকে দেওয়া হয়েছিল তো?

পিয়ারা-সাহেব চমকে উঠে বললে, সে কি! তা কখনও হতে পারে! আচ্ছা, আমি এখ্‌খুনি তাকে ডাকাচ্ছি।

তখুনি সে-ব্যক্তির তলব পড়ল। সে বললে, হুজুরের হুকুম পাওয়া মাত্র আমি নিজে ডাকখানায় গিয়ে দু-পয়সার টিকিট লাগিয়ে বাক্সে ফেলে এসেছি।

কি আর করা যাবে! আবার চিঠি লেখবার সরঞ্জাম চেয়ে নিয়ে দিদি-মণিকে দীর্ঘতর এক পত্র লেখা গেল। সেদিনকার চিঠিতে যা গিয়েছিল তা তো লিখলুমই, তা ছাড়া আরও অনেক কথা লেখা হ'ল। পিয়ারা-সাহেব চিঠিখানা হাতে নিয়ে বললে, এটা তা হ'লে রেজেস্টারি ক'রে পাঠানো যাক, কি বলেন?

বললুম, তা হ'লে তো ভালোই হয়।

তখুনি সেই লোকটাকে ডেকে পিয়ারা-সাহেব জিজ্ঞাসা করলে, চিঠি রেজিস্টারি করতে পার?

লোকটার উজবুগের মতন চাউনি দেখে মনে হ'ল যে, সে পারবে না।

পরিতোষ বললে, ডাকঘরটা আমাদের দেখিয়ে দাও, আমরাই রেজেস্টারি ক'রে দেব 'খন।

আমাদের উঠতে দেখে পিয়ারা-সাহেব বললে, আচ্ছা, আমার একটা পরামর্শ শোনেন তো বলি। এ চিঠিখানা এমনি যাক, এর যদি জবাব না আসে, তখন রেজেস্টারি করা যাবে।

সভাস্থ একজন রসিকতা ক'রে বললে, সে-চিঠিরও যদি জবাব না আসে?

পিয়ারা-সাহেব তখুনি হেসে উত্তর দিলে, তা হ'লে 'পিরিপেট' তার করা হবে, উত্তর না দিয়ে আর উপায় থাকবে না।

কথাটা উচ্চারিত হওয়া মাত্র সভায় প্রশংসার উচ্চরোল উঠল। সভাস্থ সকলে উচ্ছ্বসিত হয়ে সাহেবজাদার বুদ্ধির তারিফ করতে লাগল। সেই তারিফের তুফান উপেক্ষা ক'রে লোকটা আমাদের চিঠিখানি হাতে নিয়ে ছুটল ডাকঘরের উদ্দেশে।

কিন্তু হায়! সেখানারও উত্তর পাবার দিন পেরিয়ে গেল, তবু দিদিমণির কোনও খবর পেলুম না। আমরা ঠিক করলুম, আর সেখানে চিঠি লিখব না। কিন্তু পিয়ারা-সাহেব একদিন নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা ক'রে, জবাব পাই নি শুনে বললে, দ'মে যাবেন না, এখনও দু-দুটো অস্ত্র আমাদের হাতে আছে। আপনারা আবার লিখুন।

এবারে শুধু পরিতোষ লিখলে, দিদিমণিকে একখানা ও বিশুদাকে একখানা, আমি আর লিখলুম না। কি জানি কেন, আমার মনের মধ্যে কয়েকদিন থেকেই কে যেন নিরন্তর ব'লে চলেছিল, রাজকুমারীর মতন দিদিমণির অধ্যায়ও শেষ হয়ে গেল। একটা ব্যথা-ভরা ঔদাস্তের পীড়নে নিষ্পেষিত হ'তে লাগলুম।

এবারেও নির্দিষ্ট দিন অতীত হয়ে যাবার পর চিঠি এল না বটে, কিন্তু রেজিস্টারি চিঠির রসিদ ফিরে এল—মনোরমা দেবীর বদলে সই ক'রে নিয়েছেন অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

আর বাক্য-বিনিময়ের অবকাশ রইল না। উভয়েই মর্মে মর্মে বুঝতে পারলুম, দিদিমণির সঙ্গে চিরদিনের জন্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

দিদিমণির সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের কথাটা আজ যত সহজে লিখে ফেলতে পারলুম, সেদিন কিন্তু তত সহজে সে-আঘাতকে স্বীকার করতে পারি নি। সৃষ্টিকর্তা আমার হৃদয়যন্ত্রটিকে ঘাতসহ ক'রে তোলবার জন্যে তখন থেকেই যে বনেদ গাঁথতে শুরু করেছিলেন, সে-কথা কল্পনাও করতে পারি নি।

এতদিনে আমাদের এই নতুন কর্মক্ষেত্রকে অন্তরের সঙ্গে মেনে নেবার জন্যে মনের মধ্যে নতুন ক'রে লড়াই শুরু হ'ল। এখানে আমাদের কোন কষ্টই নেই। এত খাতির যত্ন আদর, এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চোখের সামনে থাকলেও মানস-লোকে জ্বলজ্বল করত দিদিমণি ও তাদের সংসার। কামলোকে নিয়ত গুঞ্জরিত হ'ত একই তান—কবে সেখানে ফিরে যাব, কবে আবার জীবনের সেই সুখের দিনগুলি শুরু হবে, যে জীবনযাত্রায় অল্পদিন হ'লেও আমরা একান্তই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম, নিষ্ঠুর বিধাতা চোরের মার মেরে যে অভ্যেস ছুটিয়ে দিলেন।

রেজেস্টারি চিঠির রসিদে শ্রীমান বড়ে-ভাইয়ের দস্তখত দেখে নিমেষে আমাদের আশার প্রাসাদ ভূমিসাৎ হয়ে গেল। এখানে সেখানে ঘুরি, আমোদ আহ্লাদ ও আড্ডায় যোগ দিই; কিন্তু কোথায় যেন একটা অস্বস্তির খোঁচা স্মরণে বাজে, কিছুই ভালো লাগে না।

আমাদের হালচাল দেখে একদিন পিয়ারা-সাহেব জিজ্ঞাসা করলে, ক'দিন থেকেই লক্ষ্য করছি আপনারা দুজনেই মনমরা হয়ে আছেন, কোন কারণে আমাদের ওপর নারাজ হয়েছেন নাকি?

বললুম, আপনাদের ওপর নারাজ হব—এত বড় অকৃতজ্ঞ আমাদের মনে করবেন না। এখানে আমরা খুবই সুখে আছি।

পিয়ারা-সাহেব আবার বললে, কিন্তু মাপ করবেন, আপনাদের চেহারা

দেখে আমার মনে হচ্ছে, নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে। আমি আপনাদের অধম ছাত্র, আমার দ্বারা যদি কিছু হয় তো বলুন।

পিয়ারা-সাহেবের কথা শুনে পরিতোষ কি-একটা বলতে উদ্যত হয়ে থেমে গেল। ফিরে দেখলুম, তার চোখে মেঘ থমথম করছে। তার হালচাল দেখে থমকে গিয়ে পিয়ারা-সাহেব কিছুক্ষণের জন্যে চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, যেখানে তিন-তিনখানা চিঠি লিখলেন, সেখান থেকে কোনও উত্তর এসেছে কি?

পরিতোষের অশ্রু তখন গলায় ঠেকেছে। সে কি-একটা বললে, কিন্তু গলা দিয়ে স্পষ্ট বেরুল না। তার অবস্থা দেখে আমিই বললুম, উত্তর আসে নি বটে, কিন্তু সেখান থেকে আর কখনও যে উত্তর আসবে না তার সঙ্কেত এসেছে।

আমার কথাটা ভালো বুঝতে না পেরে পিয়ারা-সাহেব জিজ্ঞাসা করলে, কি এসেছে?

এবার তাকে সমস্ত কথা খুলে বলা গেল। কিরকম ক'রে আমরা দিদিমণিদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলুম, কেমন ক'রে ক্রমে আমাদের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় হয়ে উঠেছিল; বড়কর্তার প্রথম দিনের ব্যবহার, দিদিমণির আশ্বাস ও বড়কর্তাকে বাড়ি থেকে দূর ক'রে দেওয়া; তার পর কাশীতে সেই অমানুষিক অত্যাচার, সবার ওপরে দিদিমণির চিঠিগুলো গাপ করা। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধ'রে দিদিমণিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ইতিহাস তন্ন তন্ন ক'রে তাকে খুলে বললুম। আমাদের কথা শুনতে শুনতে পিয়ারা-সাহেবের স্বভাব-রক্ত বর্ণ আরও লাল হয়ে উঠতে আরম্ভ করল।

কাহিনী শেষ ক'রে চুপ করলুম। পিয়ারা-সাহেবও কিছুক্ষণ কোনও কথা বললে না। সে সেইরকম লাল মুখ নিয়ে নীচের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতে লাগল গভীরভাবে। তার এ-মূর্তি এর আগে কখনও দেখি নি। সদাসর্বদাই তার মুখখানা ঘিরে ভারি একটা মিষ্টি হাসি জ্বলজ্বল করত। চাকরবাকরদের ধমক দেবার সময় তার কণ্ঠস্বর কিছু উচ্চগ্রামে চড়লেও মুখে সেই হাসিটুকু কিন্তু লেগেই থাকত, তার এমন পরুষ মূর্তি এই প্রথম চোখে পড়ল।

কিছুক্ষণ সেই ভাবে থেকে আবার সেই পুরনো হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, সেই লোকগুলো আপনাদের দুখানা কলকাতার টিকিট দিলে মাত্র? পথের দু-দিনের, অর্থাৎ আপনাদের খাওয়াদাওয়ার জন্যে কিছু খরচপত্র দিলে না?

না।

পিয়ারা-সাহেব বললে, ওই যে কি নাম লোকটার, অমরনাথ না কি, লোকটা আদমজাদ্ নয়, একেবারে হায়্ওয়ান্ অর্থাৎ হিংস্র জানোয়ার।

এবার পরিতোষ গর্জে উঠল, ঠিক বলেছেন আপনি, লোকটা মানুষরূপী জানোয়ার।

পিয়ারা-সাহেব আবার সেইরকম ঘাড় নীচু ক'রে বসল চিন্তা করতে। কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে মুখ তুলে ভারি মিষ্টি ক'রে বললে, দেখুন, বয়সে আমার চেয়ে ছোট হ'লেও আপনারা আমার শিক্ষক, আমি ছাত্র। বলুন, এ বান্দা কি ভাবে আপনাদের খিদ্মতে লাগতে পারে? কোনও দ্বিধা করবেন না, সম্ভব-অসম্ভবের কথা বিচার করবেন না। শুধু মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করুন, আপনাদের আশীর্বাদে তা কার্যে পরিণত করবার মতন হিম্মৎ এ-বান্দা রাখে।

কথাগুলোর বাচ্যার্থ ঠিক বুঝতে না পারলেও ব্যঙ্গার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে দেরি হ'ল না। অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কি করা হবে, কি সাজা দিলে সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ হয়, সেই চিন্তায় মাথার মধ্যে গোলমাল বেধে যেতে লাগল, বাঁশবনে ডোমকানার অবস্থায় প'ড়ে গেলুম।

বোধ হয় আমাদের অবস্থা বুঝতে পেরে পিয়ারা-সাহেব বললে, কয়েক রকমে তাকে জব্দ করা যেতে পারে। ধরুন আপনারা বলছেন যে, দিদিমণির হাতে যদি আপনাদের চিঠিগুলো পড়ত, তা হ'লে তিনি নিশ্চয় জবাব দিতেন।

আমরা দুজনেই ব'লে উঠলুম, নিশ্চয়ই।

পিয়ারা-সাহেব বললে, তা হ'লে এ-কথা নিশ্চিত যে, এই লোকটাই তাঁর চিঠিগুলো গাপ করে, আর এ-কথাও ঠিক যে, চিঠি সে বাড়ি থেকে গাপ করে না, কারণ বাড়িতে ঢোকবার হুকুম তার নেই। আমার মনে হয়, ওইখানকার ডাকঘরের কোন কর্মচারীর সঙ্গে তার যোগ আছে।

আমাদেরও তো তাই মনে হচ্ছে।

তা হ'লে ডাকঘরের সেই কর্মচারীকে খুঁজে বের ক'রে তাকে টাকা দিয়ে হাত ক'রে চিঠি মেরে দেওয়ার অপরাধের জন্যে আপনাদের অমরনাথের নামে নালিশ করা যেতে পারে। মামলার সময় ডাকঘরের লোকটা সাক্ষী দেবে যে, এই লোকটার হাতে চিঠিগুলো সে দিয়েছিল এই বিশ্বাসে যে, সেগুলো যথাস্থানেই পৌছবে।

পিয়ারা-সাহেব ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, এ-কথা যদি প্রমাণ করতে পারা যায় তো নিশ্চয় তার ভালোরকম সাজা হয়ে যেতে পারে।

ছাত্রের আইনজ্ঞান দেখে পুলকিত হয়ে বললুম, সেই ঠিক হবে, লোকটা যেরকম বদমাশ, তাতে তার বিশেষ শিক্ষা হওয়া দরকার।

একটু কি ভেবে নিয়ে পিয়ারা-সাহেব বললে, আচ্ছা ধরুন, ডাকঘরের কর্মচারীর সাক্ষ্যের পর আপনাদের দিদিমণি যদি তাঁর ভাইকে বাঁচাবার জন্যে বলেন, সব চিঠি তাঁর হস্তগত হয়েছিল; কিন্তু তিনি ইচ্ছে ক'রেই কোনও জবাব দেন নি। তা হ'লে? তা হ'লে তো ওই লোকটাই উল্‌টে নালিশ ক'রে আমাদের সাজা দিইয়ে দিতে পারে।

জোর ক'রে বললুম, সে কখনও হতে পারে না, সে হওয়া অসম্ভব। দিদিমণি তাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। সে-ই ওকে বাড়ি থেকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের সামনে।

পিয়ারা-সাহেব মৃদু হেসে বললে, আচ্ছা, না-হয় ধ'রেই নেওয়া গেল যে, পাতানো ভাইদের জন্যে তিনি নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবেন। কিন্তু তাঁর বাবা এখনও বেঁচে আছেন। আপনারাই বলছেন, বাপ এই ছেলেকে খুবই ভালবাসেন, দিদিমণিও এ-কথা আপনাদের অনেকবার বলেছেন, কেমন কিনা?

বললুম, এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

পিয়ারা-সাহেব বললে, তা হ'লে বুঝুন। বাপ যদি মেয়েকে অনুরোধ করেন যে ভাইয়ের বিরুদ্ধে তুমি সাক্ষী দিও না, তা হ'লে আপনাদের দিদিমণি কি করবেন? নিশ্চয় আপনারা এই ক'দিনে তাঁর বাপের চাইতে আপনার লোক হয়ে যান নি!

পিয়ারা-সাহেবের কথাগুলো ভালো ক'রে বিবেচনা ক'রে বুঝতে পারলুম, সে ঠিকই বলছে। কি আর বলব! চুপ ক'রে রইলুম।

কিছুক্ষণ বাদে পিয়ারা-সাহেব বললে, আরও একটা কাজ করা যেতে পারে—আমরা হ'লে তো তাই করতুম, কিন্তু আপনাদের মরজি হবে কিনা বলতে পারি না।

দুজনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, কি কাজ?

পিয়ারা-সাহেব বললে, যদি হুকুম করেন তো আপনাদের আসামীকে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় আপনাদের পায়ের কাছে এনে ফেলে দিতে পারি। তার পর তার নাক কান ছেঁটে দিতে পারেন অথবা চোখ কানা বা হাত-পা নষ্ট

অথবা যদি প্রাণদণ্ড দেন—সে-হুকুমও তামিল হয়ে যেতে পারে। ভয় পাবেন না, আপনাদের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগবে না।

কথাটা শুনে আনন্দের চোটে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলুম, মাথা ঘুরতে লাগল লাট্টুর মতন বনবন ক'রে।

পরিতোষটা তড়াক ক'রে হাঁটু গেড়ে উঠে যাত্রার ঢঙে বলতে আরম্ভ ক'রে দিলে, অর্জুন! অর্জুন! An Arjun is come to judgment! হে পরন্তপ! আপনি ধন্য এবং আপনার মতন মহানুভবকে ছাত্ররূপে পেয়ে আমরাও ধন্য হলুম।

সে ব'লে চলল, আমাদের তারিখে লেখা আছে, দ্বাপর যুগে আপনারই মতন একজন ছাত্র তাঁর গুরুকে ঠিক এইভাবেই একদিন গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন, আর আজ কলিযুগে দিলেন আপনি।

সেই যাত্রার ঢঙেই ব'সে প'ড়ে পরিতোষ সাড়ম্বরে দ্রোণাচার্যের কাহিনী শুরু করতে যাচ্ছে, এমন সময় পিয়ারা-সাহেব মিষ্টি হেসে বললে, সে কাহিনী আমার জানা আছে। দ্রোণ মহারাজ আর অর্জুনজীর কিস্‌সা তো?

একটু চুপ ক'রে থেকে পিয়ারা-সাহেব সেইরকম হেসে আমাকে বললে, কিন্তু দ্রোণ মহারাজ সেজন্য অর্জুনজীকে ভালো ভালো সব বাণ দিয়েছিলেন। আপনাদের শত্রু দমন করলে আমাকে কি দেবেন?

আমি বললুম, দ্বাপর যুগের সে-সব অস্ত্র এ-যুগে অচল হয়ে পড়েছে। আমরা আপনাকে এ-যুগের প্রধান অস্ত্র—বাক্যবাণ ছাড়বার কৌশল শিখিয়ে দেব। তাক্ বুঝে প্রয়োগ করতে পারলে ইতরবিশেষ সকলেই এতে ঘায়েল হয়, অথচ শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন থাকে না। আপনি বোধ হয় জানেন না, জাতিহিসাবে আমরা এই অস্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেছি। অতএব মাভৈঃ!

আমার কথা শুনে পিয়ারা-সাহেব উচ্চরবে হেসে উঠল। হাসি থামলে সেইরকম উচ্চকণ্ঠেই বলতে আরম্ভ করলে, বাহ্‌বা, বহোত খুব, খুব, খুব।

আরও বার পাঁচ-সাত 'খুব' কথাটি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে উচ্চারণ ক'রে বললে, ভারি খুশি করেছেন আপনারা, ভারি খুশি হয়েছি। আপনারা একটু বসুন, আমি এখুনি আসছি। যাবেন না যেন, আজ এক জায়গায় কুস্তির দঙ্গল দেখতে যাবার নিমন্ত্রণ আছে, সকলে মিলে যাওয়া যাবে।

কিছুক্ষণ বাদে পিয়ারা-সাহেব দুটো চমৎকার, কিনারায় হাতের কাজ-করা সিল্কের চাদর এনে আমাদের দিয়ে বললেন, ওড়িয়ে।

এখানকার হালচালই আলাদা।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা কুস্তির দঙ্গল দেখে এসে পিয়ারা-সাহেবের খাশ দরবারে বিরাট আড্ডা ব'সে গেছে। চার-পাঁচ জন লোক, তারা কুস্তি করে না বটে, কিন্তু কুস্তিবিদ্যা এবং কুস্তিগীরদের জীবনী সম্বন্ধে এক-একটি অথরিটি। তারা এক এক জন ক'রে অতীত ও বর্তমানের বড় বড় সব কুস্তিগীরদের জীবনী ও বড় বড় দঙ্গলের ইতিহাস বেশ জমাটি ক'রে ব'লে যাচ্ছিল। বিচিত্র তাদের জীবন-কাহিনী আর অসম্ভব তাদের শক্তিমত্তা! বাস্তব মানুষের এমন রূপকথার মতন জীবন এর আগে শুনি নি। আর সেই লোকগুলির বর্ণনা করবার কায়দাও চমকপ্রদ। শুনতে যে ভালোই লাগছিল, তা অস্বীকার করব না; কিন্তু মাঝে মাঝে এ-কথাও মনে হচ্ছিল যে, আমরা পিয়ারা-সাহেবের খাশ দরবারে ব'সে আছি, না, কোন গুলির আড্ডায় ঢুকে পড়েছি! সাদা চোখে মানুষ যে এমন সব অসম্ভব কাহিনী ব'লে যেতে পারে এবং লোকে তা বিশ্বাস করে, এই তার প্রথম অভিজ্ঞতা হ'ল।

যা হোক, রাত হয়ে যাচ্ছে, হয়তো নবাবসাহেবের আহারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে, এই মনে ক'রে ওঠবার উপক্রম করতেই পিয়ারা-সাহেব বললে, বস্থন, কোথায় যাচ্ছেন এরই মধ্যে?

বললুম, যাই, নবাবসাহেব হয়তো আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

পিয়ারা-সাহেব রহস্য ক'রে বললে, রোজই তো নবাবসাহেবের সঙ্গে খানা খান, আজ না-হয় এই গরিবের সঙ্গে খেলেন!

এর ওপর আর কথা চলে না। বসতেই হ'ল।

ক্রমে আসরের অনেকেই উঠে গেল। আবার দু-একটি ক'রে লোক এসে তাদের স্থান পূরণ করতে লাগল। এমনই চলেছে, এমন সময় একটি লোক ঘরের মধ্যে ঢুকতেই পিয়ারা-সাহেব বললে, কি, নবাবসাহেবের আসতে আজ এত দেরি হ'ল যে?

লোকটা সহাস্যে উত্তর দিলে, এখানে এলে আপনি না-খাইয়ে তো ছাড়বেন না। জানি, দেরি হবে, তাই কতকগুলো কাজ সেরে এলুম।

পিয়ারা-সাহেব বললে, তা বেশ করেছ, তুমি একবার ছুটে হারোয়ার বাড়িতে গিয়ে বল যে, এক্ষুনি এসে সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। যদি সে বাড়িতে না থাকে তো ব'লে এস, যত রাত্তিরই হোক আমার সঙ্গে দেখা করবে, সে না-আসা পর্যন্ত আমি তার জন্যে এখানে অপেক্ষা করব।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই লোকটা ফিরে এসে বললে, হুজুর, হারোয়া বাড়িতে নেই, খবর দিয়ে এসেছি, ফিরলেই এখানে পাঠিয়ে দেবে-।

কিছুক্ষণ পরেই প্রায় আসর-জোড়া দস্তরখান বিছানো হ'ল। তাড়া তাড়া সানকি ও বাটি আসতে লাগল।

পিয়ারা-সাহেবের আসরে এই প্রথম খানা খেতে বসলুম। সে এক বিরাট ব্যাপার! সে আবার একলা কিংবা বাড়ির দু-চার জন লোকের সঙ্গে ব'সে খেতে পারে না, বিশেষত রাত্রের আহারের সময়। সে-সময় রোজ দশ-পনেরো জন বাইরের লোক তার সঙ্গে ব'সে খাওয়া চাই, নইলে তার খেয়ে তৃপ্তি হয় না। কোন কোন দিন খাবার সময় লোক কম পড়লে সেই রাত্রে চাকরদের এখানে সেখানে ছুটোছুটি করতে হয় লোক ডাকবার জন্যে। চাকরেরাও সেয়ানা—আড্ডায় লোকসমাগম কম দেখলেই তারা সন্ধ্যে থেকেই ছুটোছুটি করতে থাকে পিয়ারা-সাহেবের মোসাহেবদের বাড়িতে বাড়িতে। তার এই সান্ধ্যবিলাসের জন্য আলাদা বাবুর্চী, বাবুর্চীখানা, আলাদা মসালচী ইত্যাদি নিযুক্ত আছে, সেই সকাল থেকে এ-বেলার রন্ধনের আয়োজন শুরু হয়। এখানকার আহারাদির বাহুল্যও বেশি। কিন্তু বাহুল্য ও আড়ম্বরের তারতম্য যাই হোক না কেন, একটা বিষয়ে এই দু-জায়গাকার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত লক্ষ্য করলুম। নবাবসাহেবের সঙ্গে খানা খেতে খেতে মাঝে মাঝে মনে হ'ত, বুঝি-বা ব্রহ্মোপাসনার আসরে বসেছি। এখানে মনে হতে লাগল, যেন কাঙালী-ভোজনের পঙ্‌ক্তিতে বসেছি।

আহারপর্ব শেষ ক'রে ঘরের ছেলেরা সব ঘরে ফিরে গেল। পিয়ারা-সাহেব আমাদের ছাড়লে না। উঠি-উঠি করেছি দেখে সে বললে, যাবেন না। আপনাদের জন্যেই হারোয়াকে ডেকে পাঠিয়েছি, আজ রাতেই পরমর্শ ক'রে একটা যা হয় কিছু স্থির ক'রে ফেলা যাবে।

জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি হন কে?

আপনাদের দুশমনকে ধ'রে নিয়ে আসবার কথা বলেছি না! এই হ'ল সেই লোক, এ-কাজ সে অনেকবার করেছে, এখনও করে। মোদ্দা কথা হ'ল, এই হ'ল তার পেশা।

এমন দুর্লভদর্শনকে দেখবার কৌতূহল হতে লাগল।

একটু পরেই ঘরের মধ্যে একজন লোক এসে পিয়ারা-সাহেবকে কুর্নিশ ক'রে দাঁড়াল। এই লোকটির চেহারার কিছু বিবরণ দেওয়া আবশ্যক বোধ করছি।

লোকটা অত্যন্ত ঢ্যাঙা আর অস্বাভাবিক রকমের রোগা। হাড়ের ওপরে স্রেফ চামড়াটুকু টান ক'রে বসানো মাত্র, মধ্যে মেদ-মাংসের চিহ্নমাত্রও নেই। শিরাগুলো যেন দেহ ত্যাগ ক'রে ঠিকরে বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচে, এমনই ফুলে রয়েছে। সরু, প্রায় আধ হাত লম্বা গলার উপরে ইয়া বড় একটা শুকনো মাথা, অর্থাৎ মাথায় একগাছিও চুল নেই, খুলির ওপরে চামড়াটা একেবারে সেঁটে ব'সে আছে, শিরাগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। তার চুড়োয় আবার একটা উঁচু-গোছের ছোট জরির টুপি চড়ানো—জরি অবশ্য মলিন হয়ে গিয়েছে। মুখের অবস্থাও তাই, দুই গালে অতলস্পর্শী খোঁদল। তার ওপর বেশ ঘন একজোড়া গোঁফ, একটি চোখের অর্ধেকটা সাদা, সেটা ছানি কিংবা কোন আঘাতের চিহ্ন কিনা তা বোঝা গেল না। ফরসা, কালো, মিশকালো, শ্যাম ও উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণকে বেশ ক'রে একত্রে মেশালে যে রঙ হয়, তাই হচ্ছে তার গায়ের রঙ।

ইনি আবার শৌখিন কম নন। গায়ে ফিনফিনে একটা ঢোলা পাঞ্জাবি, এমন ঢোলা যে তার মধ্যে তার মতন পাঁচ-সাতটা লোক অনায়াসে লুকোচুরি খেলতে পারে। পাঞ্জাবির ওপরে একটা গা-সাঁটা গরম ওয়েস্ট্‌কোট। এর ওপর আবার সেই খ্যাংরাকাঠির মতন পায়ে চুড়িদার পা-জামা। সেরকম একখানি মাল সচরাচর চোখে পড়ে না।

লোকটি কুর্নিশ ক'রে দাঁড়াতেই পিয়ারা-সাহেব তাকে অভ্যর্থনা করলে, এস এস, চুন্নি মিয়া, কি খবর? আজকাল তো বাবুসাহেবের দর্শন পাওয়াই ভার!

চুন্নি মিয়ার কঙ্কাল মৃদু হেসে বললে, হুজুর, রুটির ফিকিরে দিনরাত ব্যস্ত থাকি, তাই আপনার দরবারে রোজ হাজির হতে পারি নে, নইলে সময় পেলেই তো আসি।

অদ্ভুত কণ্ঠস্বর! সে কেমন একটা শাঁই-শাঁই আওয়াজের উচ্চ-নীচ সমষ্টি মাত্র। আমার মনে হ'ল, চুন্নি মিয়া যেন জিভের বদলে আলজিভ দিয়ে কথা কইলে।

পিয়ারা-সাহেব বললে, কাল রাত্রে আমার সঙ্গে খানা খাবে, অনেকদিন একসঙ্গে ব'সে খাই নি।

চুন্নি মিয়া নীরবে অভিবাদন ক'রে বললে, হুজুরের যা মরজি।

চুন্নি মিয়া এবারে জুতো ছেড়ে আমাদের কাছে এসে বসল। তাকে

দেখিয়ে পিয়ারা-সাহেব আমাদের বললে, এই যে আমাদের চুন্নি মিয়াকে দেখছেন, এঁকে সামান্য লোক মনে করবেন না, ইনি মানুষরূপী শের অর্থাৎ ব্যাঘ্র।

পরিতোষ ব'লে ফেললে, তাতে আর সন্দেহ কি!

দেখলুম, চুন্নি মিয়ার মুখ-কঙ্কাল কিঞ্চিৎ প্রসন্ন ভাব ধারণ করলে।

পিয়ারা-সাহেব বলতে লাগল, এর এখন যা চেহারা দেখছেন, তা চুন্নি মিয়ার ভূতের চেহারা, আমার দুটোর মতন চেহারা ছিল এর আগে।

দেখলুম, চুন্নি মিয়ার মুখ-কঙ্কাল ক্রমেই অপ্রসন্ন হয়ে উঠতে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলুম, তা হ'লে এমন চেহারা হয়ে গেল কি ক'রে?

পিয়ারা-সাহেব মৃদু হেসে বললে, রোগে।

কি রোগে? হকিমসাহেবকে দেখালে হয় না?

পিয়ারা-সাহেব ওপরদিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, একমাত্র ওই হকিম ছাড়া এ-রোগ ওর কেউ সারাতে পারবে না, আমাদের চুন্নি মিয়া সাঙ্খিয়ার শৌখিন।

সে আবার কি জিনিস?

সে একরকম নেশার জিনিস। কেন, সাঙ্খিয়ার নাম শোনেন নি আপনারা?

পিয়ারা-সাহেবের প্রশ্ন শুনে পরিতোষ হাসতে হাসতে বললে, সাহেবজাদা! আমরা নেশা-সমুদ্রের কূলে ব'সে সবেমাত্র এই নুড়িখেলা আরম্ভ করেছি। উপযুক্ত গুরু পেলে ও-সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পারব—এই আশা মাত্র রাখি। তবে ওই যে কি বললেন, ওর কথা শুধু আমরা কেন, আমাদের দেশেও বোধ হয় কেউ শোনে নি। আমরা গোটাকয়েক মামুলী নেশা, যেমন—মদ, গাঁজা, গুলি, চরস, ভাং, আফিম ইত্যাদির কথা জানি।

পরিতোষের কথা শুনে পিয়ারা-সাহেব উচ্চ হেসে বললে, জী হাঁ। সাঙ্খিয়া নেহাত তুচ্ছ নয়। এর জন্যে চুন্নি মিয়াকে দৈনিক দেড় পো ক'রে কাঁচা ঘি খেতে হয়।

কথাটা শুনে চমকে উঠলুম, বলেন কি!

পিয়ারা-সাহেব বললে, জী হাঁ। নইলে শরীর বড় শুকিয়ে যায়।

এবারে চুন্নি মিয়া আমাদের বললে, হাঁ বাবুজী, সাঙ্খিয়া বড্ড ঘি খায়।

কথাটা ব'লেই পিয়ারা-সাহেবের দিকে ফিরে বললে, আজকাল আর দেড় পোতে শানাচ্ছে না, প্রায় আধ সের ক'রে টানতে হচ্ছে।

আমি আর থাকতে না পেরে ব'লে ফেললুম, চুন্নি মিয়া, আমার বেয়াদপি মাফ করবেন, রক্ত মাংস মজ্জা প্রভৃতি আসুরিক ভোজ্যের প্রতিও সাত্ত্বিয়া মহারাজের বিশেষ অরুচি আছে ব'লে তো বোধ হচ্ছে না!

চুন্নি মিয়া আবার অপ্রসন্ন হলেন।

যা হোক, কিছুক্ষণ গালগল্প ওড়বার পর পিয়ারা-সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করলে, হারোয়ার কি খবর? তাকে ডেকে পাঠিয়েছি অনেকক্ষণ হ'ল!

চুন্নি মিয়া বললে, হুজুর, সেইজন্যেই তো আমি এসেছি। বাড়িতে শুনলুম, আপনি হারোয়াকে তলব করেছেন। কিন্তু সে তো বিশেষ একটা কাজে বিদেশে গিয়েছে। আমার দ্বারা যদি কিছু হয়, তাই ছুটতে ছুটতে এলুম।

পিয়ারা-সাহেব খুব আস্তে, একরকম ইশারাতে কি জিজ্ঞাসা করলে। তার জবাবে চুন্নি মিয়া তার সেই শাঁই-শাঁই স্বরকে যতদূর সম্ভব সংযত ক'রে বললে, হ্যাঁ, মোটা রকমের কিছু পাবার উম্মিদ আছে।

পিয়ারা-সাহেব চুন্নি মিয়াকে আমাদের কথা বলতে আরম্ভ করলে। দেখলুম, আমরা তাকে যা যা বলেছিলুম, তার একটি বর্ণও সে ভোলে নি। একটার পর একটা ঘটনা এমন অপূর্ব ভঙ্গীতে সে বর্ণনা করতে লাগল, সেগুলো যেন চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল। কাশীতে সেদিন সেই সকালবেলাকার অত্যাচারের সময় আমাদের দৈহিক যন্ত্রণাই প্রবল হয়েছিল। তার মধ্যে যে মর্মান্তিক অপমান নিহিত ছিল, পিয়ারা-সাহেবের বর্ণনাকৌশল মনের মধ্যে তার গভীর ছাপ ফেলতে লাগল ও সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকটার ওপর প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্পে মন বিষিয়ে উঠতে লাগল।

পিয়ারা-সাহেবের কথাগুলো খুব গম্ভীর ভাবের সঙ্গে শুনে চুন্নি মিয়া বললে, এর আর কথা কি! হুজুরের যখন মরজি হয়েছে, তখন দুশমন অচিরেই আপনার পায়ের তলায় এসে পড়বে। যদি হারোয়াকে এ-কাজের ভার দিতে চান তো তাকেই দেবেন, সে তো আমারই ছোট ভাই। আর যদি আমাকে হুকুম করেন, তাও তামিল হবে।

পিয়ারা-সাহেব জিজ্ঞাসা করলে, হারোয়া কবে ফিরবে?

চট্ ক'রে যদি কাজ মিটে যায় তো কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে।

পিয়ারা-সাহেব বললে, দেখ, হারোয়াকে আমি সেখানে পাঠাতে চাই, আর তুমি থাকবে এখানে। এখানেও তো কাজ আছে।

ব'লে চোখ মট্‌কে সে কি ইশারা করলে।

চুন্নি মিয়া বিজ্ঞের মতন বার-কয়েক নীরবে ঘাড় নেড়ে বললে, সে তো ঠিক কথা। তা বেশ, সব ঠিক হয়ে যাবে।

এবারে আমরা বললুম, লোকটা কেও-কেটা নয়। সেখানে তার বেশ সহায়-সম্পদ আছে, মোট কথা, তাকে বড়লোক বলা যেতে পারে।

আমাদের সাবধানবাক্য শুনে চুন্নি মিয়া সেই মুখে সুধাময় হাসি হেসে আশ্বাস দিলে, বাবুজী, বেফিকির থাকো।

তারপরে মুখের ওপর অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের ভাব এনে বললে, বাবুজী, নিজেদের গুমর করতে নেই, তার ওপরে সামনে মনিব ব'সে রয়েছেন। আমরাও বড়লোক।

পরিতোষ বললে, তাতে আর সন্দেহ কি!

চুন্নি মিয়া পিয়ারা-সাহেবকে বলতে লাগল, হারোয়ার ফিরতে তো এখনও দিনকতক দেরি আছে, ইতিমধ্যে আমরা এদিকের কাজগুলো সেরে ফেলি। কাশীতে চিঠি লিখতে হবে, সেখানে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে। চারিদিকের আটঘাট না বেঁধে তো কাজে হাত দেওয়া যাবে না, সেবারকার কথা মনে আছে তো? পরে যেন আপসোস না করতে হয়!

পিয়ারা-সাহেব চঞ্চল হয়ে ব'লে উঠল, ঠিক বলেছ। তার ওপরে এঁরা বলছেন, লোকটার টাকাকড়িও বেশ আছে, সহায়ও কিছু কম নেই।

চুন্নি মিয়া বললে, ওইজন্যেই তো বলি, হুজুর, কাজের শেষ ক'রে দিতে। তা করেন না ব'লেই তো শেষে নানা রকমের বখেরা এসে জোটে, এ তো আর হুজুরের অজানা নেই!

পিয়ারা-সাহেব গম্ভীরভাবে বললে, যা বলেছ।

এবারে চুন্নি মিয়া আমাদের বললে, দেখুন বাবুজী, যে লোকটা আপনাদের সঙ্গে এতখানি দুশমনি করেছে, চোর বদনাম দিয়ে রাস্তার লোক দিয়ে মার খাইয়েছে, আপনাদের আখের নষ্ট ক'রে দিয়েছে, তাকে হাতে পেয়ে হাত-পা ভেঙে কিংবা নাক-কান কেটে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া দয়ার কাজ হতে পারে, কিন্তু সুবিবেচনার কাজ হবে না। আমার মতে একেবারে শেষ ক'রে দেওয়াই উচিত, ও শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

শত্রু সম্বন্ধে এই বিধানটি দেখলুম সর্বশাস্ত্রসম্মত।

সেই রাত্রেই অমরনাথ বন্দ্যোউপাধ্যায়কে প্রাণদণ্ড দিয়ে ঘরে এসে দেখি, নবাবসাহেব যথারীতি পশ্চিম দিকে মুখ ক'রে হাঁটু গেড়ে ব'সে চোখ

বুজে দুই হাত সামনে প্রসারিত ক'রে কার কাছে কি ভিক্ষা চাইছেন, কে জানে!

নবাবসাহেবদের বাড়ির জীবনযাত্রা আমাদের কাছে অভিনব হ'লেও ক্রমে তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়তে লাগলুম। সকালবেলা উঠে হকিমসাহেবের সেই উল্‌টে-পাল্‌টে নাড়ী-টেপা অভিনিবেশ সহকারে দর্শন করা, তার পরে সারাদিন ধ'রে কবুতর ওড়ানো, ঘুড়ি ওড়ানো, দিন-দুপুরে ও রাত-দুপুর অবধি পিয়ারা-সাহেবের আসরে ব'সে গালগল্প ওড়ানো, মধ্যে মধ্যে কুস্তির দঙ্গল দেখা ও তারই ফাঁকে ফাঁকে 'ডিরেক্ট মেথডে' ছাত্রকে ইংরিজী ও বাংলা শেখাবার চেষ্টা চলতে লাগল।

পিয়ারা-সাহেবের আড্ডাটি ছিল আমাদের কাছে মহাবিদ্যালয়-স্বরূপ। সেখানে ব'সে দেশের ও দশের কত অদ্ভুত ইতিহাসই যে শুনতে লাগলুম, তার আর ইয়ত্তা নেই,—সে-সব ইতিহাস কোন কেতাবেই লেখা নেই, কখনও লেখা হবে কিনা জানি না; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে তা লোকের মুখে-মুখেই চ'লে আসছে। বাঙালী-ঘরের ছেলেরা এবং অধিকাংশ বুড়োরাও ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তের কত প্রাইভেট কথাই যে জানে না, তাই নিয়ে দুই বন্ধুতে মাঝে মাঝে আলোচনা ও হাসাহাসি করি। এইভাবে আমাদের দিন কাটতে লাগল।

এরই ফাঁকে ফাঁকে কোন কোন দিন চুন্নি মিয়া আসে হারোয়ার খবর নিয়ে, বলে, সে এই এসে পড়ল ব'লে।

চুন্নি মিয়া খবর দিলে, কাশীতে চিঠি চ'লে গিয়েছে, লোকটাকে তারা চিনতেও পেরেছে।

একদিন রাতে চুন্নি মিয়া চিঠি নিয়ে এসে প'ড়ে শোনালে। তাদের ওখানকার এজেন্টরা বড়ে-ভাইয়ের চেহারার বর্ণনা করেছে, শুনে মনে হ'ল, একেবারে হুবহু ঠিক।

দেখতে দেখতে প্রায় মাসখানেক কেটে গেল, তখনও হারোয়ার পাত্তা নেই। জিজ্ঞাসা করলে কিংবা তাড়া দিলে চুন্নি মিয়া মিনতি করতে থাকে, আর ক'টা দিন দেখুন। এতদিন যখন সবুর করেছেনই তখন আর ক'টা দিন অপেক্ষা করুন। হুজুরের কাজ পড়েছে জেনে সে তো সেখানকার কাজ ফেলেই চ'লে

আসতে চায়, আমিই তাকে বারণ করেছি, কারণ এখানে মোটা কিছু 'রকম' মেলবার আছে।

একদিন চুন্নি মিয়াকে জিজ্ঞাসাই ক'রে ফেলা গেল, যে কাজে হারোয়া মিয়া গিয়েছে, তাতে কত পাবে আশা করছ ?

চুন্নি মিয়া বললে, হুজুরের আশীর্বাদে কাজ যদি সুসারে সম্পন্ন হয়, তা হ'লে আর আমাদের খেটে খেতে হবে না। বছরে হাজার দশেক টাকা পাওয়া যেতে পারে এমন জমিজমা পেয়ে যাবে।

জিজ্ঞাসা করলুম, আর কার্যটি যদি অতিসারে পরিণত হয়, তা হ'লে ?

তা হ'লেও অন্তত আট-দশ হাজার টাকা পাওয়া তো যাবেই, তা ছাড়া—

পিয়ারা-সাহেব উচ্চ হেসে বললে, বেশি ব'কো না। এদের ছেলেমানুষ দেখছ বটে, কিন্তু এরা বাঙালীর ছেলে। বাক্যি-সাক্যি শুনে বুঝতে পারছ না ?

পিয়ারা-সাহেবের কথা শেষ হবার আগেই চুন্নি মিয়া খপ্ ক'রে দু-হাত দিয়ে তার একখানা পা চেপে ধ'রে বললে, আপনার দিব্যি।

তার পর নিজের ছানি-পড়া চোখটা দেখিয়েই আমাদের বললে, মিথ্যে কথা যদি ব'লে থাকি তা হ'লে আমার এই চোখটা যেন নষ্ট হয়ে যায়।

জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা ধরুন, কাজকর্ম করিয়ে নিয়ে শেষকালে যদি তারা কিছু না দেয় ?

চুন্নি মিয়া বললে, আপনি ঠিকই বলেছেন, আপনার কথা খুবই সত্যি। এরকম যে একেবারেই না হয়, তাও নয়। কিন্তু এরা তা করবে না, কারণ এরা ভারি জমিদার, হামেশাই এদের এরকম কাজ করবার জন্যে লোকের দরকার হয়। এরা যদি কারুকে ফাঁকি দেয় কিংবা অঙ্গীকৃত পুরস্কারের কমও দেয়, তা হ'লে দু-দিনের মধ্যেই চারিদিকে সেই বিশ্বাসঘাতকতার কথা রটে যাবে, তখন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করলেও এ-কাজের জন্যে আর কোথাও লোক পাবে না। সাহেবজাদা বলুন, আমি সত্যি বলছি কিনা !

পিয়ারা-সাহেব বললে, হ্যাঁ, সত্যি কথা। বরঞ্চ এদের হাতের মুঠোর মধ্যে রাখবার জন্যে কিছু বেশিই দিতে হয়। চাঁদির জুতো না পড়লে এরা শায়েস্তা হয় না।

খুব একটা হাসি প'ড়ে গেল। রহস্যটা চুন্নি মিয়াও বেশ উপভোগ করলে।

ওদিকে ওদের কাজ অগ্রসর হতে লাগল, এদিকে আমরাও নিশ্চিন্ত ছিলুম না। আশা উৎকণ্ঠা ও ভয়—এই ত্রিবিধ রসের সাগরে নিশিদিন হাবুডুবু খেতে লাগলুম। কাছাকাছি কেউ না থাকলেই আমরা এ-বিষয়ে পরামর্শ করতে লেগে যেতুম। দিন পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই মনে হ'ল, সে-রাত্রে ঝোঁকের মাথায় লোকটাকে প্রাণদণ্ড দিয়ে ফেলা ঠিক হয় নি। একদিন পিয়ারা-সাহেবের কাছে কথাটা প্রকাশ করা মাত্র সে বললে, ঠিক বলেছেন। কারুকে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলার পক্ষপাতী আমিও নই। চোখ-দুটো অন্ধ ক'রে ছেড়ে দেওয়া যাবে, তা হ'লে যতদিন বাঁচবে ততদিন তার পাপের ফল ভোগ করতে হবে।

সেইখানে ব'সেই পরামর্শ ক'রে ঠিক করা গেল যে, দুটো চোখ নয়, একটা চোখ কানা ক'রে দিলেই যথেষ্ট হবে 'খন।

কয়েক দিন যেতে-না-যেতে সে চোখটাও মাফ ক'রে দেওয়া হ'ল। এমনই ক'রে প্রায় প্রতি রাত্রেই পিয়ারা-সাহেবের আসরে ব'সে অমরনাথ বন্দ্যোউপাধ্যায়ের নাক কান হাত পা ছাঁটার দণ্ড দিয়ে নবাবসাহেবের ঘরে ঢুকেই গুরু দণ্ড দিয়ে ফেলার জন্যে অনুতাপ হতে লাগল। শেষকালে একদিন স্থির ক'রে ফেলা গেল, লোকটাকে ধ'রে নিয়ে এসে শুধু বলব—তুমি আমাদের ওপর যা অত্যাচার করেছ, এখুনি আমরা তার সমুচিত প্রতিশোধ নিতে পারি; কিন্তু তোমার মতন ঘৃণ্য জানোয়ারকে হত্যা ক'রে হস্ত কলঙ্কিত করব না। যাও।—এই ব'লে দুজনে একটি ক'রে ঠেসে লাথি মেরে বিছুয়াটি কেড়ে নিয়ে বিদেয় ক'রে দেব।

এই বিধানটি আমাদের দুজনেরই বেড়ে লাগল। কিন্তু প্রতিদিনই দণ্ডাদেশ বদলাতে বদলাতে পিয়ারা-সাহেবও একটু যেন কেমনধারা হয়ে পড়েছিল। সেইজন্যে তার কাছে কথাটা পাড়তে সঙ্কোচ হতে লাগল।

সেই রাত্রি থেকে পিয়ারা-সাহেবের সঙ্গেই আমাদের রাত্রের আহারের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে নবাবসাহেবের বড় অসুবিধা হতে লাগল, কারণ জ্ঞান হওয়া অবধি বাইরের লোক নিয়ে খেতে বসা শুধু তাঁর অভ্যাস নয়, একেবারে সংস্কার দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাই সকালবেলা আমরা তাঁর সঙ্গে খেতুম, আর রাতে বাড়ির দু-তিনজন অথবা কখনও কখনও তার চেয়েও বেশি চাকরের দল নিয়ে তিনি খেতে বসতেন।

একদিন রাত্রে আহারাদির পর পিয়ারা-সাহেবের সঙ্গে গালগল্প চলেছে ও

তারই মধ্যে তাকে ইংরেজী ও বাংলা শেখাবার চেষ্টা করছি, এমন সময় চুন্নি মিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে হুজুর, বড ভালো খবর আছে।

কি বৃত্তান্ত, কি খবর, তা না শুনেই দেখলুম, পিয়ারা-সাহেব একেবারে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

একটা জিনিস আমরা এখানে এসেই লক্ষ্য করেছিলুম যে, এরা, ঠাকুরদা ও নাতি উভয়েই, অন্যের—সে পরিচিত ও অপরিচিত, আপনার বা পর যারই হোক না কেন—কিছু ভালো হয়েছে শুনলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং কেউ দুঃখ পেয়েছে শুনলে তেমনই দুঃখিত হয়ে পড়ে।

দুষ্ট লোক পরের সুখে হিংসা করে ও পরের দুঃখে আনন্দিত হয়। সাধারণ লোক পরের সুখে হিংসা করে এবং পরের দুঃখ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকে। অসাধারণ লোক পরের দুঃখে দুঃখী হয়, কিন্তু পরের সুখ সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। ভালো লোক পরের দুঃখে দুঃখী এবং পরের সুখে সুখী হয়। কিন্তু পরের সুখ-দুঃখকে এমনভাবে ভোগ করা যে সম্ভব হতে পারে, তা এখানেই প্রথম দেখলুম। সত্যি কথা বলতে কি, এমন বিমৎসর লোক জীবনে কমই দেখেছি।

যা হোক, চুন্নি মিয়ার সুখবরটি এই যে, হারোয়ার চিঠি এসেছে—সে লিখেছে যে, সেখানকার কার্যটি পরিপাটিরূপে সম্পাদিত হয়েছে। মহারাজা এত খুশি হয়েছেন যে, জমিদারি ছাড়া তাদের বেশ মোটা টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করবেন বলেছেন। টাকাটি হস্তগত হতেই এখন যা দু-এক দিন দেরি। টাকাটা পেলেই হারোয়া চ'লে আসবে।

চুন্নি মিয়া কিছুক্ষণ বকবক ক'রে চ'লে গেল। দেখলুম, চুন্নি মিয়াদের এই ভাগ্যোদয়ে পিয়ারা-সাহেব খুবই খুশি হয়ে উঠলেন। মেজাজ শরীফ দেখে—বড়ে-ভাইকে ধরে নিয়ে এসে অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার প্ল্যানটি তাকে ব'লে ফেললুম।

আমাদের প্রস্তাব শুনে দেখলুম, পিয়ারা-সাহেব ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললে, দেখুন, সে-লোকটা যদিও আসলে আপনাদেরই দুশমন, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্যে আমিও তাকে নিজের দুশমন ব'লেই মনে করি। আপনারা আমার চেয়ে বয়সে ছোট হ'লেও আমার গুরুজন। আপনাদের রায়ের ওপরে কথা বলা আমার শোভা পায় না—আমার কাজ তাকে ধ'রে নিয়ে এসে আপনাদের পায়ের কাছে

ফেলে দেওয়া। তার পরে আপনারা তাকে মারুন বা রাখুন, সে আপনাদের অভিরুচি।

যাক, একটা কষ্টকর বোঝা মনের ওপর থেকে নেমে গেল—যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

পিয়ারা-সাহেব আবার তখুনি বললে, কিন্তু সে-লোকটা আমার 'জানি দুশমন' অর্থাৎ জীবন-শত্রু হয়ে থাকবে চিরদিন। তা থাকুক, আমি তা গ্রাহ্য করি না।

পিয়ারা-সাহেবের সঙ্গে রাত্রে আহারাদির ব্যবস্থা হ'লেও আমাদের শোবার ব্যবস্থা ছিল নবাবসাহেবের ঘরেই। একদিন সকালে হকিমসাহেব সেইরকম ঘণ্টাখানেক ধ'রে নবাবসাহেবের নাড়ী টেপাটেপি ক'রে বললেন, নাড়ীটা তো ভালো ঠেকছে না!

নবাবসাহেব মৃদু হেসে বললেন, বোধ হয় ডাক এল!

হকিমসাহেব সে-কথা শুনে হাসতে হাসতে উঠে চ'লে গেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে পিয়ারা-সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। পিয়ারা-সাহেব তার ঠাকুরদার কাছে গিয়ে ব'সে জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছেন?

নবাবসাহেব মৃদু হেসে বললেন, যেমন রোজ থাকি, সেইরকমই আছি। হকিমসাহেব বলছেন, আজকে নাড়ীটা নাকি সুবিধার নয়। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আর সুবিধার যদি নাই হয়, তাতেই বা এমন কি এসে যাচ্ছে—একদিন তো যেতেই হবে, আমি সর্বদাই তৈরি হয়ে আছি।

নবাবসাহেবের কথা শুনে পিয়ারা-সাহেবের চক্ষু সজল হয়ে উঠল। সে ধরা-ধরা গলায় বললে, না না, অমন কথা বলবেন না। আপনি ছাড়া আমি আর কারুকে জানি না। শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত আমি আপনার কোলে নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে আছি। আপনি চ'লে গেলে পৃথিবীতে আমার কে থাকবে?—আমি বড় অসহায়।

পিয়ারা-সাহেবের কণ্ঠের করুণ সুরে আমরা সকলেই অভিভূত হয়ে পড়লুম। নবাবসাহেবও কিছুক্ষণ ঘাড় নীচু ক'রে থেকে নাতির দিকে মুখ তুলে উদাসভাবে বললেন, তবুও বেটা, যেতে তো হবেই একদিন!

এই ধরনের কথাবার্তা এইখানেই শেষ হয়ে গেল। হকিমসাহেব বললেন যে, বেলা তিনটের সময় এসে তিনি একবার পঁচিশ নাড়ী পরীক্ষা ক'রে দেখে তবে শেষ রায় দেবেন।

সেদিন দুপুরবেলা নবাবসাহেব আমাদের সঙ্গে ব'সে রীতিমত অর্থাৎ

প্রত্যহ যতখানি আহার করেন, তা করলেন। নাড়ী-খারাপের খবর পেয়ে বাইরের অনেক লোক আসতে লাগল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, যাদের এতদিন কখনও দেখি নি। তিনি সকলের সঙ্গেই আলাপ করলেন। তারা চ'লে যাবার পর প্রতিদিন যেমন কিছুক্ষণ ঘুমুতেন, তারও ব্যতিক্রম হ'ল না। ঘুম থেকে উঠে ছাতে না যাওয়া পর্যন্ত রোজ যেমন মালা জপ করতেন, তেমনই জপ আরম্ভ করলেন। ইতিমধ্যে হকিমসাহেব ও পিয়ারা-সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের সঙ্গে ওইখানকারই চার-পাঁচজন মাননীয় কর্মচারী এসে নবাবসাহেবকে খুব নীচু হয়ে কুর্নিশ করলে। নবাবসাহেব তাদের প্রত্যেককে অভিবাদন ক'রে বসতে অনুরোধ করলেন। হকিমসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আজ দিবানিদ্রা কেমন হয়েছিল?

নবাবসাহেব সে-প্রশ্নের উত্তরে মৃদু হাসলেন মাত্র, কোনও জবাব দিলেন না।

হকিমসাহেব বললেন, আপনার নাড়ী পরীক্ষা করব, অনুগ্রহ ক'রে উঠে খাটে শয়ন করুন।

নবাবসাহেব তাঁর স্বভাবসুলভ মৃদু হাসি হেসে বললেন, সে কি হয়! এঁরা নীচে ব'সে রইলেন, আর আমি ওপরে শোব?

হকিমসাহেব বললেন, তাতে কি হয়েছে? আপনি আমাদের সকলেরই বজউর্‌গ্‌ অর্থাৎ শ্রদ্ধেয়।

নবাবসাহেব কিছুতেই খাটে উঠে শুতে রাজী নন, শেষকালে ঘরসুদ্ধ লোকের আগ্রহাতিশয্যে তিনি খাটে উঠে চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন। নাড়ী-দেখা শুরু হ'ল।

প্রথমে হাতের কব্‌জি, তার পরে কনুই বগল কাঁধ ঘাড় কানের পেছন, তার পরে পেট থেকে আরম্ভ ক'রে পায়ের বুড়ো-আঙুলের ডগা পর্যন্ত—দেহের দুই অঙ্গের অস্থি-সন্ধি ও গ্রন্থিতে বারে বারে হকিমসাহেব মৃত্যুদূতের সন্ধান করতে লাগলেন। সেই থেকে সন্ধ্যে অবধি এইভাবে নাড়ী দেখে বললেন, নাঃ, বিশেষ কিছুই নয়। আমি কাল সকালে ওষুধ নিয়ে এসে নিজে খাইয়ে দেব।

নবাবসাহেবকে বললেন, আপনি কিন্তু আর জমিতে শুতে পাবেন না।

হকিমসাহেবের পেছনে পেছনে আমরা, ঘরসুদ্ধ সকলেই, পিয়ারা-সাহেবের বৈঠকখানায় এসে উপস্থিত হলুম। মুখে কেউ কিছু না বললেও সকলেই উদ্‌গ্রীব—অর্থাৎ কিরকম দেখলেন?

কিন্তু কারুকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হ'ল না। হকিমসাহেব নিজে থেকেই ঘোষণা করলেন, ডাক এসে গিয়েছে, বড়-জোর মাসখানেক, কি মাস-দেড়েক।

সভাস্থ দু-একজন লোক মুখের ওপর জোর ক'রে এমন বিস্ময়ের ভাব নিয়ে পিয়ারা-সাহেবকে এমন সব সান্ত্বনার বাণী শোনাতে লাগল যে, তা শুনে আমাদের মনে হ'ল, নবাবসাহেবের যে শেষকালে মৃত্যু ঘটবে এমন কথা তারা কোনদিন কল্পনাই করতে পারে নি।

কিন্তু পিয়ারা-সাহেব নিস্পন্দ হয়ে ব'সে রইল, কারুর কথার জবাব দিলে না। তার ভাব-গতিক দেখে আগন্তুক সকলেই একে একে উঠে চ'লে গেল। আমাদেরও উঠে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু যাবার অন্য কোন চুলো নেই ব'লেই সেখানে ব'সে রইলুম।

লোকগুলো চ'লে যাবার অনেকক্ষণ পরে পিয়ারা-সাহেব হকিমসাহেবের একখানা হাত নিজের দু-হাত দিয়ে তুলে নিয়ে বললে, হকিমসাহেব, আপনি তো জানেন, কোন্ ছেলেবেলায় বাপ-মাকে হারিয়েছি, তাঁদের কথা ভুলেই গিয়েছি। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ওঁর কোলেই আমার এতদিন কেটেছে। উনি চ'লে গেলে আমি কি করব?

হকিমসাহেব বললেন, এ তো বরদাস্ত করতেই হবে সাহেবজাদা, অন্য উপায় তো নেই, অত উতলা হ'লে চলবে কেন?

পিয়ারা-সাহেব আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় হকিমসাহেব আবার শুরু করলেন, আমাকে দেখুন। কোন্ দূর অতীতে, তখন আমরা নওজোয়ান, সেই সময় আপনার ঠাকুরদার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমরা কাছাকাছিই আছি। আমাদের মধ্যে কোনদিন মনোমালিন্য হয় নি। সেই বন্ধু আমার চ'লে যাচ্ছে! কি করব? এ মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় তো আর নেই। তবে কিনা আমারও তো দিন ঘনিয়ে এসেছে, এই যা।

কিছুক্ষণ বাদে হকিমসাহেব চ'লে গেলেন। দেখতে-না-দেখতে নবাব-সাহেবের আসন্ন মৃত্যুর কথা বিদ্যুদ্বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তেই নবাব-বাড়ি একেবারে যেন নিঝুম হয়ে পড়ল। সেখানে বড় ছোট কর্মচারী থেকে আরম্ভ ক'রে সামান্য ভৃত্যরাও চিৎকার ক'রে গল্প, কথা বলা এবং ঝগড়া করত, কিন্তু কি জাদুমন্ত্রে হঠাৎ যেন সব চুপ হয়ে গেল। পিয়ারা-সাহেবের আড্ডায় প্রতিদিন যাদের মুখে হাসি খোশগল্প ও বাত্তেল্লার ফোয়ারা ছুটত, সেদিন

দেখলুম, তারা অত্যন্ত সংযত হয়ে অর্থাৎ জুতোর আওয়াজটি পর্যন্ত না হয় এমনভাবে আসরে এসে বসতে লাগল। অতি ধীরে সংক্ষেপে পিয়ারা-সাহেবকে একটি কি ছুটি প্রশ্ন ক'রে ব'সে রইল।

সেদিন আর একটি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যে-কথাটা এখানে না ব'লে থাকতে পারছি না। এদিকে পুরুষেরা এই তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করামাত্রই ওদিকের ওঁরা যেন চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগলেন। এতদিন আছি, কিন্তু নারী-কণ্ঠস্বর কখনও কর্ণগোচর হয় নি। শুনেছিলুম, পরপুরুষের কর্ণে কণ্ঠস্বর যাতে না পৌঁছোয়, এইভাবে স্বরগ্রাম সাধতে ছেলেবেলা থেকেই তাঁদের তালিম দেওয়া হয়ে থাকে। বাড়ির মহিলাদের তো দূরের কথা, দাসীদের ওপর পর্যন্ত সেই হুকুম ছিল। কিন্তু সেদিন হঠাৎ কি যে হ'ল, তা বোঝবার তো উপায় নেই। তবে দূরে কাছে নারীদের কণ্ঠস্বর—কখনও ঝগড়া, কখনও অন্য সব কথা শুনতে পেতে লাগলুম। পিয়ারা-সাহেবও যে শুনতে না পাচ্ছিল, তা নয়। মধ্যে মধ্যে তার মুখখানা বিরক্তিতে বিষিয়ে উঠলেও সে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

পুরুষ নিষ্ক্রিয় হ'লেই প্রকৃতি উদ্ধতা হন।

সেই রাত্রি থেকেই আমাদের অন্যত্র শোবার ব্যবস্থা হ'ল। কারণ আমরা নীচে শোব আর নবাবসাহেব খাটের ওপরে শোবেন—এ ব্যবস্থায় তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। পিয়ারা-সাহেবের দরবার-ঘরের লাগা একটা ঘরে আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া হ'ল।

পরের দিন সকালে আমরা নবাবসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম; কিন্তু তাঁর ঘরের কাছে গিয়ে দেখলুম যে, সেখান থেকে আরম্ভ ক'রে একেবারে সেই অন্তঃপুর পর্যন্ত কানাত প'ড়ে গিয়েছে। সেখান থেকে মেয়েরা হরদম নবাবসাহেবের ঘরে যাতায়াত করছেন। তাঁর এক পত্নী কাল রাত্রি থেকে সেই ঘরেই বাস করছেন। এক পিয়ারা-সাহেব ও হকিমসাহেব ছাড়া সেখানে অপর লোকের প্রবেশ নিষেধ।

পরের দিন শুনলুম, নবাবসাহেবের অবস্থার কোনও ব্যতিক্রমই হয় নি, যথাপূর্বং সারারাত্রি জপ ও প্রার্থনা চলেছে, তবে গত রাত্রে আহার কিছু কম করেছেন।

পিয়ারা-সাহেব এমন উতলা হয়ে পড়েছিল, তাতে আমাদের মনে হয়েছিল, ঠাকুরদাদা যাবার আগেই তার একটা ভালো-মন্দ কিছু হয়ে না যায়। কিন্তু দেখলুম, দিন-ছুয়েকের মধ্যেই সে বেশ সামলে নিলে।

সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুবই রহস্যজনক ব'লে বোধ হতে লাগল। ঠিক এইরকম না হ'লেও প্রায় এরই কাছাকাছি একটা গল্প আরব্য-উপন্যাসে পড়া গিয়েছিল বটে, কিন্তু আধুনিক যুগে চিকিৎসক বা জ্যোতিষীর কথার ওপরে বিশ্বাস ক'রে এতখানি বাড়াবাড়িটা কি জানি আমরা বরদাস্ত করতে পারছিলুম না। সেই রাত্রে আড্ডা দেবার সময় পিয়ারা-সাহেবকে ব'লে ফেললুম, হকিমসাহেবের কথায় এতখানি আস্থা স্থাপন করাটা যেন একটু বাড়াবাড়ি ব'লে বোধ হচ্ছে। উনি তো আর দেবতা নন যে, যা মুখ দিয়ে বেরুবে তাই ফ'লে যাবে!

পিয়ারা-সাহেব জবাব দিলে, উনি একেবারে দেবতা। এ-বাড়ির অনেকের মৃত্যু সম্বন্ধে উনি আগেই ব'লে দিয়েছেন। আমি নিজে দু-তিনবার দেখেছি, একেবারে হুবহু মিলে গিয়েছে।

এর ওপরে আর কথা চলে না।

ঘটনাস্রোত খুবই দ্রুত অগ্রসর হতে আরম্ভ করলে। বোধ হয় দিন-তিনেক পরে একদিন সকালবেলা উঠে দেখি, চাকরদের মধ্যে সাজগোজ করবার খুব ধুম লেগে গিয়েছে। বেলা কিছু এগিয়ে যাবার পর পিয়ারা-সাহেব আমাদের ডেকে বললে, আমাকে আজই বিশেষ কাজে একবার গাজিপুরে যেতে হচ্ছে। সেখান থেকে ফিরে যেতে হবে পাটনায়, সেখান থেকে কলকাতা হয়ে আবার ফিরতে হবে পাটনায়।—এখন এই চলল, ইংরিজী বাংলা শেখা সব মাথায় উঠল।

কতদিনে ফিরে এসে আবার শান্ত হয়ে বসতে পারবেন ব'লে মনে হয়?

পিয়ারা-সাহেব ওপরদিকে একখানা হাত তুলে বললে, একমাত্র খোদাই জানেন। আমাদের এই যে সব বিষয়-আশয়, তারই একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে হবে।

সে বলতে লাগল, আমাদের বিষয়ের ভাগ-বাঁটোয়ারা—সে এক মহা হাঙ্গামার ব্যাপার। তার ওপরে বিশেষ ক'রে আমাদের পরিবারে এই হাঙ্গামা আরও প্যাঁচোয়া হয়ে পড়েছে। আমার ঠাকুরদার চারটি বিবাহ—ছোট পত্নী এখনও বর্তমান। আমার বাবার আরও তিন ভাই ছিল। বাবার চার বিয়ে, আমার মা ছাড়া আর তিনজনই বেঁচে আছেন। চাচাদের প্রত্যেকেরই দুটি-তিনটি ক'রে বিয়ে, চাচারা সকলেই গত হয়েছেন বটে, কিন্তু শত্রুমুখে ছাই দিয়ে দু-একজন ছাড়া তাঁদের স্ত্রীরা সকলেই জীবিত। বাড়িতে ছেলের পাল ছিল,

সব ম'রে ম'রে আমি একা দাঁড়িয়েছি। নিজের বোন ও খুড়তুতো বোন অগুন্তি। দুটো খুড়তুতো বোন আমায় কাঁধে পড়েছে, আর বাকি সবার এখানে-সেখানে বিয়ে হয়েছে। ঠাকুরদা এদের কারুকেই বঞ্চিত করতে চান না, সকলকেই যার যা প্রাপ্য দিয়ে যাবেন, এবং এই কার্যটি তিনি বেঁচে থাকতে-থাকতেই ক'রে যেতে চান, নইলে ভবিষ্যতে অনেক বাধা এসে উপস্থিত হতে পারে। আর এই বৃহৎ কাজের ভার বৃদ্ধ আমার ওপরে চাপিয়েছেন, 'না' বলি এমন সাধ্য আমার নেই।

কথায় কথায় প্রকাশ হয়ে পড়ল যে, পিয়ারা-সাহেব এখন গাজিপুরে চলেছে বিবাহ করতে। অনেকদিন আগে সেখানকার এক মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহের কথাবার্তা পাকা হয়েই ছিল। নবাবসাহেব ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তিনি যাবার আগেই যেন এই বিবাহ-কার্যটি সমাধা হয়।

বলা বাহুল্য, পিয়ারা-সাহেবের দুই পত্নী বর্তমান।

তাকে ঠাট্টা ক'রে বললুম, দুটি পত্নী তো ঘরে রয়েইছে, আর কেন?

পিয়ারা-সাহেব হেসে বললে, হ্যাঁ, তারা বিবাহিত পত্নী বটে, কিন্তু তারা তো আমাদের ঘরেরই মেয়ে,—ঘরকি মুরগী দাল বরাবর। অর্থাৎ ঘরের মুরগীতে মাংসের স্বাদ নেই, তা খেতে ডালের মতন।

সেদিন দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পর এ-কথা সে-কথার ভণিতা ক'রে পিয়ারা-সাহেব বললে, আমার তক্‌দির এমনই মন্দ যে, আপনাদের মতন গুণী লোককে পেয়েও কিছু শিখতে পারলাম না। তবে এ-কথা আপনারা নিশ্চয়ই মনে রাখবেন যে, সুবিধা হ'লেই আমি আপনাদের ডেকে পাঠাব।

আজও তার সে-সুবিধা হয়ে ওঠে নি, হয়তো মুরগীর ঝাঁকে প'ড়ে আমাদের কথা সে স্রেফ ভুলেই গিয়েছে।

কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর পিয়ারা-সাহেব বললে, আজ রাতের গাড়িতেই আমাকে গাজিপুর রওনা হতে হবে। সেখানে তার করা হয়েছিল, তারা দিন ঠিক ক'রে জবাব দিয়েছে। আপনারা আজই যেতে পারেন কিংবা কালও যেতে পারেন; ইচ্ছে করলে দু-দিন, দশদিন অথবা যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারেন।

পিয়ারা-সাহেব আমাদের এক-একজনকে কুড়িটা ক'রে নগদ টাকা ও একটা ক'রে সবুজে রঙের ওপরে কালো ডোরা-কাটা টিনের ট্রাঙ্ক উপহার দিয়ে সেই রাত্রেই লোক-লস্কর ও জনকয়েক সাময়িক অভিভাবককে সঙ্গে নিয়ে গাজিপুর যাত্রা করলেন।

আমাদের যাত্রার দিন স্থির না হ'লেও বিদায়ের পালা শুরু হয়ে গেল। মনে হতে লাগল, বৃথাই হ'ল গৃহত্যাগ, বৃথাই হ'ল এতদিনের দুঃখ-সুখ-যন্ত্রণা-ভোগ, বৃথাই হ'ল অমরনাথ বন্দ্যোউপাধ্যায়কে ক্ষমা করা; লাভ হ'ল এই কয়েকটি মাসের অভিজ্ঞতা—দুর্লভ সে অভিজ্ঞতা।

প্রতিদিনই অতি ক্ষুণ্নমনে সেই কয়েকখানা ধুতি ও জামা আর সেই পাড়ওয়ালা রেশমের চাদরখানা নানা রকমে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ট্রাঙ্কের এ-কোণে ও-কোণে গুছিয়ে রাখি, পরের দিন আবার অন্যভাবে সাজাই। অদৃষ্ট আমাদের সঙ্গে যা অভদ্র ব্যবহার করলে, অতি সংক্ষেপে মধ্যে মধ্যে তারই আলোচনা করি দুই বন্ধুতে। গৃহত্যাগের সময় আশা আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা দিয়ে মনের মধ্যে যে মনোহর প্রাসাদ তৈরি করেছিলুম, নিষ্ঠুর অদৃষ্ট অতি বর্বর আঘাতে তা চূর্ণ ক'রে দিলে। তার কাছে এই অতি অপমানকর আত্মসমর্পণ-জনিত অন্তর্দাহের মধ্যেও যে কয়েকটি মুখ সেদিন মনের মধ্যে ফুটে উঠেছিল—ইহজন্মে তো বটেই, জন্মজন্মান্তরেও তারা আমার আত্মীয়তাসূত্রে বাঁধা হয়ে রইল।

আর, দিদিমণি! তার সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়েছিল কিনা—এমন একটা প্রশ্ন পাঠক-পাঠিকার মনে জাগা স্বাভাবিক।

হ্যাঁ, তার সঙ্গে আর একবার দেখা হয়েছিল, সেই কথাটা ব'লেই এবারের পর্ব শেষ করি।

ত্রিশ বছর পরে—তখন আমি মহা কাজের লোক। কাজের ঠেলায় তাঁতের মাকুর মতন ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি ঠিকরে-ঠিকরে বেড়াচ্ছি। দুর্ভাগ্যের ঘন তমিস্রা ভেদ ক'রে ভাগ্যাচলের শিখরে সুখসূর্যের প্রথম রশ্মি পড়েছে মাত্র, এমন সময় কয়েক দিনের ব্যবধানে বাবা মা চ'লে গেলেন। কাজের তাড়ার মধ্যে থাকলে শোক তেমন লাগে না,—অগ্নিশিখার ভেতর দিয়ে খুব জোরে হাতখানা ঘুরিয়ে দিলে যেমন তাত লাগে, কিন্তু পোড়ে না, তেমনই আর কি!

ছুটোছুটির কাজ ক'মে গেলেও শুধু আগের দমেই ঘুরপাক খাচ্ছি, এমন সময় আমার ভেতরকার সেই লোকটা, যে আমায় কখনও কোথাও ঘর বাঁধতে দিলে না, সেই চির-উদাসী আবার একদিন মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠল। মনের

মধ্যে 'সব ঝুটা হ্যায়'-এর কেত্তন শুরু হয়ে গেল। সাংসারিক দায়িত্বের ধামা চাপা দিয়ে সেই বৈরাগ্যের দম বন্ধ ক'রে মারবার চেষ্টা করছি, এমন সময় চোখে প'ড়ে গেল উপনিষদের অমূল্য উপদেশ—যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ; অর্থাৎ কিনা বৈরাগ্যটি উদয় হওয়ামাত্রই খ'সে পড়বে।

অতএব খ'সে পড়া গেল। দিন-কয়েক এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ালুম, কিন্তু কিছুই ভালো লাগে না,—মনের মধ্যে দারুণ অশান্তির দাহন, অথচ তার প্রত্যক্ষ কোন কারণ খুঁজে পাই না। সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা! সেইরকম ঘুরতে-ঘুরতে একদিন দ্বিপ্রহরে বৃন্দাবনে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

আজ বৃন্দাবনের অনেক উন্নতি হয়েছে শহরের আঙ্গিকের দিক দিয়ে। কিন্তু বেশিদিনের কথা নয়, সেদিনেও বৃন্দাবনের অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। যা হোক, বৃন্দাবন আমার অজানা স্থান নয়। বন্ধুবান্ধব সহ দু-তিনবার এর আগে সেখানে গিয়েছি, সারাদিন ঘুরে-ফিরে বিকেল নাগাদ মথুরায় ফিরে এসেছি, রাত কখনও কাটাই নি সেখানে। বোধ হয় তাই না-জানার একটা মোহ ছিল বৃন্দাবনের প্রতি।

দারুণ গ্রীষ্মকাল, বোধ হয় জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি। সেখানে পৌঁছেই মনে হ'ল, যেন অদৃশ্য এক অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। গ্রীষ্ম অসহ্য মনে হতে লাগল। মন্দিরগুলো তেতে আগুন, রাস্তায় ধুলোর ঝড়, গাছের পাতা-গুলো ঝুরি-ভাজা, যমুনার নমুনা মাত্র সার।

রান্না ও ফাইফরমাশ খাটবার জন্যে একজন লোক ছিল। তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, এরকম সাংঘাতিক গরম আর কতদিন থাকবে?

সে বললে, আরও মাসখানেক তো বটেই, তার পরে আস্তে আস্তে গরমটা সহনীয় হবে।

এই লোকটাই একদিন কথায় কথায় বললে যে, সেখান থেকে কিছু দূরেই বড় বড় জঙ্গল আছে আর সে-জায়গাগুলো বেশ ঠাণ্ডা। অনেক লোক গরমের সময়টা সেইখানেই কাটায়, চারিদিক বেশ ফাঁকা কিনা!

কথাটা শুনেই আমার সন্দেহ হ'ল। জঙ্গল, অথচ চারিদিক ফাঁকা কিরকম? জিজ্ঞাসা করলুম, গাছ-টাছ আছে বাপু সে-জঙ্গলে?

সে ঘাড় নেড়ে বললে, অনেক—অনেক গাছ আছে দেখবেন সেখানে।

একদিন দ্বিপ্রাহরিক আহারাদির পর ছাতি মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল বনের উদ্দেশে, ঠাণ্ডা হবার আশায়। অত্যন্ত হতভাগা ছাড়া রাস্তায় অন্য

লোকজন নেই। তাদেরই কারুকে কারুকে জিজ্ঞাসা ক'রে শেষকালে জঙ্গলে গিয়ে তো উপস্থিত হওয়া গেল।

বৃন্দাবনের বাহাদুরি আছে বাবা! জঙ্গল মানে, ধু-ধু করছে বিরাট প্রান্তর, এক মাইলের মধ্যে এখানে-সেখানে গেঁটে-সেঁটে-বেঁটে তিন-চারটে গাছ দেখতে পাওয়া যায় কি না-যায়! থেকে থেকে আগুন-বাতাস হুঙ্কার ছেড়ে ছুটোছুটি করছে, এরই নাম জঙ্গল।

সেই লক্ষ গোপিনীর তপ্ত বিরহশ্বাসে প্রায় রোস্ট্ হয়ে বাসস্থানে ফিরে এসে তিন ঘটি বিনা-বরফে গুড়ের শরবত পান ক'রে কথঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হওয়া গেল।

তার পরে বৃন্দাবনের ভিখারিনী। ভোর হতে-না-হতেই পালে পালে ভিখারিনী বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়, বিশেষ ক'রে মন্দিরগুলোর আশপাশেই তারা ওত পেতে থাকে আর দেবদর্শনাভিলাষী নরনারী, বিশেষ ক'রে নতুন মুখ ও যাত্রী দেখলেই ছেঁকে ধরে। আক্রান্ত ব্যক্তি ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠলেও নিস্তার নেই, তারা গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটতে থাকে মাইলের পর মাইল। তারপর দম ফুরিয়ে গেলে থেমে যায় আর ম্লান মুখে চলন্ত গাড়ির দিকে চেয়ে থাকে, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দম ফিরে পেলে আবার অন্য যাত্রীর সন্ধানে ছোটে।

ভারতবর্ষের বহু তীর্থের ভিখারী ও ভিখারিনীদের অত্যাচারের অভিজ্ঞতা আমার আছে। তাদের অসৌজন্যের জন্যে অনেক ভালো জায়গা থেকে ধুলো-পায়েই বিদায় নিতে হয়েছে। মনে পড়ে, একবার আমরা কয়েকটি বন্ধু মিলে ভুবনেশ্বরে মন্দির দেখতে গিয়েছিলুম। ভুবনেশ্বর থেকে শেষরাত্রে গরুর গাড়ি চ'ড়ে উদয়গিরি খণ্ডগিরি দেখতে যাওয়া হ'ল। পথে পালে পালে ভিখারী আক্রমণ করলে। দু-একটা ছোট ছেলে-মেয়েকে একটা ক'রে পয়সা দেওয়া মাত্র কোথা থেকে পঙ্গপালের মতন ছোট ছেলে-মেয়ের দল চারদিক থেকে ছুটে আসতে লাগল আমাদের গাড়ি লক্ষ্য ক'রে, আর সেই কয়েক মাইল পথ তারা আমাদের সঙ্গে গেল, আর সেইরকম চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে আমাদের সঙ্গেই ভুবনেশ্বরে ফিরে এল। পরে শুনলুম, সেখানে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। যাই হোক, মানুষের সেই অবস্থা দেখে মনে-মনে সেই দেশের অভিভাবকদের দোষ দিয়েছি মাত্র, তাদের দুরবস্থার জন্য নিজেকে দায়ী মনে হয় নি। কিন্তু বৃন্দাবনের সেই দৃশ্য দেখে সেখানকার লোকদের মধ্যে সেদিন নিজেকে অত্যন্ত হীন ব'লে মনে হয়েছিল, তার কারণ, এই ভিখারিনীদের মধ্যে শতকরা

একশোটিই হচ্ছে বাংলাদেশের নারী। সে এক বিস্ময়কর অবমাননায় প্রতিদিন অন্তর কলুষিত হতে লাগল। বাংলাদেশের প্রত্যেক নরনারীরই এ-বিষয়ে দায়িত্ব আছে।

রোজই সকালবেলা কিছু পয়সা নিয়ে গিয়ে এদের মধ্যে বিতরণ করতুম। একটা বিশেষ জায়গায় গিয়ে পৌঁছলেই চারদিক থেকে নারীকণ্ঠের কাতর চিৎকার উঠত, বাবা ত্থাও, একটি পয়সা ত্থাও—

বাপ রে! আজও যদি স্বপ্নে ঘুরতে-ঘুরতে কখনও বৃন্দাবনে গিয়ে পড়ি তো তাদের চোখে পড়বার আগেই ঘুম ছুটে যায়।

বৃন্দাবন ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। ভারতবর্ষে যত তীর্থস্থান আছে, ভক্তিহীন লোকের বাস করবার পক্ষে বৃন্দাবন তার মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট স্থান। ভক্তিহীন ব্যক্তির মুক্তি নেই, বিশেষজ্ঞেরা এমন একটা মন্তব্য মাঝে মাঝে প্রকাশ ক'রে থাকেন বটে; কিন্তু আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, ভক্তিহীন লোকও যদি বৃন্দাবনে বাস করেন তো কেবলমাত্র ওখানে বাস করার কৃচ্ছ্র-সাধনেই তিনি মুক্তিলাভ করবেন।

কিছুদিন বৃন্দাবনে কাটিয়ে মথুরায় এসে ডেরা বাঁধলুম। হ্যাঁ, মথুরা একটা জায়গা বটে! বৃন্দাবনের সঙ্গে মথুরার আকাশ-পাতাল তফাত। ব্রজের দুলাল বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় এসে আর সেখানে ফিরে যান নি—এইটুকু জানলেই মথুরা-বৃন্দাবনের মধ্যে তফাতটা বুঝতে পারা যাবে।

কিন্তু তথাপি বৃন্দাবন থেকে মধ্যে মধ্যে আমি একটা আশ্চর্য আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলুম। এরকম অভিজ্ঞতা আমার জীবনে নতুন নয়। যদিও অনেকবার একে প্রত্যাখ্যান করেছি, কিন্তু যতবার সাড়া দিয়েছি ততবারই দেখেছি, এর মূলে আমার জন্যে নূতনতর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে আছে। এবারেও এই আহ্বানকে উপেক্ষা না ক'রে মধ্যে মধ্যে টাঙ্গা ভাড়া ক'রে সকালবেলা বৃন্দাবনে গিয়ে মন্দির ইত্যাদি দর্শন ক'রে দুপুরের মধ্যে ফিরে আসতে লাগলুম।

বোধ হয় বার-তিনেক এইভাবে যাতায়াত করবার পর সেদিন গোবিন্দজীর ভাঙা মন্দিরের কাছ অবধি গিয়েই বুঝতে পারলুম, কিসের একটা উৎসব লেগেছে। বৃন্দাবনে অবিশ্যি সপ্তাহে একটা-না-একটা উৎসব লেগেই আছে। কিন্তু সেদিনকার উৎসবের মধ্যে যেন একটু বিশেষত্ব ছিল। রাজ্যের লোক রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। টাঙ্গা তো দূরের কথা, অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে সেই

ভিড়ে পথ ক'রে চলাও দুষ্কর। ভিড়ের মধ্যে ভিখিরী ও তথাকথিত সন্ন্যাসীই বেশি, ভিখিরীদের মধ্যে অধিকাংশই ভিখারিনী আর সন্ন্যাসীদের মধ্যে অধিকাংশই ভিখারী।

টাঙ্গা থেকে নেমে কয়েক পা চলতে-না-চলতে ভিখারিনীর দল আমাকে একেবারে ছেঁকে ধরলে। তাদের মধ্যে অনেকেরই মুখ আমার চেনা, অনেকেই আমাকে চেনে, বিশেষ দিনে আমার মতন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে তারা বিশেষরকম উৎসাহিত হয়ে সমস্বরে তান ধরলে, বাবা দ্যান, একটা পয়সা দ্যান, দয়া ক'রে একটা পয়সা দ্যান—

ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝে বেশি ঘোরাফেরা না ক'রে একটা মন্দিরে কিছুক্ষণ কাটিয়েই কোনরকমে চোখ কান বুজে ছুটে গিয়ে তো টাঙ্গায় উঠে বসলুম। কিন্তু পালাব কোথায়? ভালো ক'রে চেপে বসবার আগেই ভিখিরীপল্টন টাঙ্গা-সমেত আমাকে ঘিরে ফেললে।

পকেটে হাত পড়ল। খুচরো পয়সা যা ছিল একটা একটা ক'রে তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে টাঙ্গা চালিয়ে দিলুম।

আমার টাঙ্গার পেছনে এক পাল ভিখারিনী ছুটতে আরম্ভ করলে। টাঙ্গার ঘড়ঘড়ানি ও সেইসঙ্গে সমস্বরে নারীকণ্ঠের কাতর চিৎকার—বাবা, দ্যান দ্যান —একটা পয়সা ফেলে দ্যান। শেষকালে তিত-বিরক্ত হয়ে স্রেফ তাদের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্যে টাঙ্গাওয়ালাকে বললুম, এই, জোরসে চালাও।

আমার কথা শুনে টাঙ্গাওয়ালা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চাইলে। সে-দৃষ্টির অর্থ—এত সামান্য কারণে বিরক্ত হ'লে কি চলে? তার পরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখে 'চকাস' আওয়াজ ক'রে রাশে সামান্য একটু টান দিলে।

টাঙ্গার ঘোড়া, বিশেষ ক'রে বৃন্দাবনী টাঙ্গার ঘোড়া, তারা শাপভ্রষ্ট জীব, রাশটানের ওজন অনুভব ক'রেই বুঝে নিলে। সোয়ারীকে খুশি করবার জন্যে কয়েক কদম একটু জোরে ছুটে আবার বিলম্বিত লয়ে নেমে এল। ইতিমধ্যে বিপরীত দিক থেকে যাত্রীপূর্ণ কয়েকটা টাঙ্গা এসে পড়তেই নতুন আসামী পেয়ে ভিক্ষার্থীর দল তাদের পেছনে লেগে গেল; শুধু একজন আমাকে ছাড়লে না, টাঙ্গার পেছনে সমানে ছুটতে লাগল। মুখে এক কথা—বাবা, দ্যান, একটা পয়সা ফেলে দ্যান—

ভিখারিনী স্থূলকায়া, রঙ রোদে ঘুরে-ঘুরে তামাটে হয়ে গিয়েছে, মাথা

দাড়াই ছিল, বিন্দু-বিন্দু খোঁচা-খোঁচা পাকা চুল, পেছনদিকে আধ-ইঞ্চি-টাক একটু চৈতন, মুখাকৃতি একেবারে চৈনিক।

তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হতে লাগল, আমার কোনও এক আত্মীয়ার সঙ্গে যেন সে-মুখের সাদৃশ্য আছে। অথচ আশ্চর্য এই, কার মুখ যে সেটা তা কিছুতেই স্মরণ করতে পারছিলুম না। তার ভাষায় সেই পূর্ববঙ্গীয় স্বরই সব ঘুলিয়ে দিতে লাগল। কার মুখ এ—কার মুখ? হঠাৎ বিস্মৃতির ঘন তমসার মধ্যে স্মৃতির বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল—দিদিমণি!

চলতি গাড়ি থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ভিখারিনীকে ধ'রে বললুম, দিদিমণি, আমাকে চিনতে পারছ? আমি—

কয়েক মুহূর্ত মাত্র। অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে সে বললে, স্থ—অ—বি—র!

আশ্চর্য! সে কি আমায় আগেই চিনতে পেরেছিল?

দিদিমণিকে তখুনি টাঙ্গায় তুলে নিয়ে তার বাড়ি গেলুম। ছোট একতলা বাড়ি, তারই দুটো ঘর। এক ঘরে শোওয়া থাকা চলে, অন্য ঘরে একটা মাঝারি-গোছের তক্তপোশের ওপর কম ক'রে গুটি পঁচিশ দেবতা—মানে একই দেবতা নানা রকমের পোজ্ মেরে শুয়ে, ব'সে, ত্রিভঙ্গ হ'য়ে, হামাগুড়ি দিয়ে রয়েছেন—এটির নাম ঠাকুর-ঘর। এঁদের প্রত্যেককেই আলাদাভাবে পরিচর্যা করতে হয়।

দিদিমণি তার শোবার ঘরে একটা মাদুর পেতে আমাকে বসিয়ে সামনে বসল। পাঁচ-সাত মিনিট চুপচাপ কাটবার পর সে বললে, ব'স, আমি এখুনি আসছি।

বোধ হয় ঘণ্টাখানেক বাদে ঠাকুর-ঘর থেকে বেরিয়ে সে আবার আমার সামনে ব'সে ডাক দিলে, যমুনা!

তখুনি একটি বাঙালী বিধবা দরজায় এসে দাঁড়াল। দিদিমণি বললে, ঘরে অতিথ্ এসেছেন।

কথাটা শুনেই সে চ'লে গেল।

চুপ ক'রে ব'সে আছি দিদিমণির দিকে চেয়ে, সেও আমার দিকে চেয়ে আছে। কারুর মুখে কথা নেই। আমার মনের মধ্যে লক্ষ প্রশ্নের ঝড় চলেছে। বলবার ইচ্ছে হতে লাগল, তোমার সেই বাজারের টাকা নিয়ে আমরা পালাই নি। ইচ্ছা হ'ল, একবার জিজ্ঞাসা করি, আমাদের অতগুলো চিঠির একটারও জবাব দিলে না কেন?

কিন্তু তখুনি মনে হ'ল, এতদিন পরে সে প্রশ্ন তুলে লাভ কি? সেদিন জীবনের সমস্তটাই ছিল ভবিষ্যতের গর্ভে। সেই ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনাই নির্ভর করেছিল আমাদের সেই চিঠিগুলির উত্তরের মধ্যে। আজ জীবনের সমস্তটাই চ'লে গেছে অতীতের গর্ভে, সে-চিঠির কোন মূল্যই আমার কাছে আজ আর নেই। কেন চিঠি লেখ নি?—এ-প্রশ্নও নিষ্প্রয়োজন, স্বদ্ধমাত্র কৌতূহল-নিবৃত্তি ছাড়া। সেরকম কুকুর-কৌতূহল আমার নেই।

দিদিমণির নিজের কথা জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা করতে লাগল।—রাজরানী হয়ে কেমন ক'রে সে আজ পথের ভিখারিনী হয়েছে? এই অবস্থায় নিশ্চয় সে একদিনের মধ্যেই এসে পৌছয় নি! কি ক'রে ধাপে ধাপে, স্তরে স্তরে নামতে নামতে, কত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অদৃষ্ট তাকে টানতে টানতে এখানে এনে ফেলেছে? কি প্রশ্ন করব? কোন্ প্রশ্নটা আগে করব?

সেই ঝড়ের মধ্যে থেকে-থেকে আর একটা স্বর মনের মধ্যে ঝঙ্কার দিতে লাগল, কতদিন ধ'রে, কত অভাবনীয় আপদের মধ্য দিয়ে তার দিন কেটেছে, কত অশ্রু, কত ব্যথার কাহিনী—কি হবে সে সুদীর্ঘ ইতিহাস শুনে? শত জীবনের বিনিময়েও তো তার দাগ মোছা যাবে না! থাক্, সে-কথা শুনে কাজ নেই, কৌতূহলের বিনিময়ে আর নতুন আঘাত অর্জন করতে চাই নে।

দিদিমণিকে দেখতে লাগলুম, মুখখানা ঘিরে একটা করুণ ভাব থমথম করছে; কিন্তু দেখতে দেখতে মনে হয়, যেন কারুণ্যের-আবরণ-দেওয়া রহস্যময় হাসি সেটা।

চুপ ক'রে ব'সে আছি তার মুখের দিকে চেয়ে, একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য সে আমার চোখের ওপর চোখ রাখলে। কি নিরন্বয় পরিবর্তন হয়েছে তার চোখের ও দৃষ্টির! যে চোখ মুহুর্মুহু ঘৃণা, আনন্দ, উদ্বেগ, ভয়, দয়া, করুণা, অনুনয় ও ঔদ্ধত্যে ঝলকে উঠত, সে-চোখ একেবারে স্থির হয়ে গিয়েছে। অন্তর শান্ত, তাই চোখে কোন ভাবই প্রতিফলিত হয় না। যে-চোখ শরৎপ্রভাতের সৌরকরোজ্জ্বল শিশির-বিন্দুর মতন ঝলমল করত, সে-চোখ যেন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে, যেন ঊর্মিমুখর সাগর একটা প্রাকৃতিক বিপ্লবে শান্ত হয়ে গিয়েছে।

চুপচাপ ব'সে আছি দুজনে মুখোমুখি। সময় বা ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্ঞান আমার ছিল না, এমনকি দেহের অস্তিত্ব পর্যন্ত মন থেকে মধ্যে মধ্যে লোপ পেয়ে যেতে লাগল। শুধু মনে হতে লাগল, আমি যেন একটা চিন্তার যন্ত্র মাত্র, আমার মধ্যে ব'সে কে যেন চিন্তার চক্র ঘুরিয়ে চলেছে।

এইরকম চলেছে, হঠাৎ দিদিমণি দু-হাত দিয়ে আমার মাথাটা ধ'রে তার দিকে আমাকে আকর্ষণ করলে। আমি সেদিকে একটু এগিয়ে গিয়ে চোখ বুজে ফেললুম। মনে হ'ল, এবার বুঝি তার গাম্ভীর্যের আবরণ খ'সে গেল, সেই আগেকার মতন আমার মাথাটা আদরে চেপে ধরবে। কিন্তু অনেকক্ষণ ধ'রে মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সে বললে, চুলগুলো সব পেকে গেছে যে!

খাবার ডাক পড়ল। উঠে গিয়ে বারান্দার মতন একটা জায়গায় খেতে বসলুম। কি খেলুম, খেলুম কি না-খেলুম, তাও মনে নেই, উঠে এসে আবার সেই মাদুরে বসলুম।

কিছুক্ষণ বাদে দিদিমণি, বোধ হয় খাওয়া-দাওয়া সেরে, আমার কাছে এসে বসল।

বেলা প'ড়ে আসতে লাগল। টাঙ্গাওয়ালা এসে তাড়া দিয়ে বললে, তার কাছে বাতি নেই, অন্ধকার হয়ে গেলে রাস্তায় পুলিসে ধরবে।

দিদিমণি কিছুই বললে না। কোথায় যেতে হবে, কোথায় থাকি—কোনও প্রশ্নই নয়।

বিদায়ের আগে হাত-দু'খানা ধ'রে কাছে নিয়ে এলুম, দেখলুম, বাঁ-হাতের তর্জনীমূলে সেই গভীর ক্ষতচিহ্ন জ্বলজ্বল করছে।

আমার মূর্ছিত অতীত চমকে উঠে বিস্মিত বর্তমানের দিকে চেয়ে রইল। আস্তে আস্তে হাত-দু'খানা তার কোলের ওপরে নামিয়ে দিলুম।

উঠি-উঠি করছি, এমন সময় দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলে, পরিতোষ কোথায়?

পরিতোষ নেই শুনে সে কোনও কথাই বললে না। আবার দেখলুম, সে-চোখে কোন আলোড়নই নেই।

টাঙ্গাওয়ালা আর-একবার তাড়া দিতেই উঠে পড়লুম। দিদিমণিও আমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল। বিদায়ের সময় বললুম, দিদিমণি, তোমার কি অর্থকষ্ট আছে? আমার কাছে কোনও সঙ্কোচ ক'রো না। বলো, অর্থের প্রয়োজন থাকে তো আমি রয়েছি, তোমার কোনও ভাবনা নেই।

দিদিমণি বললে, গোবিন্দের ইচ্ছায় আমার কোনও অভাব নেই।

প্রণাম ক'রে টাঙ্গায় গিয়ে উঠলুম।

। দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত।